

সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

ভূমিকা

মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় বিধৃত সাহিত্য-চিন্তার পরিচয় প্রদান বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য।

কালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমাবধি 'সওগাতের' প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। এই ভূমিকা বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'সওগাত'কে বিশিষ্টতা দান করেছে। বাঙালী মুসলমান সমাজেও এই পত্রিকার গুরুত্ব অসামান্য। এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই 'সওগাতে' প্রকাশিত সাহিত্যচিন্তা তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

'সওগাত' ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ সনে (নভেম্বর ১৯১৮)। সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। এর আগে বাঙালী মুসলমান পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত 'সুধাকর' (নভেম্বর ১৮৮৯), মোহাম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত 'কোহিনূর' (জুলাই ১৮৯৮), সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর' (মে ১৯০৩), মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী' (আগস্ট ১৯০৩), 'আল-এসলাম' (মে ১৯১৫) উল্লেখযোগ্য।

পূর্বগামী এসব পত্রিকার তুলনায় 'সওগাত' প্রথম থেকেই তার স্বাভাব্যকে চিহ্নিত করে। সম্পাদক তাঁর পত্রিকায় নাম রাখেন 'সচিত্র মাসিক সওগাত'। প্রথম সংখ্যাতেই স্মরণীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও বিদূষী মহিলাদের ছবি এবং কার্টুন চিত্র ছাপা হয়। পরের মাসে (ডিসেম্বর ১৯১৮) চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী 'জাতীয় মহাসম্মেলন'ের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হয় চতুর্থ সংখ্যায়। 'ইহাই ছিল পত্রিকায় প্রকাশের জন্য মুসলিম নেতাদের প্রথম ছবি তোলা' (সওগাত অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮৬, পৃ. ৬৯)।

ওধু ছবিই নয়। সওগাত প্রকাশকালে সম্পাদক প্রকাশক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন 'তাঁর পত্রিকার কয়েকটি নীতি নির্ধারণ' করেছিলেন। তাঁর তথ্যানুসারে নীতিগুলো নিম্নরূপ:

“১। লেখকগণকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া এবং মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাসমৃদ্ধ রচনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

২। প্রথম শ্রেণীর মাসিকের আদর্শে প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি এবং ছবি দ্বারা পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা।

৩। সমাজের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করা।

৪। পত্রিকার প্রতি পাঠকসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য বিবিধ বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ এবং মুসলিম জগতের সচিত্র বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করা।

৫। নারীশিক্ষা ও নারী-জাগরণমূলক প্রবন্ধাদি এবং 'চিত্রে মহিলা জগত' বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করে মহিলাদেরকে সাহিত্যসাধনা ও সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহিত করা।

৬। নতুন সাহিত্যিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তরুণ লেখকগণের রচনা প্রকাশ করে তাঁদের উৎসাহিত করা।

৭। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সম্পাদকীয়-নীতি গ্রহণ করা।" (সওগাত, ঐ, পৃ. ৬৭-৬৮) এসব নীতি বাস্তবায়নের প্রয়াস সহজসাধ্য ছিল না।

প্রথম সংখ্যার সুচীপত্র বিশ্লেষণ করলেও 'সওগাতের' বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যাবে। পত্রিকার শুরুতে দুটি কবিতা। প্রথম কবিতার রচয়িতা বেগম রোকেয়া (মিসেস আর এস হোসেন) শিরোনাম "সওগাত"; দ্বিতীয় কবিতা মানকুমারী বসুর, নাম "সুপ্রভাত"। এই সংখ্যায় আরো কবিতা লিখেছেন: কুমুদ রঞ্জন মল্লিক ('হাফেজ'), শাহাদাৎ হোসেন ("ব্রাহ্ম আবাহন"), জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ("আভাস"), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (শাহজাদী জেবুন্নেসার কবিতার অনুবাদ), ফজলুর রহিম চৌধুরী ("আলো রেখা"), ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী (হাফিজের কবিতার অনুবাদ) কায়কোবাদ (ফুল তোলা মোর হল না) ও চণ্ডি-চরণ মিত্র ("শেষ")। গল্প লিখেছেন: ব্রজমোহন দাস, জলধর সেন ও পাঁচুলাল ঘোষ। প্রবন্ধ লিখেছেন: মোহাম্মদ কে. চাঁদ. (ইসমাইল হোসেন) শিরাজী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহাদাৎ হোসেন, এস. হোসেন ও আবদুল গফুর। এ ছাড়া মুদ্রিত হয়েছে "ভাটিয়াল গীতি" ও "নিরক্ষরা বঙ্গবালার বিবাহগীতি"। স্মরণীয় প্রথম সংখ্যাতেই উদার ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সুপ্রত্যক্ষ। এই দৃষ্টিভঙ্গিই, সে কালের পটভূমিতে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে 'সওগাতকে' বিশিষ্ট করেছে। বলাবাহুল্য, 'সওগাতে' মুসলিম প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের নাম "জাহান আরা"; উল্লেখযোগ্য, তিনি প্রথম বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে ঐতিহাসিক মুসলিম মহিলাদের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রথম বর্ষে সংকলিত হয়েছে "বর্তমান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়"। তবে 'সাহিত্য সমাচার' ও 'সমালোচনা' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধে হিন্দু-মুসলমান উভয় প্রসঙ্গই উপস্থিত।

সওগাতের আত্মপ্রকাশে বাঙালী মুসলিম সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। "প্রথম সংখ্যা সওগাতে মানুষের বিশেষ করে মুসলিম নারীদের কয়েকটি ঐতিহাসিক ছবি ছাপা হয়। এই ছবি ছাপাকে কেন্দ্র করে গোঁড়া শ্রেণীর লোকেরা সওগাতের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন। তাঁরা একপা ছবি ছাপাকে ইসলাম বিরোধী কাজ বলে অভিহিত করেন। সওগাতে প্রকাশিত কোনো কোনো রচনা সম্পর্কেও তাঁরা আপত্তি উত্থাপন করেন। অপর দিকে চিন্তাশীল সাহিত্যিক সমাজ ও তরুণ লেখকগণ এর প্রতি অভিনন্দন জানান। এ ব্যাপারে ছাত্র-সমাজের ভেতর যে আনন্দের স্ফূরণ বয়ে গিয়েছিলো তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সওগাতকে কেন্দ্র করে প্রগতিপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল দলের মধ্যে মতভেদ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল।" (সওগাত, ঐ, পৃ. ৬৯)।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে, প্রথম সংখ্যা 'সওগাত' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলে কবি আনন্দিত হন। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথমে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা "পথের সাথী"।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম মুদ্রিত রচনা “বাউঙেলের আব্বকাহিনী” সওগাতে প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষ ৭ম সংখ্যায়, জৈষ্ঠ ১৩২৬ সালে। নজরুলের প্রথম গল্প “স্বামীহারা” প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যায়; নামের আগে ‘হাবিলদার’ যুক্ত হয়ে। পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা—“কবিতা-সমাধি” তাঁর গান “উষোধন” প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায়, বৈশাখ ১৩২৭ সালে।

তৃতীয় বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় (চৈত্র ১৩২৭) পর সওগাত প্রকাশ বিঘ্নিত হয়। সওগাতের নব পর্যায় শুরু হয় ১৩৩৩ সনে (১৯২৬); আঘাট ১৩৩৩ এ প্রকাশিত হয়, চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা। ১৩৩৩ এ প্রকাশিত হয় ‘বার্ষিক সওগাত’ এবং প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বাংলার মুসলিম সমাজে প্রথম সাহিত্য পরিষদ’ সওগাত সাহিত্য মজলিশ’।

১৩৩৪ সনে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সওগাত প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সনের অগ্রহায়ণ মাসে কাজী নজরুল ইসলাম ‘সওগাতের কাজে যোগদান করেন’।

“নজরুলে নেতৃত্বে সওগাতের নব্য লেখকদল তাদের লেখার ভেতর দিয়ে সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজপতিদের গোড়ামী প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিলেন। এতে রক্ষণশীল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তারা সওগাত সম্পাদক, নজরুল ইসলাম ও সওগাতের লেখক গোষ্ঠিকে নানা অশোভন উপাধিতে ভূষিত করে গালাগাল শুরু করলেন।” (সওগাত, ঐ পৃ. ৭১) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন উল্লেখ করেছেন; সে সময় সওগাত সম্পাদক ও তরুণদের উৎসাহ দিয়ে ১৩৩৬ সালের আশ্বিন সংখ্যায় নজরুল ইসলাম লিখলেন “হবে জয়”।

হবে জয়

আবার কি আঁধি এসেছে, হানিতে
ফুলবনে লাঞ্ছনা?
দু’হাত ভরিয়া ছিটাইছে পথে
মলিন আবর্জনা?
করিয়ে না ভয়, হবে হবে নয়
আপনি এ উৎপাত
অঙনের দুটো খড়কুটো লয়ে
লুকোবে অকস্মাৎ!
উৎপাতে তার যদি সখা তব
ফুলবনে ফুল বারে,
নব বসন্তে নব ফুলদল
আসিবে কানন ভরে।
অসুন্দরের প্রতীক উহারা,
ফুল ছেঁড়া শুধু জানে,
আগে যে চলিবে উহারা টানিবে—
কেবলি পিছন পানে।
অভিশাপ-শ্বাস দম্কা বাতাস
প্রদীপ নিবায় বলে
আলো না জানায়ে রহিবে বসিয়া
আঁধার আঙিনা তলে?

যে অন্তরের দীপ্তিতে তব
হাতের মশাল জ্বলে,
ফুৎকারে তাহা নিভিবে না
চল আগে চল নব বলে!
পথ ভুলাইতে আসিয়াছে যারা
চাহিবে ভুলাতে পথ,
লজ্জিতে হবে উহাদের রচা
মরু, নদী, পর্বত।
পিছনের যারা রহিবে পিছনে,
তাহাদের চীৎকারে
তুমি কি বন্দী হইয়া রহিবে
আঁধারের কারাগারে?
মাথার ওপরে শত বাজ পাখী
তবু পারাবত দল
আলোক-পিয়াসী চঞ্চল-পাখা
লুণ্ঠিছে নভতল।
মোরা যুবদল, সকল আগল
ভাঙিতে চলেছি ছুটি,
তোমারে দিয়াছি মোদের পতাকা
তুমি পড়িওনা লুটি!

সওগাতের সাহিত্য প্রাসঙ্গিক রচনাসমূহ বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণী বদ্ধ করা যেতে পারে :

১. বাংলা সাহিত্য : প্রাচীন ও মধ্যযুগ
২. বাংলা সাহিত্য : আধুনিক যুগ
৩. বিশ্বসাহিত্য
৪. ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব
৫. সাহিত্যসম্মেলন ও অতিভাষণ
৬. গ্রন্থ-সমালোচনা
৭. সাহিত্য-সংবাদ
৮. সম্পাদকীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলা সাহিত্য : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

সওগাতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১. মুসলমান কবির বৈষ্ণব পদাবলী, আবদুল করিম, পৌষ ১৩২৫
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, আষাঢ় ১৩২৬
- ৩-৭. প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য প্রসঙ্গ, আবদুল করিম, আশ্বিন ১৩২৬, পৌষ ১৩২৬, মাঘ ১৩২৬, ফাল্গুন ১৩২৬, চৈত্র ১৩২৬
৮. বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানের স্থান, মোহাম্মদ ফারাজুল হোসেন, ভাদ্র ১৩৩৫
৯. বাঙ্গলার প্রাচীন মুসলমান কবি, আবদুল করিম, সাহিত্য বিশারদ, কাতিক ১৩৪৭
১০. প্রাচীন পুথির পাণ্ডুলিপি, আবদুল কাদির, ফাল্গুন ১৩৪৭
১১. মসিয়া সাহিত্য, আবদুল কাদির, ফাল্গুন ১৩৪৭
১২. প্রাচীন কবি হায়াত মামুদ, মোহাম্মদ আফতাব হোসেন, বৈশাখ ১৩৪৯
১৩. সুফী শিতলাংশা ও তাঁহার গান, মুহাম্মদ আবদুল বারী, চৈত্র ১৩৫২
১৪. কবি সৈয়দ সোলতান, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, ফাল্গুন ১৩৫৩
১৫. কবি দৌলত উজির বাহরাম খান, আবদুল কাদির, আষাঢ় ১৩৫৪

১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা (পৌষ ১৩২৫)-এ প্রকাশিত আবদুল করিম (সাহিত্য বিশারদ)-এর “মুসলমান কবির বৈষ্ণব পদাবলী” বিষয়ের অভিনবত্বে ও বক্তব্য প্রকাশের নিজস্বতায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। মূল আলোচ্যাংশ নীচে উদ্ধৃত হল :

“প্রাচীন কালে মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, কথাটি শুনিতে একটু বিস্ময়কর হইলেও একেবারে ঐতিহাসিক সত্য - জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধের মতই সত্য। কিভাবে প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা ঐরূপ কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন সুসঙ্গত কৈফিয়ত আমরা খুঁজিয়া পাই না। বঙ্গ-সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর মত সুন্দর জিনিস আর নাই। প্রেমের কবিতা লিখিতে গেলে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ভিনু অন্য কাহারও প্রেম-বর্ণনায় প্রেমের প্রস্ফুট চিত্র অঙ্কন করা অসম্ভব। সংসারে দুই বার মাত্র প্রেম মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল,—একবার লায়লী-মজনুর প্রেমে, আর এক বার রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে। তাহা হইলেও কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান। লায়লী-মজনুর প্রেমে শুধু বিরহের মর্মান্তিক পীড়ন আছে, মিলনের মধুরিমা নাই। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে বিরহ ও মিলনের ঘাত প্রতিঘাত আছে। উভয়ের সম্মুখিতে সে প্রেম যেন অপূর্ব মধুময় হইয়া পড়িয়াছে, লায়লী-মজনুর প্রেম তেমন হইতে পারে নাই। লায়লী-মজনুর প্রেমে শুধু প্রেমের এক দিক আছে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে প্রেমের সব দিক আছে। এজন্য কবির চক্ষে এ উভয় প্রেমের তুলনা হয় না। রাধা-কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমের যেমন লুকোচুরি খেলা সম্ভব, লাইলী-মজনুর প্রেমে তেমন সম্ভব নহে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে সংসারের সমস্ত কামনার তৃপ্তি আছে, লাইলী-মজনুর প্রেমে বিরহাগ্নিতে কাম-গন্ধ এক-বারে জালিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। এজন্য প্রেম-বর্ণনায় কবি-প্রতিভা স্ফুরণের পক্ষে লায়লী-মজনুর প্রেম অপেক্ষা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমই বেশী উপযুক্ত এবং তাহাই যুগে যুগে ভারতীয় কবিগণের উপজীব্য হইয়া চলিয়াছে। এই হিসাবে বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে জগতের আর কোন ভাষার প্রেম-কবিতার তুলনা হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বৈষ্ণব কবিতার এই অনুপমেয়তাই সম্ভবতঃ প্রেম-প্রবণ মুসলমান কবিগণকে বৈষ্ণব পদাবলী-প্রণয়নে প্রণোদিত করিয়া থাকিবে, ইহা কিছু অসম্ভব নহে। সাংসারিক চক্ষে ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের ঐরূপ কার্যের বেশী সঙ্গত কারণ আমরা আর কিছু দেখিতে পাই না।

তাঁহাদের ঐরূপ কার্যের আরও একটা কারণ কল্পনা করা যায়, কেহ কেহ বলেন, মনকে কৃষ্ণ এবং দেহকে রাধা কল্পনা করিয়াই তাঁহারা রূপকচ্ছলে দেহ মনের সম্বন্ধ বা প্রেম বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আর কেহ কেহ বলেন, উপাস্যকে কৃষ্ণ এবং উপাসককে রাধা কল্পনা করিয়াই তাঁহারা এই ভাবের কবিতা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত মতের পোষকতায় তাঁহারা ফকির দরবেশদিগের প্রতি এবং সুফী মতাবলম্বী কবিদিগের কবিতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের মাইঝ-ভাণ্ডারে যে সকল ফকির কবির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের কবিতার প্রতি লক্ষ্য করিলেও উক্ত মতের সমীচীনতা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে সকল কবিই যে ঐরূপ ফকিরী ভাবে প্রণোদিত হইয়া বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়া-ছিলেন, আমরা ঐরূপ উৎকট অনুমান করিতে প্রস্তুত নহি। কেহ কেহ ঐ ভাবের প্রেরণায় এবং আর কেহ কেহ শুধু সাহিত্যমোদের খাতিরেই ঐরূপ কবিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাহিত্যমোদের খাতিরে ঐরূপ কবিতা-রচনা দোষাবহ হয়, ঐরূপ ধারণা সেকালের লোকের মনে আদৌ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এ অবস্থায় তাঁহাদের এ কার্যের সহিত তাঁহাদের ধর্ম-বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক ছিল অথবা বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ধর্ম হিসাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রতি আস্থাবান ছিলেন, ঐরূপ মনে করিবার বা তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিবার

কোন হেতু দেখা যায় না। যে ভাবেই হউক, বাহ্য চক্ষে যাঁহাকে বৈষ্ণব পদাবলী আখ্যা দেওয়া যায়, সেরূপ বহু কবিতা তাঁহারা রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং অনেকে তাঁহার রচনায় বিশেষ কৃতিত্বও প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে অগৌরবের কথা নহে। প্রাচীনকালে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আজকালকার মত এমন অহি-নকুল সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল না। মুসলমান কবির বৈষ্ণব কবিতা রচনায় সেকালের হিন্দু মুসলমান-সম্প্রীতির যে সুখদ ভাবের চিত্র নয়ন-সমক্ষে প্রতিফলিত হয়, তাহা এই শিক্ষালোক-প্রদীপ্ত হিংসা-বিদ্বেষ-বিষ-পূর্ণ যুগে একান্ত দুর্লভ। মুসলমানের ধর্ম উদারতার ধর্ম। এ বিষয়ে মুসলমান-কবিগণ যেরূপ ঔদার্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্যে হিন্দু কবিগণের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল।

যাহা হউক, প্রাচীন সাহিত্যে মুসলমান বৈষ্ণব কবির সংখ্যা অনেক। একমাত্র এ অকিঞ্চনের চেষ্টায় এপর্যন্ত এরূপ প্রায় ৫০ জন মুসলমান কবি আবিষ্কৃত হইয়াছেন। বঙ্গের মুসলমান সমাজ অদ্যাপি নিজেদের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এখনও গৃহস্থের নিভৃত কক্ষে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কত অমূল্য সাহিত্য-সম্পদ অমিলে লুক্কায়িত থাকিয়া পচিয়া গলিয়া যাইতেছে, কেহ তাহা বলিতে পারে না। ইতি পূর্বেই বা কত জিনিস কাল-প্রভাবে, লোকের অনাদরে, অগ্নি ও কীটের উপদ্রবে চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির অতল জনধি-তলে ডুবিয়া গিয়াছে, কে বলিবে? একমাত্র চট্টগ্রামেই যদি কেবল এক জনের চেষ্টায় অসংখ্য কবি ছাড়া ৫০ জন বৈষ্ণব কবি আবিষ্কৃত হইতে পারেন, তবে বিশাল বঙ্গে কত জন কবির আবিষ্কার হওয়া সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইতিহাস—তা রাজনৈতিক হউক আর সাহিত্যিক হউক, মানব সভ্যতার আলোক-বৃত্তিকা, —অতীতের একটা প্রস্ফুট প্রতিচ্ছবি। উহা যেমন বর্তমানের পথ-প্রদর্শক ও উপদেষ্টা, তেমন ভবিষ্যতেরও নির্মাতা। বর্তমানকে বুঝিতে হইলে আগে অতীতকে বুঝা আবশ্যিক। ভবিষ্যতকে সূনিশ্চিত করিতে হইলে অতীত ও বর্তমান উভয়কেই স্মরণ পথে সমুদিত রাখা চাই। বর্তমান হইতে আমরা ভবিষ্যতের একটা স্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের সম্বন্ধ একই সূত্রে গ্রথিত। ইতিহাস পাঠে সেই সম্বন্ধ মানস-পটে উত্তমরূপে প্রতিভাত হয়। ইতিহাস অতীত গৌরবের সাক্ষী,—অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া মানবকে তাহার ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ করিয়া দেয়।

ইতিহাস পাঠে—

“—হৃদয় গগনে

ভাসে তার কত ছবি, কত পুণ্য কথা,

কত বরষের হায়! কত শত ব্যথা!”

তাই সভ্য জগতে, ইতিহাসের এত সমাদর। ইতিহাসের জন্মদাতা মুসলমানেরা আজ ইতিহাসের আদর বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, ইহা বড়ই পরিতাপের কথা! বিজাতীয়ের হস্তে আমাদের ধর্মের ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস কিরূপ কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা আর কাহাকেও এখানে বলিতে হইবে না। সেই কালিমার যদি কিছুমাত্রও কেহ অপনোদন করিতে পারেন, তবেই তাঁহার লেখনী ধারণ সার্থক হইবে। কেবল বাজে গান, গল্পে কোন জাতির গৌরব বড় একটা বাড়িতে পারে না। বিদ্বেষ বুদ্ধিতে নহে, প্রতিহিংসা-বৃত্তির বশে নহে, কিন্তু শান্ত মনে—ধীর চিত্তে এ কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে অগ্রসর হইয়া দেখাইতে হইবে যে, মুসলমানগণ যে বর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন, সেবর্ণে চিত্রিত হওয়ার পাত্র নহেন? দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণ-নিচয়ে মুসলমানগণ জগতের যে কোন সভ্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভিন্ন হীন নহেন। এরূপ চিত্রাঙ্কন করিতে পারিলে বিজাতীয়দের

চিত্রিত চিত্র সূর্য্যোদয়ে শিশিরবিন্দুর মত আপনিই অদৃশ্য হইয়া যাইবে। সত্যের নিকট অসত্য আপনিই মস্তক অবনত করিবে। “মিছা কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়?” আমাদের ধর্ম্মের মহিমা, আমাদের মহাযশাঃ পূর্ব্বপুরুষগণের অগাধ জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা, আমাদের অপূর্ব্ব অতীত গৌরবের কাহিনী-প্রচারে,—এক কথায় আমাদের জাতীয় ইতিহাস-চর্চায় আমার ভ্রাতৃবৃন্দ আবার মনোনিবেশ করুন, এই আমার কাতর প্রার্থনা।

হিন্দুর প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের মত মুসলমানদেরও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের বিরাট কলেবর; কিন্তু আগেই বলিয়াছি, তাহা আজও সম্পূর্ণ অনাবাদ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। তাহার উদ্ধার হইলে যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আমরাও একটা বিশেষ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইব, সে কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। ইতিমধ্যেই একমাত্র এই নগণ্য লেখকের চেষ্টায় প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের এক কোণে মুসলমানের জন্য একটা উচ্চ স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যেরও উদ্ধার-কল্পে এখন মনঃসংযোগ না করিলে পশ্চাতে আমরাগকে বিশেষ অনুতাপ করিতে হইবে, তাহা একরূপ নিশ্চিত।”

আবদুল করিম এর পর ‘নমুনাস্বরূপ’ সাতজন মুসলমান কবির রচিত সাতটি বৈষ্ণব পদ সংকলন করেছেন। প্রত্যেক পদশীর্ষে রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে। পদ সাতটির রচয়িতা প্রথম চরণ ও রাগের নাম নিম্নরূপ:

- ১। মোহাম্মদ হাসিম। না জানো নাচিনো কেবা জবুনার কুলে। রাগ—গান্ধার।
- ২। আএনদ্দিন। বন্ধুআ মোর পরাণের পরাণ। রাগ—পরচ্ কামোদ।
- ৩। মির্জা কান্ধালী। কেনে আইলুম যমুনার জলে। রাগ—তুরি।
- ৪। মনুজর। আজু সই কি দেখিলুং স্বপনে। রাগ—আহির পরচ্।
- ৫। মীর ফাজোলা। রাধা মাধব নিকুঞ্জ বনে। রাগ—কেদার।
- ৬। ছৈয়দ মর্ত্তুজা। দারুণ পূআ হামো না বোলা এ। রাগ—ধানসি।
- ৭। সেখ কবির। ও কি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি। ধানসী বেলাবণী।

প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩২৬) প্রকাশিত আবদুল গফুর সিদ্দিকীর ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা’ একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে তথ্য সংগ্রহের গুরুত্বের বিশেষত মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা তিনি আলোচনা করেছেন:

“অধুনা “বঙ্গ সাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি” শীর্ষক বহু প্রবন্ধ, সাহিত্য বিষয়ক সভাসমিতিতে পঠিত এবং মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনা করেন কিম্বা আলোচনায় অগ্রসর হইয়েন, দুঃখের বিষয় তাঁহারা কেবল সাহিত্যের একটা দিকুই দেখিয়া থাকেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া

প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হয়েন না। মাত্র দুই চারিখানি পুস্তক কিম্বা দুই একখানি মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে প্রকাশিত দুই চারিটি প্রবন্ধ, তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে।

বিশেষতঃ প্রবন্ধ লেখক মহোদয়েরা প্রবন্ধ রচনার পূর্বে অথবা প্রবন্ধ রচনার সময় বঙ্গদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা ভাবিয়া দেখা বোধ হয় আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। এক্রপ হওয়া যে নিতান্তই অবাস্তব, চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। এখন—বিংশ শতাব্দীর এই মিলনের যোগে, কেবল এক তর্ক ডিক্রি না দিয়া, দেশের কল্যাণার্থ ও দেশবাসীর কল্যাণার্থ হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ-সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া যে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, যদি কেহ তাহা অস্বীকার করেন তবে তিনি এক মহা সর্বনাশকর ভ্রমে পতিত হইবেন সন্দেহ নাই।

মুসলমান সম্প্রদায় যে বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী, সে কথা এখন আর নুতন করিয়া বলিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। তাহারা বর্তমান সময়ের উপযোগী শিক্ষায় বঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হইলেও, বহুদিন হইতে পৃথক ভাবে তাহারাও সাহিত্য সাধনা দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে। বঙ্গের মুসলমান সাহিত্যিকগণ এ পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে—প্রায় সাড়ে নয় সহস্র। ইহা ব্যতীত আধুনিক সাহিত্যের হিসাবেও মুসলমান সমাজের পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দুই শত।

“বঙ্গ সাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি” সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, মুসলমান-সাহিত্যকে বাদ দিয়া, কেবল হিন্দু সাহিত্যের কথা বলিলে চলিবে কেন? ইহাতে দেশের ও জাতির যে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? হিন্দু সাহিত্যই কি কেবল বাঙ্গালীর সাহিত্য? হিন্দুই কি কেবল বাঙ্গালী?

এই শ্রেণীর প্রবন্ধ লেখক মহোদয়েরা কেবল যে মুসলমান দিগকে ও মুসলমান দিগের সাহিত্যকে বাদ দিয়া প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হয়েন, তাহা নহে। তাহারা বঙ্গ সাহিত্যের আর একটা দিক্ সম্বন্ধেও চিন্তা করেন না। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে যাহারা পণ্ডিত শিরোমণি বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহারা মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, সকল সাহিত্যেরই দুইটি দিক্ আছে। সেই দুইটি দিকের একটি সাধারণ দিক্, আর একটি অসাধারণ দিক্।

বিশ্বের পণ্ডিত মণ্ডলী সাহিত্যের এই সাধারণ দিক্কেই পল্লীসাহিত্য এবং অসাধারণ দিক্কেই ‘সহরের’ সাহিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে এই পল্লী-সাহিত্যকে আট-পৌরী সাহিত্য এবং ‘সহরের’ সাহিত্যকে পোষাকী সাহিত্য আখ্যা প্রদান করিতে পারেন।

আমাদের এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে না যে, সাহিত্যের ‘পোষাক-দিক্’ হইতেছে, ‘সহরের’ খোষ মেজাজী বাবু-মিয়া দিগের কীৰ্ত্তি এবং আট-পৌরী-হইতেছে, পল্লী-গ্রামের “অনাভাবে শীর্ণ ও চিন্তা-জরে জীর্ণ” ব্যক্তিদিগের প্রাণের উচ্ছ্বাস।

যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের সাহিত্যিক বন্ধুগণ মুসলমান সাহিত্য ও পল্লী-সাহিত্যের বিষয় সম্পূর্ণরূপে না হউক অন্ততঃ অধিকাংশ ভাবে অবগত হইতে না পারিবেন, আমাদের মনে হয়, তত দিন “বঙ্গসাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি” শীর্ষক প্রবন্ধ রচনার

সময় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে না। যত দিন সহরের সাহিত্যের অনুপাতে পল্লী-সাহিত্য সংগৃহীত না হইবে, তত দিন তুলনায় সমালোচনা করিবার সুযোগ ও সুবিধা হইবে না, এবং যত দিন তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইবার মত যথেষ্ট উপকরণ আমাদের হস্তগত না হইবে, তত দিন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হইবে না।

যে পল্লীবাসী দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ, অধুনা ‘সহরের’ খোষ-মেজাজী বাবু-মিঞা আমরা—তাহাদিগের সেই প্রাণ মাতান ও আবেগভরা সাহিত্যকে বাদ দিয়া “বঙ্গসাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি” শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া, বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু এ কার্য্য যে আমাদের পক্ষে নিতান্তই গহিত, কোন ক্রমেই কেহ তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

তিন বৎসর পূর্বে, ১৩২৩ বাঙ্গালা সালের মাঘ মাসে, বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিক্ড়া গ্রামে, সাহিত্যিক দিগের যে সম্মেলন হইয়াছিল, সেই সভায় আমি আমার অভিভাষণে বলিয়াছিলাম,

“যত দিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের সাহিত্যিক দিগের অন্তরে পল্লী-সাহিত্য সংগ্রহের ও মুসলমানী-সাহিত্য আলোচনার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া না উঠিবে, তত দিন বঙ্গের—তথা বাঙ্গালী জাতির জাতীয় উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত হইবে না।

“সাহিত্য ক্ষেত্রে ও সাহিত্যিক মহলে আর ‘সংখ্যার’ দল গড়িলে চলিবে না। এখানে কথা ও কার্য্য এক করিতে হইবে। ‘মাতৃসেবক ও মাতৃমন্দিরের সেবক, বলিয়া দেশের ও দেশের নিকট পরিচিত হইবে, অথচ সেবকের যাহা কর্তব্য—সেবকের যাহা করণীয়, তাহা করিবে না; এই ভাবের মাতৃসেবকের এখন আর আদৌ আবশ্যক নাই। এখন খাঁটি সোনার আবশ্যক। নীহারী-সোণা দ্বারা গিনী সোণার অলঙ্কার প্রস্তুত কার্য্য কখনও চলে নাই; এখনও চলিবে না।

“যদি মাতৃ-ভাষা জননীকে, বিশ্ব-বাসীর সম্মুখে বড় করিয়া, নিজে বড় হইয়া, জাতির গৌরব-শ্লাঘা বাড়াইতে চাও, তাহা হইলে সরল মনে ও সরল প্রাণে খাঁটি সেবকরূপে ভাষা-জননীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা যদি পার, নিজে ধন্য হইবে এবং দেশ ধন্য হইবে।

“কিন্তু খাঁটি সেবক হইতে হইলে কেবল ‘সহরের’ ‘পোষাকী-সাহিত্য’ লইয়া নাড়া-চাড়া করিলে চলিবে না। মুসলমানী সাহিত্য ও পল্লীর আট-পৌরী সাহিত্যকে আঁকড়া-ইয়া ধরিতে হইবে। এ কার্য্য উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে ভাষা জননীর দক্ষিণ দিক্ পঙ্গু ও অচল হইয়া যাইবে।

* * * *

“বাঙ্গালী যদি বাস্তবিক নিজের, দেশের ও জাতির কল্যাণ প্রার্থী হয়, তবে শখের ‘হাফ-আখড়াই’ দলের গাহকের হিসাবে কেবল সহরের সাহিত্যকে “আলালের ঘরের দুলাল” সাজাইতে আর অগ্রসর হইবে না।”

মুখে উপদেশ দান করা এক এবং সে উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা আর এক। উপদেশ দান করা যত সহজ, উপদেশ প্রতিপালন করা তত সহজ নহে। যিনি এই মহাসত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে করিতে পারেন, তিনিই মহৎ। এই ‘মহৎ’

পদবাচ্য হইবার ন্যায় যোগ্যতা আমার আদৌ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে সময় অতিবাহিত করাও'ত পুরুষকার নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে 'মুসলমানী-বাক্সালা সাহিত্যের বিবরণ সংগ্রহ : মুসলমানী সংবাদ পত্রের ইতিহাস সংগ্রহ ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের আওলিয়া দরবেশ দিগের জীবন কাহিনী সংগ্রহ' কার্যে আমাকে অনেক সময় ব্যয় করিতে হইতেছে। কিন্তু তথাপি আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সাধ্য এই কার্যে সময় ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা এই চারি জেলার 'পল্লী-সাহিত্য' সংগ্রহে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

যদিও আমি এই কার্যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই কিন্তু আমার আশা হইতেছে যে বিভূ কৃপায় শীঘ্রই আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ হইব। অদ্য কেবল বশিরহাট, মহাকুমার দুই চারিজন মৃত সাহিত্যিকের অাম্পূর্ণ পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এরপর আবদুল গফুর সিদ্দিকী বশিরহাট মহাকুমার মুনসী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী (জন্মনামা ১১০১), মনোহর চক্রবর্তী, রামজীবন হালদার, মুনসী মোহাম্মদ খোদাদাদ সিদ্দিকী (মকসুদনামা), মুনসী হোসেন বখশ সিদ্দিকী (পদকর্তা, হাতেম তাই রচয়িতা), মুনসী গোলাম আলী, মুনসী সৈয়েদ আলী নওয়াজ, মোলানা হাফেজ সৈয়েদ আমানউল্লা (হেদায়েত ইসলাম প্রণেতা) মুনসী গোলাম মাওলা সিদ্দিকী (৩২টি দোভাষী পুথি রচয়িতা, হাবীবী প্রেস প্রতিষ্ঠাতা) মুনসী বদিউজ্জামা, সাজন গাজী (তিতুমীরের পার্শ্ব চর নারিকেল বেড়িয়ার লড়াই রচয়িতা)। খয়রুননিসা খাতুন, স্বর্শীলাসুন্দরী দেবী ও কাজী কেরামতুল্লাহ রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেছেন। এ সব লেখককে প্রবন্ধকার 'পল্লী-সাহিত্যিক' বলে অভিহিত করেছেন। এদের অনেকেই অবশ্য লেখকের সমকালীন।

প্রবন্ধের উপসংহারে আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখেছেন। “প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এ অধম প্রবন্ধ লেখক, উপরে যে কয় জন মৃত সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করিল, তাহাই যথেষ্ট নহে। আপনারা সন্ধান করিলে এরূপ শত শত লোকের শত শত পল্লী সাহিত্যিকের সন্ধান পাইবেন। যদি আপনারা জননী বাক্‌দেবীর কীৰ্ত্তিমান সন্তানরূপে জগৎবাসীর নিকট পরিচিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া, ভূতপূর্ব ছোট, বড়, মাঝারী, সকল কবি ও সকল সাহিত্যিকের লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধার করিতে হইবে এবং সেই সকল কাব্য-কোহিনুর বাণী মন্দিরে সাজাইয়া মন্দিরের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে হইবে। এ কার্যে ক্লান্ত হইলে চলিবে না, ভাল মন্দের বিচার করিলেও চলিবে না। কারণ বিচারের সময় এখনও আইসে নাই; সে সময় বহু দূরে ও বহু পশ্চাতে অবস্থান করিতেছে!”

আবদুল করিমের “প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য প্রসঙ্গ” তাঁর সংগৃহীত পুথির বিবরণী। ইতিপূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ দুই খণ্ডে তাঁর ৬০০ পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন। সওগাতে ধারাবাহিক ভাবে তিনি অন্যান্য পুথির বিবরণ প্রকাশ শুরু করেন। প্রথম বর্ষ একাদশ সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত ৩১টি পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়। ২ : ৫ সংখ্যাতো প্রবন্ধ শেষে “ক্রমশঃ” মুদ্রিত হয়েছে কিন্তু পরবর্তী সংখ্যা থেকে এই লেখা আর ছাপা হয়নি। এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনা অংশ (১:১১) নিম্নরূপ :

“বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, আমি অসংখ্য প্রাচীন বাঙ্গালা হাতের লেখা পুথি সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে ৬০০ পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক দুইখণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৬০০ পুথির মধ্যে অনেকগুলি পুথির একাধিক প্রতিলিপি আমার নিকট পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। উক্ত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পরেও অনেকগুলি নূতন পুথি এবং পূর্বে প্রাপ্ত অনেকগুলি পুথির একাধিক প্রতিলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। একখানি পুথির বিবরণ একবার লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সেই পুথির অপর প্রতিলিপিগুলির কোন বিবরণ আমি এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত করা আবশ্যিক বোধ করি নাই। যাঁহারা কোনদিন প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ অবগত আছেন যে, বাঙ্গালা হাতের লেখা পুথির এক প্রতিলিপির সাহিত্য অপর প্রতিলিপির পাঠের অমিল এত বেশী যে, অনেক সময় প্রত্যেক প্রতিলিপিকেই এক একখানি স্বতন্ত্র পুথি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই হিসাবে আমার নিকট যতগুলি প্রাচীন পুথি সংগৃহীত আছে, তাহাদের সমস্তেরই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। প্রাচীন পুথিগুলি কালবশে দিনি দিন ধ্বংশের পথে অগ্রসর হইতেছে। কালের কঠোর কবল হইতে তাহাদিগকে বিমুক্ত রাখা মানবের সাধ্যাতীত; কিন্তু তাহাদের এক একটা ক্ষুদ্র বিবরণ রক্ষা করা কিছু কঠিন কাজ নহে। বঙ্গদেশের ও সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন-ব্যাপারে সে সকল বিবরণ একদিন প্রত্ন-তত্ত্ব-নেমীর অশেষ সহায়তা করিতে পারে, এরূপ আশা দুরাশা নহে। এই সব কারণে, বিশেষতঃ আমার অবর্তমানে আমার বহুকষ্ট সংগৃহীত এই সকল দুর্লভ, অমূল্য ও দুর্লভ গ্রন্থরাজির কোন কুল-কিনারা অন্যদীয় হস্তে হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় আমার সমস্ত পুথিরই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ বঙ্গ সাহিত্যের দপ্তরে আমার নিজ হস্তেই রাখিয়া যাই, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার অর্থ-সামর্থ্য আমার নাই। এ বিষয়ে একবার ঢাকা সাহিত্য পরিষদের দ্বারস্থ হইয়াছিলাম, সেখানে আশা সফল হয় হয় হইয়াও হয় নাই। তারপর “মানসী ও মর্শ্ববাণী”র নিকট গিয়াও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গতি এখন ভিন্মুখী। উহার আশ্রয় লইতে চাহিলেও বা পাই কোথায়? অবশেষে ‘সওগাতে’র অধ্যক্ষ বন্ধুবর নাসির-উদ্দীন সাহেবের উৎসাহে মাত্র আজ জীবনের অপরাহ্নকালে শুধু প্রত্নতত্ত্বালোচনার দিকে চাহিয়া আমি এই দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। আমাঘরা এই কার্য সমাধা হইবে কিনা, তাহা একমাত্র খোদাতালাই জানেন। আশার উপর সংসারের স্থিতি। আমিও কুহকিনী আশার উপর নির্ভর করিয়াই এই সূদীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। পাঠকগণ আশীর্বাদ করিবেন।

প্রাচীন সাহিত্যের অদ্ভুত বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতির কিরূপ পাঠোদ্ধার হওয়া উচিত, তাহা লইয়া সুধীগণের মধ্যে নানা মত বর্তমান। অধিকাংশের মতে অবিকল পাঠোদ্ধার করাই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কারণ, প্রাচীন সাহিত্যের সংশোধন করিতে গেলে তাহার ঐতিহাসিকতা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এজন্য পাঠোদ্ধার কার্যে আমরা মহাজনগণের মতেরই অনুসরণ করিব।”

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের “বাঙ্গলার প্রাচীন মুসলমান কবি” (কাতিক ১৩৪৭) চৈত্র ১৩৪৬ সংখ্যা সওগাতে প্রকাশিত আবদুল কাদির-এর একই শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধের সমালোচনা। প্রবন্ধটিতে সাহিত্য বিশারদ বটতলার পুথি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত (‘সত্যদ্রষ্টা’) সে বিষয়েও তাঁর প্রত্যক্ষ পরামর্শ আছে। প্রবন্ধটি প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল :

“মুসলমান সমাজ আজও প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তজ্জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের প্রাচীন সাহিত্যের সমাদর ও আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না। ভাগ্যক্রমে দুই একজনকে এবিষয়ে লেখন চালনা করিতে দেখিলে আমার আনন্দের সীমা থাকে না। সারা জীবন ধ্যান-রত যোগীর ন্যায় সাধনা করিয়াও দুই চারি জনকে ব্যতীত আর কাহাকেও আমার পথানু সরণ করাইতে পারি নাই। এবিষয়ে আমার সাধনার ব্যর্থতা দেখিয়া আমি মর্শ্বাহত হইয়া থাকি। জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া সহায় পাইয়াছি আমার শিষ্যোপম পরম কল্যাণম্পদ ডক্টর এনামুল হক মিঞাকে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি সত্যকার অনুরাগ ও প্রাণ লইয়া একমাত্র তিনিই প্রাচীন সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষেত্রে শ্রীহট্টের সুলেখক আশরাফ হোসেন মিঞার নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনিও প্রাচীন সাহিত্যের প্রকৃত ভক্ত ও খাঁটি অনুরাগী ব্যক্তি। দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তরুণ লেখক আবদুল কাদির মিঞাও এখন এই কন্টকাকৃত বিজন গহন বনে বিচরণ করিতে সাহসী হইয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, তাঁহার আলোচ্যমান প্রবন্ধটি কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয় লইয়া লিখিত না হওয়ায় হিন্দুস্থানীদের খিচুরীতে পরিণত হইয়াছে। প্রবন্ধটি শ্রুতিমধুর হইলেও তাহাতে সার কথা কিছুই নাই। তিনি প্রবন্ধটিতে কত কথারই অবতারণা করিয়াছেন—কিন্তু কোন কথারই স্পষ্ট সমাপ্তি-বিধান করেন নাই। তাহার প্রবন্ধের কোথাও স্বাধীন গবেষণার পরিচয় নাই, কিন্তু পরের কথার আবৃত্তি করিতে যাইয়া তিনি এমন কয়েকটি কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা অনেক স্থলে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যে বিপর্যয় ঘটাইতে এবং তৎসম্বন্ধে পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইতে পারে। তিনি প্রবন্ধের নানা স্থানে নানা মতামত পরিব্যক্ত করিয়াছেন। সকল মতের সহিত আমার মিল না থাকিলেও তাঁহার ঐক্য মত গ্রহণের স্বাধীনতায় আপত্তি করা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তাই যেই কয়টি কথা তিনি বেপরোয়া ও অসতর্কভাবে লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল, আমি এস্থলে কেবল তাহারই আলোচনা করিব।

কেহ আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করিতে চাহিলে তাঁহাকে যে অনেক অন্তরায়ের সম্মুখীন হইতে হয়, অবশ্য একথা আমি বিস্মৃত হই নাই। উপকরণের অভাব পদে পাদে তাহাকে বাধা দিয়া থাকে। কারণ আমাদের প্রাচীন পুথিপত্র অদ্যাপি সংগৃহীত হয় নাই। হিন্দুদের মত দশ জনে দশ দিক হইতে সে বিষয়ে কেহ কোন আলোচনাও করিতে পারেন নাই। একমাত্র আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা অন্যের অধিগম্য নহে এবং আমি সারা জীবন সাময়িক পত্রিকাদিতে যাহা লিখিয়াছি, তাহা আমার সংগ্রহের তুলনায় একদিকে যেমন সমুদ্রে গোম্পদতুল্য, অন্যদিকে তৎসমস্ত ঐ সকল পত্রিকার কলেবরেই আবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। বহুদিন পূর্বে “সাহিত্য পরিষৎ” হইতে আমার যে “প্রাচীন পুথির বিবরণ” প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অনেকেরই নয়নপথে পতিত হয় নাই। সেই বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত আমি যে অসংখ্য পুথিপত্র সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার বিবরণ অদ্যাপি পাঠক সমাজের গোচরীভূত হইতে পারে নাই। আমার সংগৃহীত পুথিরাশির যে বিরাট বিবরণ লিখিত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা প্রকাশিত হইলে এক দিকে মুসলমান কবি-গণের সাহিত্যসেবার পরিমাণ দেখিয়া পাঠকগণ বিস্মিত ও পুলকিত হইতেন এবং অন্যদিকে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যালোচনার পথ বহুল পরিমাণে সুগম হইত বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমার এমন অর্থ-সঙ্কতি নাই যে, আমি স্বব্যয়ে তাহা প্রকাশিত করিতে পারি। তজ্জন্য দেশের কাছে ভিক্ষার খুলি লইয়া হাত পাতিয়াছিলাম,—কিছুই মিলে নাই। অগত্যা “ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ” এই নীতি বাক্যই সার্থক হইয়াছে এবং

আমার লিখিত জাতীয় সাহিত্য, সমাজ ও ইতিহাস সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য-সম্বলিত বিবরণ-গুলি আমার কাষ্ঠ-পোটিকায় আবদ্ধ থাকিয়া ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতেছে। এই অবস্থায় আবদুল কাদির মিঞার প্রবন্ধে যদি কিছু ভ্রম-প্রমাদ থাকিয়াই থাকে, তাহা আমি ক্ষমাই বিবেচনা করি।

অবশ্য জানি যে, বটতলায় ছাপা বহু সংখ্যক প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়, যাহা অবলম্বন করিয়া আমাদের তরুণ লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন সাহিত্যালোচনা করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারেন। আমি আগে হইতেই তাঁহাদিগকে সতর্ক করিতে চাই যে, বটতলার ছাপা পুথির উপর একটি কাণা-কড়ির মূল্য বা রতি প্রমাণ শ্রদ্ধা অর্পণ করাও কাহারও উচিত নহে। বটতলার প্রকাশকেরা একেত' বিদ্যাবুদ্ধি শূন্য লোক, তার উপর তাহারা ব্যবসাদার। তাহাদের ছাপা পুথিতে রচয়িতার রচনার মৌলিকতা প্রায়ই রক্ষিত হয় নাই বলিলেও চলে। তাহারা জয় গোপালী কাণ্ড করিতে বিরূপ সিদ্ধ-হস্ত, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আলাওলের পুথিগুলি দেখিলেই যথেষ্ট হইবে। এজন্য পাঠক-গণকে বেশী দূরে যাইতে হইবে না। আমি তাঁহাদিগকে কাদির মিঞার “ছয়ফল মূলুক-বদয়ুজ্জামাল” হইতে উদ্ধৃত—

“বদয়ুজ্জামাল রূপ দেখিয়া নমুনা।

ইস-হারা শাহাজাদা হইল দেওয়ানা।”

এই ছত্র দুইটি দেখিতে অনুরোধ করি। ইহা যে আলাওলের রচিত নহে, তাহা দৃষ্টি মাত্রেই বুঝা যায়। ইহার প্রত্যেক শব্দের অক্ষর হইতে পশ্চিম বাঙ্গালার হস্তের গন্ধ ঠিকরিয়া বাহির হইতেছে। বলা বাহুল্য ছত্র দুইটি প্রকাশকের স্বহস্তের রচিত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আর একটা কথা, বটতলার সাহিত্যই সমগ্র বঙ্গের সাহিত্য নহে। উহার বেশীর ভাগ পশ্চিম বাঙ্গালার দোভাষী বাঙ্গালায় লিখিত। দোভাষী বাঙ্গালার সাহিত্যে সাহিত্যিক মূল্য ও মর্যাদা পাইতে পারে, এমন রচনা বড় বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, সে সব কথা এখানে বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না।

কাদির মিঞা কি প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, কিছুই বুঝিলাম না। তিনি এক কথার পর আর এক কথা, সেই কথার পর আর এক কথা—এই ভাবে এলোমেলো করিয়া পটের পর পট পরিবর্তন করিয়া চলিয়াছেন। কোন পটই পাঠককে সম্পূর্ণভাবে দেখিতে দেন নাই। তাঁহার মত শক্তিশালী সুলেখকদের হাতে আমরা অনেক ভাল জিনিসেরই আশা করি। যাহা হউক, এখন আসল কথা বলি।

“গোরক্ষ বিজয়” সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, “উহার প্রারম্ভে আল্লাহ-রসুলের পরিবর্তে নাথ গুরুর ‘বন্দনা’ রহিয়াছে”,—

গোর্খের চরিত্র দেখি হাসে মহেশ্বর।

যোগী নাই জগত ভিতর॥

আমার সম্পাদিত “গোরক্ষ বিজয়ে”র প্রারম্ভে যে “বন্দনা” আছে, তাহা এই :—

“প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।

নিয়মে সজিলা প্রভু সকল সংসার॥

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল স্বজিলা ত্রিভুবন।
নানা রূপে কেলি করে না জ্ঞাএ লক্ষণ॥
তবে প্রণামিয়ে তান নিজ অবতার।
নিজ অংশে করিলেক হইতে প্রচার॥”

এই “বন্দনা” কি আল্লাহ-রসুলের “বন্দনা” নয়? অথচ এই “বন্দনা” বাদ দিয়া তিনি উপরের ছত্র দুটিকেই “বন্দনা” রূপে পাঠকের সম্মুখে ধরিলেন কিরূপে, বুঝা দুষ্কর।

কাদির মিঞা একস্থানে লিখিয়াছেন,—এনামুল হক সাহেব “রসুল বিজয়” নামক যে কাব্যখানির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে “বীর আবদুল্লাহ”র সহিত “নকলক্ষ” নামক এক আরব্য রাজার যুদ্ধ-বিগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে “সাহিত্য পরিষদে” সংরক্ষিত ৫৯৪ নং পুথিখানি পঠিতব্য। উহার নামও “রসুল বিজয়” বলিয়া অনুমিত হয়।” × × ×

× × শ্রীযুত ইউসুফ নূপতির আদেশে পীর শাহ মোহাম্মদ খানের চরণ ধ্যান করিয়া জৈনুদ্দিন নামক কবি ইহা রচনা করেন।” এতৎসম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমার “পুথির বিবরণে” উল্লিখিত ৫৯৪ নং পুথির নাম “রসুল বিজয়”ই বটে। উহাকে ঐ নামের পুথি বলিয়া অনুমান করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং উহা “পরিষদে” সংরক্ষিত নহে। উহা আমার নিকটেই আছে। এই পুথিখানি গোড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের (রাজত্ব কাল ১৪৭৪—১৪৮২ খৃষ্টাব্দ) আদেশে কবি জৈনুদ্দিন রচনা করিয়াছিলেন। ইহাই মুসলমান রচিত সর্বপ্রথম পুথি কিনা, এখনও সে কথা বলিবার সময় হয় নাই। শেখ চান্দ ও জৈনুদ্দিন ভিনু সাবিরিদ্দ খান নামক কবিও “রসুল বিজয়” নাম দিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। আরও কেহ লিখিয়াছেন কিনা, আমার পুথিগুলি না খাঁটিলে বলিতে পারি না।

কাদির মিঞা অন্যত্র লিখিয়াছেন,—“ভারতচন্দ্রের প্রতিপত্তিতে যেমন মুকুন্দরামের কাব্যকীর্তি ঢাকা পড়িয়াছে, তেমনই সৈয়দ আলাওলের খ্যাতির আড়ালে দৌলৎ কাজীর কবি-মশঃ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।” তাঁহার এ কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। চট্টগ্রামে দৌলৎ কাজীর গ্রন্থ আলাওলের গ্রন্থরাজির মতই আদৃত ও পঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার গ্রন্থের পটভূমিকা সম্বন্ধে স্থনীতি বাবু কি লিখিবেন, দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিলাম। কবির লেখা হইতে এইমাত্র জানা যায় যে, “সাধন” নামক কোন কবির ঠেঠ হিন্দী ভাষায় রচিত ও চোপদী ও দোহার ছন্দে লিখিত “সতী ময়না প্রসঙ্গ” কবি দেশী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন।

কাদির মিঞা অন্যত্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা একেবারে সাজ্জাতিক, তিনি লিখিয়াছেন—, “আলাওল” “পদ্মাবতী” পুথি ফারসী হরফে প্রণয়ন করিয়াছিলেন; আলাওলের পুত্র সৈয়দ নুরুদ্দিনের নিকট হইতে মৌলবী হামিদুল্লাহ উহার কপি রাইট ক্রয় করিয়া “বাঙ্গালা ভাষায় ও বাঙ্গালা অক্ষরে” প্রকাশ করিয়াছিলেন।” কাদির মিঞা এই কথা-গুলি লিখিয়া কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহিয়াছেন, জানি না। “পদ্মাবতীর” প্রকাশক মৌলবী হামিদুল্লাহ আমার ছোটকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন,—স্বতরাং অতি আধুনিক ব্যক্তি। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র “পদ্মাবতীর” মালীক হন। আলাওল আনুমানিক ১৬০৭—১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এহেন আলাওলের পুত্র ১৯শ শতাব্দীর ২য় পাদ পর্যন্ত কিরূপে বর্তমান থাকিয়া পুথির কপি রাইট বিক্রয়

করিয়াছিলেন? ইহা যে কোন মতেই সম্ভব নহে। বস্তুতঃ প্রকাশকের ঐক্লপ কথাগুলি কোন দুরভিসন্ধিমূলক নিছক মনগড়া উক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। আমার “প্রাচীন পুথির বিবরণে” প্রকাশকের এই মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বহুদিন পূর্বেই (১৩১০ বঙ্গাব্দে) তাহা সাহিত্য সমাজের গোচরীভূত করিয়াছিলাম। কাদির মিঞা আমার “পুথির বিবরণ”টি ঘাঁটাঘাঁটিও করিয়াছেন দেখিতেছি। তথাপি এই পুরাতন কাস্থলি ঘাঁটিবার তাঁহার কি প্রয়োজন হইয়াছিল, পাঠক সমাজ তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

“আলাওল তাঁহার পুথিখানি “ফারসী” হরফে লিখিয়াছেন”,—প্রকাশকের এই উক্তি আদৌ সত্য নহে। আলাওল কোন হরফে লিখিয়াছিলেন, সে কথা বলা এখন সম্ভব নহে। যদি বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন হরফে তিনি লিখিয়াও থাকেন, তাহা “ফারসী” হরফে নহে “আরবী” হরফেই বটে। আরবীতে লেখা “পদ্মাবতী” এবং আরও বহু পুথি আমার নিকট সংরক্ষিত আছে। এক সময়ে চট্টগ্রামে আরবী হরফে বাঙ্গালা লেখার একটা রীতি প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। আমার “পুথির বিবরণ” প্রকাশিত হইলে পাঠকগণ তাহার বহু নিদর্শন দেখিতে পাইবেন।

কাদির মিঞা অন্যত্র লিখিয়াছেন, “ × × × সাহিত্য-বিশারদ সাহেবের মতে আলাওলের পূর্ণ ও প্রকৃত নাম ছিল “আলাওল হক”। কিন্তু আলাওলের রচিত কোনো কাব্যেই এরূপ ভণিতা পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, “আল্-আউয়াল” শব্দটিই “আলাওয়াল” বা “আলাওল” রূপ লাভ করিয়াছে।” এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থেই আলাওলের পূর্ণ নাম পাওয়া যায় নাই। সংসারে এ ধরনের নাম যে ভাবে প্রচলিত আছে, তাহা বিবেচনা করিয়াই আমি অনুমান মাত্র করিয়াছিলাম যে, আলাওলের পূর্ণ ও প্রকৃত নাম হয়ত “আলাউল হক” ছিল। কবি নিজের খণ্ডিত নামেই সর্বত্র ভণিতা দিয়া গিয়াছেন এবং এই খণ্ডিত নামেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত সত্য কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার পূর্ণ নাম অনুমানও করিতে পারিব না, এ কেমন কথা? আমি ত তাঁহার পূর্ণ নাম “আলাউল হক” অনুমান করিয়াছিলাম। কাদির মিঞা তাঁহার পূর্ণ নাম কি দিলে খুশী হইবেন, জানিলে স্তব্ধ হইতাম। “আতাউল”, “ইমাউল” ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিতে যদি কাদির মিঞার আপত্তি না থাকে, “আলাউল” নাম গ্রহণ করিতে তাঁহার আপত্তি কি, বুঝিলাম না। আলাউল শব্দ যখন হইতে পারে, তখন শব্দটির সোজা সহজ ব্যুৎপত্তি গ্রহণ না করিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কষ্ট কল্পনার সাহায্যে “আল্-আউয়াল” করিয়া আবার তাহার অপভ্রংশ “আলাওয়াল” বা “আলাওল” রূপে গ্রহণ করিবার হেতু বা তাৎপর্য্য কি, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝি না। লেখনী যখন ধারণ করিয়াছি, তখন “নূতন” কিছু উদ্ভাবন করিব, ইহাই যদি কাদির মিঞার অভিপ্রেত হয়, তাহাতে আমার বলিবার কিছুই নাই।

শেখ মালিক মোহাম্মদ জায়সী ৯২৭ হিজরীতে “পদুমাবৎ” রচনা করেন। “অঙ্কস্য বামা গতি” সূত্র ধরিয়া আমরা ঐ সনকে ১৫২৯ হিজরী ধরিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, আমাদের ঐ গণনা ঠিক হয় নাই। এই ভ্রম প্রদর্শনের জন্য কাদির মিঞা আমার ধন্যবাদার্থ। কিন্তু ইংরেজী সন লইয়া একটা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ডাক্তার গ্ৰীয়ারসন সাহেবের সম্পাদিত “পদুমাবৎ”-এর ভূমিকায় দেখা যায়—“Malik Muhammad flourished under Sher Shah in the year 1540 A. D.” এবং অন্যত্র লিখিত আছে, “His poem was written in 1540 A. D.” এখন কথা হইতেছে,—মালিক মোহাম্মদ যদি ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে flourish বা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সনে তিনি গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন বলা যায় কিরূপে? যাহা হউক এবিষয়ে পরে আরও অনুসন্ধান করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা যাইবে।

আগেই বলিয়াছি, বটতলার ছাপা পুথির উপর একটি কাণা কড়ির মূল্য দেওয়া কোন লেখকের উচিত নহে।

কাদির মিঞা ছাপা পুথি হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বলিলে অনেক কথা বলা যায় কিন্তু কথা কাটাকাটি করিবার আমার সময়ও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। তাই সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া কাদির মিঞাকে সবিনয়ে একটি অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন ভবিষ্যতে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি করিয়া লোকের মনে সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণার উদ্বেগ না করেন। তাঁহার শক্তি সামর্থ্যের উপর আমার আস্থা আছে। অনর্থক পাণ্ডিত্য জাহির করিবার প্রয়াস না করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিকের মত সত্য দ্রষ্টা হইলে কালে তিনি আমাদের অবহেলিত প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট শক্তিমান লেখকরূপে যশস্বী হইবেন, আমার একপ বিশ্বাস আছে। কিম্বিকিমিতি।”

পৌষ ১৩৪৭ সংখ্যার সাহিত্য বিশারদের এই প্রবন্ধের সূত্রে আবদুল কাদির লেখেন “প্রাচীন পুথির পাণ্ডুলিপি”। যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় আবেগময়তা পরিবর্তে সত্য ও কাব্যসৌন্দর্য সন্ধান যে জরুরী এ বিষয়ে আবদুল কাদির বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার প্রবন্ধটি নীচে উদ্ধৃত হল :

“প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমানের দান সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত বিবরণ এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। রোসাজ রাজ-দরবারের কবিগণ সম্বন্ধে সমুদ্রতট কিছু আলোক-পাতের চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার ধারাবাহিক ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই। বলা অনাবশ্যক যে, হস্তলিখিত পুঁথির পাণ্ডুলিপি ও পুরাতন পুঁথি-পত্রের সহায়তা ভিন্ন এই দুরূহ কর্তব্য সম্পাদিত হইতে পারে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ প্রাচীন পুঁথির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের জন্য এতখানি উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়াই আজ এদেশের পুরাতন সাহিত্য ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এখন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার অবকাশ হইয়াছে। তবে পরিষদের সাধকবৃন্দ তাঁহাদের রুচি ও আগ্রহের তাগিদে সাধারণতঃ হিন্দু মহাজনগণের সাহিত্যকীর্তির সন্ধানই সময়ক্ষেপ করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। মুসলমান সমাজে একমাত্র মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ “সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরেরও উর্ধ্বকাল প্রাচীন সাহিত্য সংগ্রহ-কার্যে ব্যাপৃত” রহিয়াছেন; এক্ষেত্রে তিনি একেবারে একক। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি যে “অসংখ্য পুঁথি-পত্র সংগ্রহ” করিয়াছেন, তাহাদের অনেকগুলির পাঠোদ্ধার না-কি তিনি ভিন্ন অন্যের দ্বারা তেমন সম্ভবপর নয়। একথা যদি সত্য হয়, তবে ভাবনার বিষয় বটে। সাহিত্য-বিশারদ সাহেব আজ বার্ককে উপনীত; তাঁহার মতন আজন্ম সাধকের সহায়তায় আমাদের মুমূর্ষু সমাজ যদি নিজের অতীত ঐশ্বর্য্য ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে আজও খবরদারী করিতে না চায়, তবে ভবিষ্যতে আফশোষের অন্ত থাকিবে না।

প্রাচীন সাহিত্যের বিজ্ঞান-সম্মত মৌলিক আলোচনা খুব সহজসাধ্য নয়। বহু-ভাষাবিদ ও হস্তলিপি-বিশারদ ব্যক্তিই এবিষয়ে যোগ্য অধিকারী। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমার সে যোগ্যতা নাই। সর্বদেশের ও সর্বকালের উৎকৃষ্ট সাহিত্যেই রহিয়াছে, প্রধানতঃ রসের আবেদন; সেই চিরন্তন রস-সুস্ফূর্ত সন্ধানই আমি প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক মাত্র।

ভুরু দেখি ভুজঙ্গম ভূমে দিল লুক।

দেখিয়া ত্যাজিল কাম আপন ধনুক ॥

সেই ভুরু-ধনু-লক্ষ্যে ভুবন শাসয়।
উদিয়া ইন্দ্রের ধনু তিলেক নুকয় ॥
(আলাওল, সপ্ত পয়কর, ১০০ পৃ.)

অথবা—

কর্ণ হৈতে রেখা শোভে নয়নঅঞ্জন।
চক্ষু মেলি' তিল লোভে রহিল খঞ্জন ॥
কর্ণ দেখি গৃধ-পক্ষী উড়িল আকাশে।
স্ব ইচ্ছায় মনুষ্যের নিকটে না আসে ॥
(আলাওল, সপ্ত পয়কর, ১০১ পৃ.)

নাঙ্গুনী-কণ্যার এই অপকৃপ রূপ-বর্ণনা আমাদের মুগ্ধ করে। সপ্তদশ শতকের একজন মুসলমান কবি লিপি-চাতুর্য ও উপমা ব্যবহারে এমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, ইহা ভাবিয়া বিস্ময় লাগে। আলাওলের অপূর্ব রূপ-কল্পনা ও অনিন্দ্য উপমা-প্রয়োগ স্থানে স্থানে আমাদের বিদ্যাপতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিদ্যাপতির পদাবলীতে আছে—

নাভি-বিবর সঞ্জে লোম-লতাবলী
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা।
নাসা-খগপতি চক্ষু ভরম-ভয়ে
কুচগিরি-সন্ধি নিবাসা ॥

—(নাভি-বিবর হইতে লোমলতাবলী-রূপ ভুজগী নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণের জন্য বিনির্গত হয়; কিন্তু নাসিকাকে খগপতির চক্ষু বলিয়া ভ্রম করিয়া ভয়ে কুচগিরি-যুগলের সন্ধিস্থলে নিবসিত হইয়াছে।) ইহার সঙ্গে আলাওলের নিম্নোক্ত ছত্রগুলি মিলাইয়া পড়া যাইতে পারে—

ত্রিবলী উপরে হয় ত্রিভুবন-পলী।
মোহন গভীর নাভি য্রোতের কুণ্ডলী ॥
লোমাবলী নাগিনী বৈসয় কুণ্ডান্তরে।
উঠিতে আহাৰ লাগি পৰ্বত-উপরে ॥
খগপতি-নাসা উর্দ্ধ-ভাগেতে দেখিয়া।
শৈল-যুগ সন্ধিতে রহিল লুকাইয়া ॥
—(সপ্ত পয়কর, ১০৪ পৃ.)

কিন্তু অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে, আলাওলের এমন সুন্দর রচনার পরিপূর্ণ রস আশ্বাদনের সৌভাগ্য অনেকের হইয়া উঠে না। আলাওলের রচিত যে সমস্ত মুদ্রিত পুঁথি প্রচলিত রহিয়াছে, শব্দবিকৃতি ও বর্ণাঙ্কুর দরুণ তাহাদের বহু বাক্যের ভাবোদ্ধার অনায়াসসাধ্য নহে। উপরোক্ত ‘সপ্ত-পয়কর’ সম্বন্ধে ১৩১০ বঙ্গাব্দে মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিয়াছিলেন “হস্তলিপি পাওয়া যায় নাই। চট্টগ্রাম হইতে বহু দিন পূর্বে চারিজন মুসলমানের চেষ্টায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু বিশ্রী সংস্করণ। অনেকবার বলিয়াছি, মুসলমানদের অত্যাচারে আলাওল সাহেব নিতান্ত হীনাবস্থায় আছেন। হিন্দু ভ্রাতৃগণ কৃপা না করিলে তাঁহার উদ্ধারের আশা নাই। (বাক্সালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ৮৫ পৃষ্ঠা। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যেও “হিন্দু ভ্রাতৃগণ” আলাওলের প্রতি “কৃপা” করেন নাই। অগত্যা অধ্যাপক মহম্মদ মনসুরউদ্দীনের মতন ‘সাহিত্যসেবিগণ আলাওলের পুঁথির “বিশ্রী সংস্করণ” পড়িয়াই তাহার সম্বন্ধে গবেষণায় অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে সাহিত্য-বিশারদ সাহেব

উক্ত হইয়া “বিনীতভাবে আরজ” করিয়াছেন যে, “যে-পর্যন্ত প্রাচীন পুঁথি-পত্রে বিস্তৃত সংস্করণ প্রকাশিত না হয়, সে পর্যন্ত বটলার পুঁথি অবলম্বন করিয়া আমাদের কোন লেখক যেন ভবিষ্যতে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হন।” (মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৪৭) বলা বাহুল্য যে, এই ফতোয়া দেখিয়া আমাদের মতন অনেকেই ভিত্তি খাইয়াছেন।

সাহিত্যবিশারদ সাহেব ১৩১২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে “মুসলমান মহাকবি আলাওল ও দৌলৎ কাজীর” সতী ময়নাবতী ও লোর-চন্দ্রানী নামক “পুঁথিখানির প্রকাশ-ভার” গ্রহণের জন্য “সাপ্তাহিক অনুরোধ” করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-যাবৎ পরিষৎ কেন সে-অনুরোধ রক্ষা করিলেন না? আমরা জানি, বাঙ্গালা সরকার হইতে ‘পরিষৎ’ বহু টাকা বার্ষিক বরাদ্দ পাইয়া থাকেন। এই অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হইয়া থাকে, তৎসম্পর্কে কৌতূহল হওয়া অসঙ্গত নয়। “সপ্ত পয়কর” বা “লোর-চন্দ্রানী” প্রকাশের ভার পরিষৎ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কিন্তু সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত “শ্রীগৌরঙ্গ-সন্ধ্যাস” পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ওবায়দুল হকের এই “গৌরঙ্গ সন্ধ্যাস” যে ঘটনা-বিন্যাস ও কাব্য-ভাবে দিক্ দিয়া অতিশয় নিকৃষ্ট, তাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা।

আমার মস্তক মুগুন কর তুমি।

এ-কথাটি বলি আমি ॥

এই কথা মধু নাপিত যখনে শুনি।

করজোর করি মধু কহিতে লাগিল ॥

—(শ্রীগৌরঙ্গ-সন্ধ্যাস, ৫৩ পৃ.)

কবি-গান ও পাঁচালী-প্রপীড়িত বাংলাদেশে একরূপ ‘আধ্যাত্ম-বাণী’র সার্থকতা আজও আছে কি? অবশ্য লালগোলাধিপতি রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়-বাহাদুরের অর্থানুকূল্যেই সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত “গৌরঙ্গ-সন্ধ্যাস,” “সত্যনারায়ণের পুঁথি” প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু লালগোলাধিপতির দানের পশ্চাতে সাম্প্রদায়িক মনো-ভাব সামান্যও ছিল না; তাহা থাকিলে সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত “গৌরঙ্গ-বিজয়” ও “জ্ঞান-সাগর” তাঁহার অর্থানুকূল্যে কদাচ মুদ্রিত হইতে পারিত না। কাজেই মনে হয়, পরিষদের কর্তৃপক্ষ অথবা অর্থকৃচ্ছতাই এজন্য দায়ী। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, দৌলৎ কাজী, দৌলৎ উজীর বহরাম খান, জঙ্গিনুদ্দীন, শেখ চান্দ্র, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ আলাওল ইত্যাদি বিবেচিত গ্রন্থরাজির বিস্তৃত সংস্করণ প্রকাশের জন্য পরিষদের সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। একরূপ সমাজহিতকর ব্যাপারে বাঙ্গালার বর্তমান ‘মুসলিম মন্ত্রী-মণ্ডলী’ কতখানি সাহায্য করেন, তাহাও প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়।

কবিগুরু কাজী দৌলত রচিত “সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী” ক্লাসিক কাব্যের মর্যাদা পাইবার যোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষতন বিদ্যার্থীদের পাঠ্য হিসাবে এই কাব্যখানি নির্বাচিত হইলে তাহাতে গুণগ্রাহীতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। “পূর্বে ছিল রতন-কালিকা গুণবতী” (১০০ পৃ.) হইতে “ধৈর্য ধরি রহ বিধি মিলাইব পতি (১৩৮ পৃ.) পর্যন্ত আলাওল রচিত অবাস্তুর অংশটুকু বাদ দিয়া ইহার একখানি শোভন সংস্করণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইলে তাহা নিন্দার্ত হইবে না। এই কাব্যখানি সম্পর্কে মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ বলিয়াছেন—“কবির লেখা হইতে এইমাত্র জানা যায় যে, “সাধন” নামক কোনো কবির ঠেঠ-হিন্দী ভাষায় রচিত এবং চোপদী ও দোহার ছন্দে লিখিত ‘সতী ময়না প্রসঙ্গ’ কবি দেশী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। (সওগাত, কান্তিক, ১৩৪৭) যদিচ সাহিত্যবিশারদ সাহেব মনে করেন যে, “বটলার

ছাপা পুঁথির উপর একটি কাণা-কড়ির মূল্য বা রতি-প্রমাণ শ্রদ্ধা অর্পণ করাও কাহারও উচিত নহে; তজ্জাচ তিনি এ ক্ষেত্রে “বটতলার পুঁথি অবলম্বন করিয়াই ‘সতী ময়না’-কাব্যের উৎপত্তি সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। উক্ত কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া তিনি “বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ” পুস্তকে নিম্নোক্ত অংশ ছাপা পুঁথির পাঠ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

ঠেঠা ছোপাইয়া দোহ কহিলা সদনে।(১)
না বুঝে গোহারি ভাষা কোন ২ জনে ॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুজএ সানন্দে।
তবে কাজী দৌলত সে বুজিয়া আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥
(১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ২৪৫ পৃ.)

এই পংক্তিগুলি “আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য”, পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে এইভাবে—

ঠেঠা চোপাইয়া, দোহা কহিল সাধন।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জন ॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝএ আনন্দে ॥
তবে কাজী দৌলত বুঝি সে আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥
(১৪ পৃষ্ঠা, পাদটীকা)

আমার নিকট যে মুদ্রিত পুঁথি আছে, তাহাতে উহা ছাপা রহিয়াছে এইভাবে—

ঠেটা ছোপাইয়া দেহ কহিলা সদনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে ॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝায় সানন্দে ॥
তবে কাজী দৌলত বুঝিয়া সে আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥
(সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী, ৮ পৃ.)

এই প্রকার পাঠ-বৈষম্য দেখিয়া মনে হয়, ‘সাধন’ নামে কোন কবি হিন্দী ভাষায় একরূপ কোনো কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণের পরই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা শোভন হইত। প্রাচীন সাহিত্যের রস-সৌন্দর্য্যই আমাদের উপভোগের বিষয় কোন্ লেখক কোথাকার অধিবাসী ছিলেন, রস-বিচারে তাহার স্থান আছে কি না বিবেচ্য। অথচ কোন কবি কোথায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং কোথায় দিনাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহা নিয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে অশোভন তর্কের অবসান নাই। সাহিত্য-বিশারদ সাহেবও আলাওলের “জনাভূমি” সম্পর্কে কম “মসীযুদ্ধ” করেন নাই। কিন্তু মনে হয়, সামান্য সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া এবিষয়ে মীমাংসা করা অনেক সময় বিপজ্জনক। সাহিত্য-বিশারদ সাহেব তাহার সম্পাদিত “সত্য-নারায়ণের পুঁথি”র

নিম্নোক্ত অংশে বিশেষতঃ “দিগঙ্গ” শব্দটি দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, যেহেতু “দিগঙ্গ” বা দে-গঙ্গা ২৪ পরগণা জেলার “একটি থানার নাম”, কাজেই উহার রচয়িতা উক্ত “জেলা বা তন্নির্কটবর্তী কোন স্থলবাসী” ছিলেন—

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
হালে দণ্ড কেঁরয়ালে বসিলা গাবর ॥
সপ্তগ্রাম বাহি সাধু পাইলা ত্রিপনী।
হুগলী প্রবেশ হৈল সাধুর তরণী ॥
নায়ে বসি সদাগর দেখে নানা রঙ্গ।
তিন দিন বাহি সাধু পাইলা দি-গঙ্গ ॥
সাধুর প্রতাপে কেহ নাহি বলে রাহ।
ডাহিনে বাহন (?) চাএ বামে ঝড়দহ ॥
মগরা সাগর রাখি সঙ্গম বাহিল।
কহর দরিয়ায় সাধু উপনীত হৈল ॥
সদাগরে বিড়ম্বন করেন খোদায়।
পাথরের গোর্ এক ভাসায় দরিয়ায় ॥

বর্ধমানের অন্তঃপাতী দামুন্ডা গ্রামের ৬ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বাঁকুড়া জেলার আড়রায় আগমনের পর ‘চণ্ডী’-কাব্য প্রণয়ন করেন, তাহাতে ধনপতির নৌকা-যাত্রার দীর্ঘ বিবরণ ছন্দোবদ্ধ হইয়াছে এইভাবে—

বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
শান্তিপুর বামেতে, দক্ষিণে গুপ্তি পাড়া।***
বামভাগে হালিশহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দু’কূলের কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥***
রাট মধ্য, সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম।
দিন দুই সাধু তথা করিলা বিশ্রাম ॥ **
ব্রহ্মপুত্র সন্ধ্যাবতী যেই ঘাটে মেলা।
ইছাপুর এড়াইল বেণিয়ার বাল। ॥ **
হরায় চলয়ে তরী তিলেক না রহে।
ডাহিনে মাহেশ রাখি চলে ঝড়দহে ॥***
মোহানা বাহিয়া সাধু যেতে কৈল হরা।
প্রবেশ করিল সাধু দুর্জয় মগরা ॥***
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
ধনপতি ছলিবারে পাতিলেন মায়া ॥

এই বর্ণনা পাঠের পর সন্দেহ থাকে না যে, ‘চণ্ডীকাব্য’ অনুসরণ করিয়াই “সত্য-নারায়ণের পুঁথি”র নৌকাভ্রমণ কাহিনী বিরচিত হইয়াছিল।

পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি যে, প্রাচীন সাহিত্যের বিচারেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করাই অভিপ্রেত। কোনো সংস্কার বা মোহের দ্বারা প্রভাবিত হইলে সত্যোদঘাটনে বিশ্বাস সম্ভাবনা থাকে। শেখ ফয়জুল্লাহর “গোরক্ষ-বিজয়ের” প্রারম্ভে “প্রভু করতার” ও “নিজ অবতার” যথাক্রমে “আল্লাহ” ও “রসুল” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই ধারণার পশ্চাতে স্বধর্মপ্রীতি থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যপ্রীতি নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, “গোরক্ষ

বিজয়ের প্রারম্ভে আল্লাহ্ রসুলের পরিবর্তে নাথ-দেবের বন্দনা রহিয়াছে।” (সওগাত, চৈত্র ১৩৪৬) সাহিত্যবিশারদ সাহেব “গোর্খ বিজয়” নামে একখানি “আদ্যস্ত খণ্ডিত” পুঁথির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, “সাধারণতঃ মুসলমান কবিগণ খোদা-রসুলের বন্দনা করিয়াই গ্রন্থারম্ভ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই পুঁথিতে সেই রীতি অনুসৃত হয় নাই। সমালোচ্য পুঁথির আরম্ভ বাক্যটি পাওয়া না গেলেও অনুমান হয় যে, অনাদ্য-গোসাঁই আদ্য-গোসাঁইকে বন্দনা করিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।” (বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৩০ পৃষ্ঠা মনে হয়, উক্ত “সমালোচ্য পুঁথি”তে “প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার” হইতে “উনিবারে বিবরণ কহিতে যুয়ায়” পর্যন্ত আরম্ভ-ভাগ খণ্ডিত ছিল। কিন্তু সেই আরম্ভ ভাগের সহায়তায়ও একথা প্রমাণ করা চলে না যে, তাহাতে “আল্লাহ-রসুলের বন্দনা” আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, “প্রভু করতার”, নিজ অংশ হইতে “অবতার” সৃষ্টি করিলেন, প্রথমে তিনি অচেতন ছিলেন, পরে চৈতন্য পাইয়া আপন আকার দেখিয়া তাহার বিকার জন্মিল, তখন—

হুকারে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু হৈল মুখে।
আপনা আকার তবে রাখিলা সন্মুখে॥
আদ্য অনাদ্য রূপে কৈলা নিরক্ষণ।
ভাবের অনলে ঘর্ষ ঘণ্ডিত তখন॥

এই বর্ণনায় “করতার” ও “অবতার” যে যথাক্রমে “আদ্য” ও “অনাদ্য”, তাহা অস্বীকারের অবকাশ নাই। রামাঞ পণ্ডিতের “ধর্মপূজা-বিধানে” আছে—

শূন্য ভাবি মনে আনিল বআনে
ছাড়িল এক হুকার।
হুকারের হ’তে হৈল আচম্বিতে
ত্রিগুণ বাউ সঞ্চার॥

নিরঞ্জন হুকারে শূন্য হইতে সৃষ্টিপত্তন, ইহা মুসলমান শাস্ত্রসম্মত কিনা বিচার্য। আমার মতে, সৃষ্টিপ্রকরণের এই ব্যাখ্যায় বিকৃত-বৌদ্ধত্বের ছাপই রহিয়াছে,—ইসলামের নহে। ‘আদ্য’ ‘অনাদ্য’ প্রভৃতি কথাও ‘ধর্মপূজাবিধানে’ পাওয়া যায়...

- (১) আদ্যের পুষ্পগাছি নাঞি তার পাত।
আপনি নিরঞ্জন দিলেন পদ্মহাত॥
- (২) দক্ষিণ দুয়ারে আছে পণ্ডিত লীলাই।
ভূঙ্গারে জল দিল অনাদ্যের ঠাঞি॥

বৌদ্ধধর্মের পতনের পর বাঙ্গলাদেশে নাথমার্গের প্রাধান্য ঘটে; ‘ময়নামতীর গান’, ‘গোবিন্দচন্দ্রগীত’, ‘গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস’ প্রভৃতিতে তাহার প্রভাব স্পষ্ট। ‘গোরক্ষবিজয়’ সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম...

“গোর্খের চরিত্র দেখি হাসে মহেশ্বর।
গোর্খ হেন যোগী নাই জগত ভিতর॥

এই গোরক্ষনাথের অপূর্ব ধ্যান-বল ও চরিত্র-মাহাত্ম্য ইহাতে অনিন্দ্য ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে।”... কিন্তু সাহিত্যবিশারদ সাহেব ব্রমবশতঃ বুঝিয়াছেন যে, আমি “উপরের ছত্র

দু'টিকে 'বন্দনা'-রূপে পাঠকের সম্মুখে" ধরিয়াছি। তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে রহিয়াছে অধৈর্য্য। বলা অপয়োজন যে, অসহিষ্ণুতা সত্যনির্ণয়ের পথে কম প্রতিবন্ধক নয়।

বটতলার প্রকাশকদের সম্বন্ধে সাহিত্যবিশারদ সাহেব বলিয়াছেন, যে, "তাঁহাদের ছাপা পুঁথিতে রচয়িতার রচনার মৌলিকতা প্রায়ই রক্ষিত হয় নাই; তাঁহারা জয়গোপালী কাণ্ড করিতে সিদ্ধহস্ত।" ..

কিন্তু উপরোক্ত "গোরক্ষবিজয়" পুস্তকখানি দেখিলে মনে হয় যে, হস্তলিখিত পুঁথিতেও রচয়িতার মৌলিক রচনা পাওয়া দুষ্কর। একই রচনা বিভিন্ন প্রতিলিপিতে লিপিকারকের কল্যাণে পরিবর্তন লাভ করিয়াছে, দেখা যায়। কাজেই বটতলার পুঁথি এবং প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, ইহাদের কোনটি সর্ব্বাংশে যে বিশ্বাসযোগ্য, তাহা ভাবিয়া পাইনা। আর, "জয়-গোপালী কাণ্ড" সম্বন্ধেও ভাবিবার আছে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, "ইদানিং কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠবিকৃতির দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের শাশানের উপর উৎপীড়ন হইতেছে। কিন্তু যাহারা উক্ত তর্কালঙ্কারের বিরোধী, তাঁহাদের নিকট এই বক্তব্য, যদি তাঁহারা প্রাচীন বঙ্গীয় পুঁথির আলোচনা করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন, পুস্তকের হস্তলিপি যত প্রাচীন, ভাষাও সেই অনুসারে জটিল ও প্রাচীন; পরবর্ত্তী পুঁথিগুলির ভাষা ক্রমশঃ সহজদৃষ্ট হয়। এক জয়গোপালের উপর ক্রুদ্ধ হইলে কি হইবে? কত জয়গোপাল বঙ্গীয় রামায়ণের বিকৃতি-সাধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। প্রাচীন অপ্রচলিতশব্দবহুল একখানি পুঁথি উদ্ধার করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিলে দেশীয় আপামর সাধারণ পড়িবে কি? আমার বিবেচনায়, বঙ্গীয় পুঁথিগুলির এইরূপ পরিবর্তন সর্ব্বাংশেই পরিতাপের বিষয় হয় নাই। এইরূপ যুগে যুগে সময়-উপোযোগী ভাবে ভাষার একটু সংস্কার হওয়াতেই ৫০০ বৎসরের অধিক কালের রামায়ণ এখন পর্য্যন্ত এদেশে এতদূর প্রচলিত আছে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১২২ পৃষ্ঠা) কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' সম্বন্ধে যাহা সত্য, আলাওলের 'পদ্মাবতী' সম্বন্ধে তাহা একেবারে অসত্য নয়। আলাওলের কাব্যগুলি যদি "সময়োপযোগীভাবে একটু সংস্কার" করিয়া প্রকাশ করা হইত, তবে তাহা নিঃসন্দেহে জনসমাজে অধিকতর, 'প্রচলিত' হইত। ভাষা "অপ্রচলিত শব্দবহুল" নহে বলিয়াই মুন্সী মালে-মোহাম্মদ মরহুমের "সয়ফল-মুল্লুক বদিউজ্জামাল" মহাকবি সৈয়দ আলাওলের "সয়ফলমুল্লুক-বদিউজ্জামাল" অপেক্ষা জনসাধারণের নিকট সমধিক আদৃত।

বদিউজ্জামালের রূপ দেখিয়া নমুনা।
 হুঁশ-হারা শাহজাদা হইল দেওয়ানা ॥
 খরখর কাঁপে অঙ্গ, মতি নাহি স্থির।
 কলেজায় বিক্লি তার ফোলাদের তীর ॥
 ক্ষণে ছবির গলে ধরে, ক্ষণে ধরে পায়।
 ক্ষণে মুখে চুমে ক্ষণে করে হায় হায় ॥
 ডানে বামে চাহে ক্ষণে কখন আসমানে।
 আছাড়ে কাছাড়ে কখন লোটার জমিনে ॥
 (সয়ফলমুল্লুক ও বদিউজ্জামাল, ১১ পৃ.)

মালে-মোহাম্মদ প্রণীত পুঁথিতে এই বর্ণনা পড়িয়া আজও গ্রামের চাষী-সম্প্রদায় বিনিত্র রাত্রি যাপন করিয়া থাকে। আর আলাওল দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের নিকট তাঁহার তুলনায় অনেকটা উপেক্ষিত।

পূর্বেই আভাষ দিয়াছি যে রামায়ণের মতন পদ্মাবতী প্রভৃতির 'বিকৃতি-সাধনে'-ও লিপিকরগণ আলস্য করেন নাই। সাহিত্যবিশারদ সাহেব 'চারিখানি অসম্পূর্ণ আদ্যন্ত-বিহীন পাণ্ডুলিপি' সম্বল করিয়া পদ্মাবতীর আলোচনা করিতে গিয়া একখানি পুঁথি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, 'ছাপা গ্রন্থের সহিত ইহার উপসংহারের কিছুমাত্র মিল নাই।' উক্ত প্রতিলিপিখানিতে আছে—

পদ্মাবতি নাগমতি সহ মরে গেল।
ছুলুতানে আসি সেই চিতা প্রণামিলা ॥
মার্গনেত আলাওলে বিস্তারি কহিলা।..

মনে হয়, এই বিচিছিন্ন চরণগুলির উপর নির্ভর করিয়াই সাহিত্যবিশারদ সাহেব 'আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, স্বলতান আলাউদ্দীন 'পদ্মাবতীর চিতা প্রণাম করিয়াছিলেন'। নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, এ ক্ষেত্রে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির উপর বিশ্বাস করিয়া তিনি বিভ্রাটেই পড়িয়াছেন।

মুদ্রিত পদ্মাবতী পুঁথির "দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ যে, ৬/মৌলবী হামিদুল্লা পদ্মাবতী নামক পুঁথি সৈয়দ আলাওলের পুত্রের নিকট হইতে "যথায়ত রচনার পণ দিয়া খরিদ করিয়া বাঙ্গালাভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে ষষ্ঠবার পর্য্যন্ত" ছাপাইয়াছিলেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তি পড়িয়া ১৩১০ সালে সাহিত্যবিশারদ সাহেব জিজ্ঞাসা করেন যে, "আলাওলের পুত্র ১৯শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কিরূপে বর্তমান থাকিতে পারেন?" (প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ১৭৮ পৃষ্ঠা।) যতটুকু জানি, তাঁহার এই প্রশ্ন কাহারও তেমন কর্ণগোচর হয় নাই। অন্যপক্ষে অনেকে মনে করেন যে, যে-চট্টগ্রামে কদম-রসুল দর্গা, শেখ ফরিদের চশমা, বায়জিদ বিস্তামির মাজার প্রভৃতি বর্তমান আছে, সেখানে সপ্তদশ শতকের কবির পুত্র 'উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্য্যন্ত বর্তমান' থাকিয়া পিতৃরচিত পুস্তকের 'কপি-রাইট' বিক্রয় করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কি থাকিতে পারে?

রামবাবু শক্সেনার A History of urdu Literature পুস্তকে আছে—Persian words and phrases were rapidly coming into vogue. They are found interspersed in the *Padmavat* of Malik Mohammad Jaisi (who flourished about 1540 A.D.) which was found to be written in Persian script. (P. 11) এখানে flourish অর্থ জীবিত থাকা,—'জন্মগ্রহণ' নয়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, 'সপ্তদশ শতকে উত্তর-ভারতের লোকভাষা (হিন্দী) হইতে মালিক মোহাম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবত' বাঙ্গালায় অনূদিত হয়। (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ৩৪ পৃ.) হিন্দী পদ্মাবতের 'পাণ্ডুলিপি ফারসী, দেবনাগরী ও কয়তি' অক্ষরে এবং বাংলা পদ্মাবতীর পাণ্ডুলিপি বাংলা ও আরবী অক্ষরে পাওয়া যায়। কিন্তু আলাওল নিজে কোন্ হরফে- 'পদ্মাবতী' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলা শক্ত। হিন্দী পদ্মাবতের মতন বাংলা পদ্মাবতীও Persian Script-য়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, একরূপ অনুমান করা অনায়াস নয়। এ সম্পর্কে স্মরণীয় যে ফারসী ও আরবী বর্ণসঙ্কেতের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। 'পদ্মাবত' রচনার তারিখ ৭২৯ হিজরী ধরিয়া সাহিত্যবিশারদ সাহেব যে ভুল করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই; এই অকপট সত্যপ্রীতির জন্য উপসংহারে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

মোহাম্মদ ফারাজুল হোসেনের বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানের স্থান (ভাদ্র ১৩৩৫) বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও লেখক হিসেবে মুসলমানদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

আবদুল কাদিরের মসিয়া সাহিত্য (ফাল্গুন ১৩৪৭), মোহাম্মদ আফতাব হোসেনের প্রাচীন কবি হায়াত মামুদ (বৈশাখ ১৩৪৯), মুহাম্মদ আবদুল বারির স্মৃতিশিলাঃ শা ও তাঁহার গান (চৈত্র ১৩৫২), মোহাম্মদ আশরাফ হোসেনের কবি সৈয়দ সোলতান (ফাল্গুন ১৩৫৩) ও আবদুল কাদিরের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান (আষাঢ় ১৩৫৪) মূলতঃ পরিচিতি মূলক প্রবন্ধ। এ সব প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ও কবিদের সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচয়বহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা সাহিত্য ও আধুনিক যুগ

সওগাতের প্রথম সংখ্যা থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ প্রধানতঃ ছিল পরিচিতিমূলক। সে তুলনায় আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে অন্তরব্যাখ্যা ও কার্যকারণ বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে লেখকেরা সৃষ্টা অপেক্ষা স্রষ্টিকর্মের মূলসূত্র আবিষ্কারে অধিকতর আগ্রহী।

আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলোর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. বর্তমান নাট্যসাহিত্য, শাহাদাৎ হোসেন, অগ্রহায়ণ ১৩২৫
২. বঙ্গীয় মোসলেম সাহিত্য পুষ্টি, গোলাম হোসেন, পৌষ ১৩২৫
৩. মেঘনাদবধ ও বৃত্তসংহার, একরামুদ্দীন, ফাল্গুন ১৩২৬, চৈত্র ১৩২৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭
৪. মহাশ্মশান কাব্য, আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, আষাঢ় ১৩২৬
৫. মহাশ্মশান কাব্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, শ্রাবণ ১৩২৬
৬. প্রতিবাদ : আমার উত্তর, সৈয়দ এমদাদ আলী, কাতিক ১৩২৬
৭. কবি কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্য, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭
৮. আমাদের শিক্ষিত সমাজ ও বাঙ্গালাসাহিত্য, সৈয়দ এমদাদ আলী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭
৯. কথা-সাহিত্য ও বঙ্গীয় মুসলমান, আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, বৈশাখ ১৩২৭
১০. বাঙ্গালী মোস্লেম ভাষা ও সাহিত্য, আবদুল মজিদ, আষাঢ় ১৩৩৩
১১. বাঙলার মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য, আবদুল মজিদ, শ্রাবণ ১৩৩৩
১২. বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান মহিলা, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, ভাদ্র ১৩৩৩
১৩. খান বাহাদুর কাজি ইমদাদুল হক, সৈয়দ এমদাদ আলী, ভাদ্র ১৩৩৩
১৪. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং মোসলমান, আনওয়ার হোসেন, মাঘ ১৩৩৩
১৫. কাব্য সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান, আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, ভাদ্র-১৩৩৩, কাতিক-১৩৩৩, অগ্রহায়ণ-১৩৩৩, পৌষ-১৩৩৩, জ্যৈষ্ঠ-১৩৩৪
১৬. কথা-সাহিত্যের ত্রয়ী, আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, আষাঢ় ১৩৩৪
১৭. 'বিদ্রোহী'-কবির প্রেমের দিক, এস. এম. জহরউদ্দীন, মাঘ ১৩৩৪

১৮. সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কান্তিক ১৩৩৪
১৯. সাহিত্য বনাম সাম্প্রদায়িকতা, শাহাদৎ হোসেন, ভাদ্র ১৩৩৫
২০. সাহিত্যের স্বাস্থ্য, পঙ্খীরাজ, ভাদ্র ১৩৩৫
২১. 'বুলবুলে'র কবি, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, পৌষ ১৩৩৫
২২. বাঙ্গলা গদ্য, মুহম্মদ মন্সুরউদ্দীন এম-এ, চৈত্র ১৩৩৫
২৩. আধুনিক কথ্য-সাহিত্য, মুহম্মদ মন্সুরউদ্দীন এম-এ, আষাঢ় ১৩৩৬
২৪. কবি দিদারুল আলম স্মরণে, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ, মাঘ ১৩৩৬
২৫. মধ্য শিক্ষার বাহন, মুওয়ায়েদজাদা বেগম সকিনা ফারুক সুলতান, এম-এ ফাল্গুন ১৩৩৬
২৬. বাঙ্গলা সাহিত্য ও বাঙ্গালী মুসলমান, এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (ক্যাটাঁব), বার-এ্যাট-ল, বৈশাখ ১৩৩৮
২৭. মুনশী শেখ আবদুর রহিম, সৈয়দ মোকাররম আলি, বি.এ. বি-টি, ভাদ্র ১৩৩৮
২৮. বর্তমান বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, শ্রীমূপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কান্তিক ১৩৩৯
২৯. মুসলমান সাহিত্য, নাজিরুল ইন্সান, এম-এ, বি-টি, মাঘ ১৩৩৯
৩০. সাহিত্যের প্রভাব, মজহারউদ্দীন ভূঞা, ফাল্গুন ১৩৩৯
৩১. বাংলা-সাহিত্যের নও-বেলাল, সা'দত আলি আখন্দ, বি-এল, ফাল্গুন ১৩৪৫
৩২. সাহিত্যের স্বরূপ, অধ্যাপক হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, শ্রাবণ ১৩৪৩
৩৩. সাহিত্যালোচনা, জাফর আহমেদ, মাঘ ১৩৪৫
৩৪. বাঙ্গালী মুসলিমের সাহিত্য-সাধনা, জাফর আহমেদ, ফাল্গুন ১৩৪৫
৩৫. কাব্য-সাহিত্য, শাহাদাৎ হোসেন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬
৩৬. মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা, আবদুল কাদির, মাঘ ১৩৪৭
৩৭. সাহিত্য-চর্চা, সোহরাব আলি খান চৌধুরী, শ্রাবণ ১৩৪৮
৩৮. আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ, আবু রুশ্দ, ভাদ্র ১৩৪৮
৩৯. রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক বেগম শামসুননাহার মাহমুদ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮
৪০. আধুনিক মুসলিম সাহিত্য, আকলিমা খাতুন, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮
৪১. বিজ্ঞান ও সাহিত্যে নারীর দান, হোসনা বানু খানম, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮
৪২. আমাদের শিশু-সাহিত্য, হামিদা খাতুন, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮
৪৩. মরহুম এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মাঘ ১৩৪৭, চৈত্র ১৩৪৯, বৈশাখ ১৩৪৯
৪৪. রোহিণী, সৈয়দ আলী আহসান, আষাঢ় ১৩৪৯
৪৫. বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা, মোহাম্মদ নওশের আলী, সাহিত্যরত্ন, ভাদ্র ১৩৪৯
৪৬. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, সৈয়দ আলী আশরাফ, কান্তিক ১৩৪৯
৪৭. ডিটেক্টিভ উপন্যাস, গোলাম কুদ্দুস, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯
৪৮. গণ-সাহিত্য, অধ্যাপক জসীমউদ্দীন, এম-এ, আশ্বিন ১৩৫০
৪৯. আমাদের সাহিত্য-সেবা, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কান্তিক ১৩৫০।

৫০. আনন্দমঠ থেকে পথের দাবী, পুলকেশ দে সরকার, আষাঢ় ১৩৫১
৫১. আমাদের জাতীয় সাহিত্য, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১
৫২. আজকের সাহিত্য, শমসী বেগম, এম-এ, আষাঢ় ১৩৫১
৫৩. আমাদের সাহিত্য, মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, বি-এ, শ্রাবণ ১৩৫১
৫৪. জীবন-সংগ্রামে সাহিত্য, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, আশ্বিন ১৩৫১
৫৫. বিজ্ঞাপন ও সাহিত্য, অজিতকৃষ্ণ বসু, আশ্বিন ১৩৫১
৫৬. বাংলা কাব্যের বৈশিষ্ট্য, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, এম-এ, কা্তিক ১৩৫১
৫৭. আমাদের কাব্যসাহিত্য, আবদুল কাদির, মাঘ ১৩৫১
৫৮. প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ, মোহাম্মদ আলী হোসেন, মাঘ ১৩৫১
৫৯. জীবনী ও কাব্য-সাধনা, মঈনউদ্দীন আহমদ, ফাল্গুন ১৩৫২
৬০. মুসলমান নাট্য-সাহিত্যের সম্ভাবনা, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, এম-এ, বৈশাখ ১৩৫২
৬১. সাহিত্যের লক্ষ্য, এস. ওয়াজেদ আলি (বি-এ কন্ট্রোল), বার-এট-ল, বৈশাখ ১৩৫২
৬২. আমাদের সমাজ-জীবন ও সাহিত্য, শাহেদ আলী, পৌষ ১৩৫২
৬৩. দাঙ্গা-সাহিত্য, আবদুল্লাহ আল মুতী, পৌষ ১৩৫৩
৬৪. সনেটের টেকনিক, মোহাম্মদ আবদুল হক, মাঘ, ১৩৫৩
৬৫. শিশু সাহিত্যের আদর্শ, মোখলেছুর রহমান, ফাল্গুন ১৩৫৩
৬৬. কমল, মাহবুব জামাল জাহেদী, বৈশাখ ১৩৫৪
৬৭. নবীন কবি ফররুখ আহমদ, আবদুল কাদির, বৈশাখ ১৩৫৪
৬৮. সাহিত্যে সমস্যাটা কি?, সরদার ফজলুল করিম, বৈশাখ ১৩৫৪
৬৯. নজরুলের বাল্য রচনা, কাজী নুরুল ইসলাম, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪
৭০. বর্ষা ও বাংলা কবিতা, মাহবুব জামাল জাহেদী, আষাঢ় ১৩৫৪
৭১. নজরুল সাহিত্য প্রসঙ্গ, মোহাম্মদ আবদুল হক, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪
৭২. শরৎচন্দ্র ও ইবসেন, মাহবুব জামাল জাহেদী, শ্রাবণ ১৩৫৪
৭৩. কবিদের কথা, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪
৭৪. সাহিত্য ও সাহিত্যিক মন, মোহাম্মদ এবাদত হোসেন, পৌষ ১৩৫৪
৭৫. গণ-সাহিত্য, আলাউদ্দিন-আল-আজাদ, পৌষ ১৩৫৪
৭৬. সাহিত্য, অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক, এম-এ, চৈত্র ১৩৫৪
৭৭. ব্যথার কবি নজরুল ইসলাম, নাজিরুল ইসলাম, বৈশাখ ১৩৫৫
৭৮. এসমাইল হোসেন সিরাজী, আবদুল কাদির, কা্তিক, ১৩৫৫

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'বর্তমান নাট্য সাহিত্য শীর্ষক' একটি প্রবন্ধ লেখেন শাহাদৎ হোসেন। এ প্রবন্ধে আধুনিক কালে 'নাট্যসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা' ও 'নাট্যের ঐতিহাসিক সত্যের সংলাপ ও একদেশদর্শিতা' প্রসঙ্গে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পটভূমিতে প্রবন্ধটির তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য। প্রবন্ধটির মূলঅংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল:

“...মুসলমানদিগের মধ্যে আজ পর্যন্ত কেহই নাট্য-সাহিত্যের অনুশীলন করেন নাই, প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। এ দেশের প্রাচীন হিন্দু কবিগণই উক্ত সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন, একথা সর্ববাদী সঙ্গত। কিন্তু বর্তমান যুগে দুই একজন বিশিষ্ট নাট্যকার ব্যতীত সকলের দ্বারায় উক্ত কার্য সম্পাদিত হইতেছে না, একথা বোধ হয় সকলেই জানেন। এখন নাটক বলিতে সাধারণতঃ অশ্লীল ভাবপূর্ণ রঙ্গরসভরা ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের কুৎসাপরিপূর্ণ দৃশ্যকাব্যের কথা মনে পড়ে। সেই জন্যই এখন অনেকে নাটকের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। করিবারই কথা। প্রকৃত রসজ্ঞ ব্যক্তি কি কখনও কুৎসিত হাবভাবপূর্ণ নাটক পাঠে বা তাহার অভিনয় দর্শনে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন? নন্দন-বাহিনী পীয়ুষসলিলা মন্দাকিনীর পুতধারা পানে যিনি অভ্যস্ত, তিনি কি কখনও অপবিত্র পুতগন্ধময় কূপোদক পানে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন? কিন্তু নাটক কি বাস্তবিক তাই? কখনও নয়। যে সাহিত্যের সাধনা করিয়া কালিদাস অমরত্ব লাভ করিয়াছেন,—মাহার সাধনায় ভবভূতি বিশ্বের বরণ্য;—সেক্সপীয়র—সেক্সপীয়র, তাহা আজ তুচ্ছ প্রমোদের উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। অবশ্য সকল দোষ যে নাট্যকারের তাহা নহে। বর্তমানে নাট্যকারকে অভিনয় দশকের উপর নির্ভর করিয়া অনেক সময় নাটক লিখিতে হয়। অসামান্য মনীষা সম্পন্ন নাট্যকার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যখন তাহার অনুবাদিত ম্যাক্বেথ লইয়া প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনয় আরম্ভ করেন, তখন কয়জন লোক সে অভিনয় দর্শনে বা অনুবাদ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন? কিন্তু যখন কবির রঙ্গরসভরা গীতিনাট্য আবুহোসেনের অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন সহস্র সহস্র দর্শক অভিনয়াস্ত্রে কবিকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে দিতে গৃহে ফিরিলেন। বাধ্য হইয়া কবি সেক্সপীয়রের নাটকগুলির অনুবাদ-কল্পনা ধীরে ধীরে মন হইতে সরাইয়া দিলেন। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বঙ্গ সন্তান প্রকৃত নাট্য সাহিত্যের আদর ভুলিয়াছে। কিন্তু দর্শক বা পাঠকের রুচির বিপর্যয় হইলেই যে কবির ভাব ও কল্পনার বিপর্যয় ঘটবে, এমন কোন কথা নাই। প্রকৃত কবি যিনি তাহার প্রাণের ভাব লেখনীর মুখে আপনিই বাহির হইয়া পড়ে, সহস্র বাধা বিপত্তিতেও তাহার গতি রোধ হয় না। তবে তাহারই মধ্যে পাঠকের মনস্তৃষ্টির দিকে একটু লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করিলেই সকল দিক রক্ষা হয়। একটা কথা—প্রাচীন ও বর্তমান কবিগণের মধ্যে এত পার্থক্য কেন? বোধ হয় তাবের অভাবই তাহার মূলীভূত কারণ। প্রাচীন কবিগণের অন্তঃকরণ সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির লীলা নিকেতন ছিল। ব্যোমসম্পর্শী গিরিরাজের মহান শুদ্ধতা, দূরবিস্তৃত অরণ্যের নীরব গান্ধীর্ঘ্য, গজ্জন মুখর বিশালকায় ফেনময় জলধির তাণ্ডবনর্তন, তানময়ী ভূধরনন্দিনীর মধুর মর্মস্পর্শী কুলুধ্বনি তাঁহারা উপভোগ করিতেন; বাহ্যেদ্রিয় দ্বারা দর্শন বা শ্রবণ করিতেন না। তাই তাঁহারা ভাবুক,—কবিপদবাচ্য হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কয়জন কবি সে ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? অক্ষমতা হেতু নূতন অলঙ্কারে তাঁহারা কাব্য স্মন্দরীকে ভূষিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, প্রকৃতির সহিত কাব্যের কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক,—প্রকৃতির প্রেমিকই কবি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সাগরে যিনি নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে না পারেন, তাঁহার কাব্য রচনা প্রয়াস বৃথা। ইচ্ছা করিলেই যদি কবি হওয়া যাইত তাহা হইলে ত কোন চিন্তাই ছিল না। জলদনির্মুক্ত প্রভাত-গগনপটে হেমকিরিটিনী উষার স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়ী ছবি, অন্তগমনোন্মুখ বিবস্থানের মনঃপ্রাণ বিমোহন রক্তিমসৌন্দর্য, শ্যামলাঙ্কলা গোখুলির দীপ্ততারকাটিপশোভিত ললাট, জাগরণ-গীতিমুখরা প্রভাত প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন;—পুতকায়ী বীচি-মালিনী গিরিনির্বাহিণীর কলসঙ্গীত বাসন্তী কাননে তমালশাখোপবিষ্ট পিকরাণীর মর্মস্পর্শী কুজন সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন; কিন্তু কয়জনের চিত্ত তাহাতে মুগ্ধ হয়? যিনি মুগ্ধ হন, তিনিই কবি,—কাব্যসুন্দরী তাঁহারই ক্রীড়ার সঙ্গিনী। আর নাট্যকবি তিনি,—যিনি সেই সৌন্দর্য সমুদ্রের মধ্যে বসিয়া নিজের কল্পনাকে অনুভূতির উপাদানে সুগঠিত করিতে

পারেন,—অন্তশ্চক্ষু দ্বারা বিশ্বেশ্বরহৃদয় দর্শন করিতে পারেন। এই জন্যই নাট্যকার হইতে হইলে বহু সাধনার বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে সাধনা, সে পরিশ্রম এখন কয়জন করিয়া থাকেন? বর্তমান কবিগণের মধ্যে অনেকেরই কবিত্ব সেই জন্য রসহীন। তাহাদের ভাবে প্রাণ নাই, ভাষায় রাঙ্কার নাই; তাহা কতকগুলি জটিল দুর্বোধ্য শব্দের একত্র সমাবেশ বলিয়া বোধ হয়।

নাটকের চরিত্র সৃষ্টি

শোক দুঃখের মধ্য দিয়া মানুষের চরিত্রে যেমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠে তেমন আর বসি কিছুতেই ফুটে না। অনন্ত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও যিনি অচল অটল—তিনিই আদর্শ চরিত্র,—সংসার তাঁহাকে দেখিয়াই শিক্ষা লাভ করে, তাঁহারই আদর্শ গ্রহণ করে। কিন্তু নাটকীয় চরিত্র সকল সময় একই ভাবে অঙ্কিত হইতে পারে না। তাহা দেশ কাল অনুসারে সৃষ্ট হইয়া থাকে; ব্যাসের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলার পার্থক্য দর্শনে তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ব্যাস বলিয়াছেন, প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা স্বামীকে তেজোময় বাক্যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু কালিদাস তাহা বলিতে পারেন নাই, তিনি বলিয়াছেন প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া শকুন্তলা স্বামীর অন্তরে পূর্বস্মৃতি জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার কারণ কি? ইচ্ছা করিলেই ত কালিদাস ব্যাসের অনুসরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই কেন? আমাদের ধারণা, ভারতের তখন সেদিন ছিল না, তাহার সম্মানগণের হৃদয়বল তখন অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছিল। তাই কবি তাঁহার আদরণীয় নায়িকাকে ব্যাসের শকুন্তলার ন্যায় তেজস্বিনী না করিয়া শৈবালজড়িত কোকনদের ন্যায় লাজময়ী নগ্নসৌন্দর্যের অধিকারিণী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু বর্তমানে চরিত্রে সৃষ্টির এই সনাতন নীতিকে অনেক স্থলেই উপেক্ষিত হইতে দেখা যায়।

অনেকে মনে করেন, অভিনয়ে সফলতা লাভ করিতে পারিলেই সে নাটক সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবে। কিন্তু সে ভ্রম-ধারণা; কেননা, অভিনয়ের সহিত সাহিত্যের কোন সম্বন্ধই নাই; আর বর্তমানে অভিনয় দশকগণের মধ্যে অনেকেই রঙ্গরসপ্রিয়,—সাহিত্যের বার দিয়াও চলেন না। আরও একটি কথা—নাট্যকলার মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা খুব অল্প লোকেরই আছে। অভিনয়ে যে সফলতা লাভ হয়, তাহা নাট্যকারের প্রাপ্য নহে,—অভিনেতার।

নাট্য সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগে সাহিত্যের দিক দিয়া সমাজ বা জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে, নাট্য সাহিত্যের বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, শ্রব্যকাব্যে চিত্রিত নায়কনায়িকা অপেক্ষা দৃশ্যকাব্যের নায়কনায়িকা মানবের চিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এই খানেই নাটকের বিশেষত্ব, এই খানেই নাটকের শক্তিমত্তা। এই বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই নাট্যকারকে পূর্ব হইতেই শক্তিসঞ্চয় করিতে হয়। তাঁহার এমন ক্ষমতা থাকা চাই, যেন তিনি তাঁহার কল্পনাকে মুক্তিমতী করিয়া বাস্তবজগতের সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারেন। বর্তমানে হিন্দুভাতৃগণের প্রাণে যে নূতন প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছে, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি মনস্বীগণ বিরচিত নাটক পাঠ ও তাহার অভিনয় দর্শনই কি তাহার অন্যতম কারণ নহে? আলস্য শয়নে সুপ্ত হিন্দু আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের অসাড় প্রাণে কর্ণ জগতের সাড়া প্রবেশ করিয়াছে, দীর্ঘসুপ্তির পর তাই তাহারা আজ গাত্রোধান

করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন জীবনকে কর্ণের পথে দাঁড় করাইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে মানবের চিত্তরাজ্যে সহজেই আধিপত্য বিস্তার করিবার শক্তি নাট্য সাহিত্যের কত বেশী।

নাটকে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ

ও একদেশদর্শিতা

পূর্বেই বলিয়াছি প্রাচীন নাট্যকারগণ যে রঙ্গসভারে সাহিত্যভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। বিশ্ব সাহিত্যের কোথাও তাহার তুলনা নাই। তাঁহারা জগতের হিতে নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা কখনও ছিলেন না; তাই আজ তাঁহারা বিশ্বের পূজ্য, সর্বসম্প্রদায়ের বরণীয় মহাকবি।—কিন্তু বর্তমানের নাট্যকারগণ সেই উদার সাম্যনীতি তুলিয়া, যে প্রশস্ত পথ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া কূটনীতি পরিচালিত হইয়া কণ্টকসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ পথ বহিয়া অগ্রসর হইতেছেন, এ দুঃখ যে রাখিবার স্থান নাই!

আজ এমন নাটকও আমরা দেখিতে পাই, যাহার ভাষার ঝঙ্কারে বঙ্গের সাহিত্য-কুঞ্জ মুখরিত, যাহার ভাবে পাঠকের প্রাণ কোন্ অজ্ঞাত পরীরসপূর্ণ রাজ্যের দ্যুলোক-দুর্লভ সৌন্দর্য সাগরে ডুবিয়া যায়; তথাপি সে সাহিত্যকে কেন আজ সমগ্র বঙ্গবাসী অন্তরের সহিত বরণ করিয়া লইতে চাহে না? সে সকলের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ও একদেশদর্শিতাই কি তাহার মূলীভূত কারণ নহে? অমিতপ্রতাপ ভারতগ্যাবিধাতা গুরুজের মহিষী কোথাও ক্ষুদ্র পার্বত্য মাড়বার সেনাপতি দুর্গাদাস সমীপে প্রেম যাচিকা, কোথাও অসূর্যস্পর্শ্য মোগলকুলগৌরবিনী সাজাহানসুতা জাহানারা রাজদরবারে শত লোলুপ কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে দণ্ডায়মানা মোগলের পতিব্রতা স্বধর্মনিরতা একেশ্বরবাদিনী কুলবধ কোথাও 'কানু'র সঙ্কীর্ণ গাইতেছেন, আবার অন্যত্র আকবর ভাগিনেয়ী শক্তসিংহের প্রণয়িনী রূপে তাঁহার পার্শ্ব অবস্থিত করিতেছেন। অন্য দিকে প্রতাপ, শক্ত, দুর্গাদাস, যশোবন্তসিংহ প্রভৃতিকে উন্নত চরিত্র আদর্শ মহাবীররূপে অঙ্কিত দেখিতে পাই। হউক, তাহাতে ক্ষতি ছিল না; কেহ তাঁহার জাতির সম্মুখে যদি তাঁহাদের অতীতের ক্ষীণ আদর্শকেও উজ্জ্বল-রূপে ফুটাইয়া তুলেন সেত উত্তম, কিন্তু তাই বলিয়া যাহা প্রকৃত সত্য-প্রকৃত মহৎ তাহাকে গোপন করা বা তাহার মাহাত্ম্যের ঔলোমুতশিরে কলঙ্কের কালিমাময় রেখা টানিয়া দেওয়া একেবারেই অনুচিত নহে কি?

যাহা হউক এখনও যদি নাট্যকারগণ উক্ত সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া সরল সুপ্রশস্ত পথের পথিক হইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারিতাম।

যে দিন প্রথম স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অঙ্কিত নবাব চরিত্র পাঠ করিয়াছিলাম সে দিন প্রাণে কত আশাই না জাগিয়াছিল? ভাবিয়াছিলাম এইরূপে একে একে আমাদের নবাব বাদসাহগণের প্রকৃত চরিত্র কবি তুলিকায় অঙ্কিত হইয়া দেশের, সমাজের ও ভবিষ্যৎশতাব্দীর চক্ষুর সম্মুখে বিরাজ করিবে, কিন্তু হায়! সে আশা এখন আকাশ কুসুমের পরিণত হইয়াছে।

এই স্থলে একটা কথা আমরা বলিতে চাই—সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের কুৎসা ভিন্ন কি দৃশ্য কাব্যের সৃষ্টি হইতে পারে না? না এ পথ অবলম্বন না করিলে কবির কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না। তাহা যদি না পায় তবে কীটিকুশল নাট্যকার শ্রদ্ধেয় ক্ষীরোদপ্রসাদ

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সাহিত্যের আসরে স্থান পাইলেন কিরূপে? যদিও তিনি মুসলমানের রীতিনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তথাপি বর্তমান নাট্যসাহিত্যিকগণের মধ্যে তাঁহার দ্বারা মুসলমানের মর্যাদা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে; তাঁহার রচিত অধিকাংশ-পুস্তকে একটা মিলনের ছায়া সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গিরিশ বাবু নাট্য সাহিত্যে নূতন ভাবের প্রবর্তক, আজ বঙ্গদেশে এমন কে আছেন, যিনি গিরিশচন্দ্রকে নাট্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া স্বীকার না করেন? কিন্তু কই, তাঁহার লেখনী ত এমন হলাহল উদগীরণ করে নাই, তবে কেমন করিয়া তিনি এত খ্যাতি এত প্রতিপত্তি লাভ করিলেন? যাহা হউক এ বিষয় লইয়া বর্তমানে আমরা বেশী কিছু আলোচনা করিতে চাই না, তবে এই মাত্র বলি যে, পক্ষপাতী হইয়া ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা নিতান্ত অন্যায্য; ইহাতে সম্প্রদায় বিশেষের যে বিশেষ ক্ষতি হয়, এ কথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। যিনি বাস্তবিক কবি তাঁহার প্রাণ সরল উদার। বিপুল বিশ্বে তিনি মুক্ত বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। কুটিলতা বা সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়া তিনি কখনও চলিতে চাহেন না।

যে দেশে সিংহার পুণ্যসৈকতে উজ্জয়িনীর শাস্তিময় কুটীরে অভিজ্ঞান শকুন্তলের জনয়িতা চির নিরপেক্ষ উপার মহাকবির জন্ম—হে তারতের বর্তমান নাট্য কবিগণ! সেই পুণ্য শাস্তিময় দেশে তোমরাও জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তবে আজ কেন এই হীন পক্ষপাতিতা তোমাদের অন্তরে পূর্ণাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, কেন আজ সেই লোকপূজ্য মহা নাটক স্রষ্টার মহান আদর্শ ভুলিয়া কুটিলতা সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় লইয়াছ?

হায়! আজ যদি হিন্দু মুসলমান এক প্রাণে এক ভাবে মাতৃভাষার সেবায় নিরত থাকিত, তবে কি আজ ভ্রাতৃত্ববন্ধের এই কুংসিত অভিনয় দেখিতে হইত? কিন্তু তাহা কি হইবে না? এ বিদ্বেষ কালিমা কি অন্তর হইতে একেবারেই মুছিয়া যাইবে না?”

মোহাম্মদ গোলাম হোসেনের “বঙ্গীয় মোসলেম-সাহিত্য-পুষ্টি নবীন লেখকগণের প্রতি উপদেশ” (১:২ পৌষ ১৩২৫) প্রবন্ধে লেখক বাঙালী মুসলমান নবীন লেখকদের কোরাণ ও হাদিস থেকে সাহিত্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণা সন্ধানের পরামর্শ দেন:

“সত্যজাতি মাত্রেই শিক্ষা আছে এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যও আছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ভাব, জাতীয় ধর্ম, জাতীয় নীতি পরিস্ফুট হয় এবং সেই পরিস্ফুটতাই জাতীয় গৌরবের মূল। যে জাতির সাহিত্য নাই, বুঝিতে হইবে সে জাতির উন্নতির আশাও অতি অল্প। সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ ইতিহাস। ইতিহাসের মধ্য দিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের একটানা স্রোত বহিয়া যে জাতির জাতীয় জীবন, জাতীয় ভাবকে সমুদ্রের মধ্যে ভাসমান দ্বীপের ন্যায় কালসমুদ্রে ভাসাইয়া না রাখে, সে জাতির আর উন্নতির আশা কি? মুসলমান জাতি একটা সুসভ্য জাতি,—জগতের আদর্শ জাতি বলিলেই হয়। কিন্তু শিক্ষার অভাবে এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যভাবে, আজ বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ অন্যান্য জাতির আওতার আড়ালে, নিতান্ত নিস্তেজ ও জীবনশূন্য অবস্থায় জগতের একপ্রান্তে পড়িয়া আছে। সে জাতির জীবনের লক্ষণ কোথায়?—কাল-নিদ্রা-কোলে অনেকেই গা ঢালিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে—সাদা নাই,—চৈতন্য নাই,—জাগরণের পূর্বলক্ষণও নাই। আমাদের মধ্যে এখন একজনও কি ভাবে যে,—“একদিন আমরা কি ছিলাম, আর আজ কি হইয়াছি?” পূর্বের কথা আমাদের মনে নাই। বর্তমানের অবসাদহিমে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট,—আমরা নিস্তেজ, সংজ্ঞাশূন্য, প্রাণহীন।

আমাদের কি না ছিল, কি না আছে? আমাদের সকলই আছে, কিন্তু নাই কেবল অনুসন্ধান,—নাই কেবল জাতীয় গৌরবের ঢাকী! আমাদের সমাজে ঢাকী অর্থাৎ ঘোষণা-কারীরই নিত্য অভাব। সেই ঘোষণার ঢাক হইতেছে সাহিত্য পত্রিকাগুলি এবং ঢাকী—যে সমস্ত লেখক আজকাল সমাজে মাথা জাগাইয়া উঠিতেছেন। হে উদীয়মান লেখক ভ্রাতৃ-গণ! একবার মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া গাত্ৰোত্থান করুন, গবেষণায় মন নিবিষ্ট করুন। অনুসন্ধান করিলে জগৎবাসীকে অনেক নূতন কথা, নূতন তত্ত্ব, শুনাইতে পারিবেন; কোরাণ, হাদীস পাঠ করুন; অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। দেখিবেন আপনাদের জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার মণি মুক্তার অভাব নাই। দুই হাতে কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হইল। মনে রাখিবেন, আমাদের নূতন অপূর্ব সাহিত্য-ভাণ্ডার সাজাইতে হইবে। উপকরণের অভাব নাই, তবে চাই উদ্যম ও অনুসন্ধান। হে নবীন মোস্লেম-সাহিত্যিক ভ্রাতৃগণ! মনে রাখিবেন, আমাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়াই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমি আপনাদিগকে কিছু উপদেশ দিব। তবে বলিতে পারেন আপনার পক্ষে উপদেশের আসন গ্রহণ ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু প্রার্থনা, সে ধৃষ্টতা নিজ গুণে মার্জনা করিবেন। আমি, ‘প্রবীণ’ লেখকের গভীর মধ্যো পড়িতে বসিয়াছি,—তবে আর কিছুতে না হউক বয়সে বটে! বয়স চল্লিশের পর,—পঞ্চাশের কাছাকাছি; মস্তকের চুল সাদায় কালোয় গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ভাব ধারণ করিয়াছে। অনেক দিন হইল ছায়াটা পূর্বদিকে হেলিয়াছে,—সে নবীন যৌবন বহু দিন গত হইয়াছে,—জীবন-কুঞ্জে আশা কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া বনান্তরে চলিয়া গিয়াছে,—আর জীবনের বসন্ত ফিরিবে না। লেখনী হস্তে লইয়া বহু দিন কাটাইয়াছি। কিন্তু লেখনী প্রসব করিয়াছে কুফল,—দারিদ্র্য, দুর্নাম ও দুর্গতি! আমার প্রথম উপদেশ এই, যদি কেহ সাহিত্যিক হইতে চান, তবে তাঁহাকে সর্বপ্রথমে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। যদি তাহা পারেন, তবে সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করুন নচেৎ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অতি কম। সংসার সম্পত্তির আশা প্রথম প্রথম জলাঞ্জলি দিয়া, সাহিত্যেরই একমাত্র সাধনা করিতে হইবে। সাহিত্যচর্চায় যাঁহারা মনোনিবেশ করিতে চান, অর্থই তাঁহাদের পরমার্থ নহে। অর্থার্জনে মন থাকিবে না, মন থাকিবে সাহিত্যের সাধনায়। কলঙ্ক, দুর্নাম, দুর্গতির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সমালোচকদিগের কষাঘাত পিঠ পাতিয়া লইতে হইবে, কিন্তু সাধনার নিবৃত্তি হইবে না। যদি একরূপ পারেন, তবে সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশা আছে। সর্বোপরি দরিদ্রতাকে গলার হার করিবার জন্য প্রস্তুত না হইতে পারিলে সাহিত্য সাধনায় সফলতার আশা বড় কম। বড় দুঃখে কবি হেমচন্দ্র গাহিয়া গিয়াছেন—

“হায় মা ভারতি! চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি তবে,
যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে।”

তারপর সাহিত্যের উপকরণের কথা। পূর্বেই এ সম্বন্ধে আভাস দিয়াছি। মোস্লেম-সাহিত্য সেবীর পক্ষে কোরাণ ও হাদীসের ন্যায় উপকরণ ভাণ্ডার আর দ্বিতীয় নাই।

“হে নবীন সাহিত্যিকগণ! আপনারা হাদিসগ্রন্থগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন এবং তাহা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইসলাম-সাহিত্যের পরি-পুষ্টি-সাধন করিবেন, ইহাই আমাদের উপদেশ। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আদর্শ পুরুষের অনুগামী আমরা অপর জাতির মুখাপেক্ষী নহি। আমাদের জাতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার অনন্ত ও অফুরন্ত। আমরা তাহা হইতে কি তত্ত্ব-বিজ্ঞান, কি দর্শন শাস্ত্র, কি ব্যবহার নীতি, যে কোন বিষয়েই হউক, অন্যান্য জাতিকে দুই হাতে অকাতরে বিলাইতে পারি।”

সওগাতে সাহিত্য বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদ বারংবার মুদ্রিত হয়েছে। সাধারণতঃ কো কবি বা কোন্ গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে বিতর্ক। এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ একরামউদ্দিনের “মেঘনাদবধ ও বৃত্তসংহার” (২:৪ ফাল্গুন ১৩২৬, ২:৫ চৈত্র ১৩২৬, ৩:২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭)। এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উৎস কাতিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সংখ্যা ‘মানসী-ও মর্মবাণী’ পত্রিকায় প্রকাশিত মনুখনাথ ঘোষের আলোচনা। একরামুদ্দিনের ভাষায় “শ্রীযুক্ত মনুখনাথ ঘোষ মহাশয় হেমচন্দ্রের বৃত্তসংহারের সহিত মাইকেলের মেঘনাদবধের তুলনামূলক আলোচনা সমালোচনা করিতে যাইয়া মাইকেলের প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন তাহা পড়িয়া ব্যথিত হইলাম।”

মনুখনাথ ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে “মেঘনাদবধ মহাকাব্যই নহে”। একরামুদ্দিন মহাকাব্যের সংজ্ঞা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন, “সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতেও মেঘনাদবধ মহাকাব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।” এরপর একরামুদ্দিন রবীন্দ্রনাথের অতিমত বিশ্লেষণ করেছেন। কাতিক সংখ্যা ‘মানসী ও মর্মবাণী’তে মনুখনাথ ঘোষের প্রবন্ধে প্রথমাংশে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে ‘ভারতী’ প্রথম বর্ষে প্রকাশিত তরুণ রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধ বিষয়ক তীব্র সমালোচনাকেই ঐ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত অতিমত রূপে গৃহীত হয়েছে। অগ্রহায়ণ সংখ্যা ‘মানসী ও মর্মবাণী’তে কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এই ভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মতপরিবর্তনের উল্লেখ করেন। ঐ অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই মনুখনাথ ঘোষের প্রবন্ধের শেষাংশ প্রকাশিত হয়। পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় মনুখনাথ ঘোষ কৃষ্ণবিহারীর আলোচনার প্রতিবাদে বলেন যে রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতী’র প্রথম বর্ষের অতিমত প্রত্যাহার করেছেন কিন্তু ‘ভারতী’র ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশিত অতিমত বর্জন করেননি। ষষ্ঠ বর্ষের ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্য সাধারণতা নাই, অমরতা নাই।” কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ‘জীবন-স্মৃতি’তে মেঘনাদবধ কাব্যকে ‘অমর কাব্য’ আখ্যায়িত করেছেন। একরামুদ্দিন জীবন স্মৃতির উল্লেখ করেই যে মনুখনাথ ঘোষের যুক্তি ঋণ করেছেন তা নয় তিনি রবীন্দ্রনাথের পূর্বমতও বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে, রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনের কবি প্রকৃতি স্বতন্ত্র। “মাইকেল ও হেমচন্দ্র উভয়েই ভাবুক কবি এবং রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কবি। মাইকেল এবং হেমচন্দ্র উভয়েই এক শ্রেণীর এবং রবীন্দ্রনাথ অন্য শ্রেণীর কবি; সুতরাং আমাদের মনে হয় মাইকেলকে হেমচন্দ্র যেমন বুঝিবেন, রবীন্দ্রনাথ তেমন বুঝিবেন না। এই কারণে মাইকেলের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা হেমচন্দ্রের মতকে প্রাধান্য দেওয়া কর্তব্য।”

মেঘনাদবধের ছন্দ, ভাষা, চরিত্রচিত্রণ ও ঔচিত্যবোধ সম্পর্কে মনুখনাথ ঘোষ তরুণ রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে প্রশ্ন তুলেছেন। একরামউদ্দিন প্রতিটি প্রসঙ্গে মুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহ মধুসূদনের সমর্থন করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে একরামুদ্দিনের “রবীন্দ্র প্রতিভা” গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এবং মনুখ ঘোষ উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের তরুণবয়সের যুক্তি ঋণের জন্য একরামুদ্দিন তাঁর রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তর্গত বিসর্জন-সমালোচনা ও অন্যান্য মতামতও আংশিক পুনরুল্লেখ করেছেন।

আপাতঃ অশ্লীল চিত্র ও শব্দব্যবহারে মধুসূদনের মধ্যে ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের উত্তরাধিকার আছে এ কথা স্বীকার করেও একরামুদ্দিন হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন; বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও উপন্যাসে সামাজিক নৈতিকতার সীমালঙ্ঘনের তীব্রতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রবন্ধের এক প্রধান অংশ এই প্রসঙ্গেরই আলোচনা।

প্রবন্ধের শেষ অংশে ‘রবীন্দ্রপ্রতিভা’ গ্রন্থের মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের তুলনাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। উদ্ধৃতির শেষ অনুচ্ছেদে আছে: “মাইকেলকে রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনা করিয়া কে বড় কে ছোট যাহারা মীমাংসা করিতে চাহেন তাহারা ভ্রান্ত। উভয়ের প্রকৃতি, অধিকার ও কর্তব্য বিভিন্ন এবং উভয়েই আত্ম অধিকারে সম্মতি।”

উপসংহারে একরামুদ্দীন তাঁর এই অভিমত পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন: “আজকাল আমার শেষের মতটি পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন আমার ধারণা—মোটামুটিভাবে মাইকেলের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা চলে এবং রবীন্দ্রনাথের স্থান সকলের উপরে।

তাঁহার নিম্নেই মাইকেলের আসন এবং তন্নিম্নে হেমচন্দ্রের। মাইকেল ও হেমচন্দ্র উভয়েই এক শ্রেণীর কবি, সুতরাং মাইকেলের সহিত হেমচন্দ্রের তুলনা সহজ। নবীন-চন্দ্রও এই শ্রেণীর কবি, হেমচন্দ্রের নিম্নেই নবীনচন্দ্রের স্থান।”

উপসংহারের এই উভয় অভিমতের প্রতিবাদ করেছেন সওগাত সম্পাদক। প্রবন্ধ শেষে মুদ্রিত টীকায় সম্পাদক বলেছেন, “আমাদের মতে তাঁহার পূর্ব সিদ্ধান্তই যুক্তিমূলক।”

একরামউদ্দিনের এই প্রবন্ধ আমাদের সমালোচনা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রচনা সন্দেহ নেই। সওগাতে আর একটি বিতর্কের প্রসঙ্গ কবি কায়কোবাদের ‘মহাশ্মশান কাব্য’ (১৯০৪)। ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’র বৈশাখ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হয় তৎকালে লুপ্ত ‘নবনূর’ সম্পাদক কবি-সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলীর প্রবন্ধ “মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীল ভাব”। আষাঢ় ১৩২৬ সংখ্যা সওগাতে ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন ‘মহাশ্মশান কাব্য’ শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে (১:৮)। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের প্রবন্ধটি সওগাতের সমালোচনা অংশে মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটি গুরুত্ব হয়েছে গ্রন্থসমালোচনার ভঙ্গিতে কিন্তু অল্প পরেই লেখক মূল উদ্দেশ্য উন্মোচন করেছেন। প্রবন্ধটিতে এক দিকে যেমন কায়কোবাদের কাব্যের গুরুত্ব নির্দেশের প্রয়াস আছে তেমনি আছে সৈয়দ এমদাদ আলীর সমালোচনার তীব্র জবাব। তাঁর ভাষায় অসংযম আছে। তবু উল্লেখযোগ্য যে, ঐ প্রবন্ধে আবুল কালাম শামসুদ্দীন কায়কোবাদের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিয়েছেন এবং কবির অবদানের তাৎপর্য যে অনুপলব্ধ একথা বলেছেন।

পরবর্তী সংখ্যা সওগাতের (১:৯, শ্রাবণ ১৩২৬) আলোচনা অংশে মুদ্রিত হয় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর “মহাশ্মশান’ সম্বন্ধে দুই একটি কথা”। তার মতে এমদাদ আলী সাহেবের প্রবন্ধটি মহাশ্মশানের সমালোচনা নয় “কয়েকটি ত্রুটি প্রদর্শন”। সে প্রবন্ধে এমদাদ আলী “স্থানে স্থানে অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার পক্ষে অশোভন হইয়াছিল। কিন্তু সওগাতের প্রবন্ধকারও বড় সংযত ভাষায় তাহার সম্বন্ধে কথা কহেন নাই।”

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তাঁর আলোচনায় কায়কোবাদের কাব্য যে অশ্লীলতা দুই একথা বলে মোটামুটি এমদাদ আলীর পক্ষ সমর্থন করেছেন।

কাতিক ১৩২৬ সংখ্যার ‘সওগাতে’ (১:১২) প্রকাশিত হয় “প্রতিবাদ” শিরোনামে সৈয়দ এমদাদ আলীর “আমার উত্তর”। কায়কোবাদের সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত স্বদীর্ঘ পরিচয়ের কথা উল্লেখ করে সৈয়দ এমদাদ আলী স্মরণ করিয়ে দেন যে পূর্বে তিনিই ‘মিহির ও সুখাকর’ পত্রিকায় (৭ম খণ্ড, ভাদ্র ১৩০৩) প্রকাশিত তাঁর ‘মুসলমান বাঙ্গালা

সাহিত্য' প্রবন্ধে কায়কোবাদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ঐ প্রবন্ধে এমদাদ আলী লিখেছিলেন: "অশ্রুমালা কবির মত প্রতিভাশালী কবিকে পাইয়া আমরা আশান্বিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছি। অশ্রুমালা পাঠ করিয়া আমরা এই বুঝিয়াছি যে তিনি মুসলমান সমাজের গৌরব।" "আমার উত্তরে" এমদাদ আলী লিখেছেন যে, মহাশুশানের প্রথম পাণ্ডুলিপি তিনিই সর্বাগ্রে দেখেছেন, অনেক সংশোধন পরামর্শ দিয়েছেন এবং তার বিশ্বাস "তিনি (কায়কোবাদ) কবি—খাঁটি কবি এবং প্রতিভাশালী কবি।" স্মরণ্য কোন বিষেষ বশে নয় "জাতীয় কর্তব্যের খাতিরে মহাশুশান কাব্যের অপূর্ণ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি" কেননা "তাহার কাব্যে যে তিনি মুসলমান আদর্শ ফুটাইতে পারেন নাই, একথা সর্ববাদী সম্মত।"

প্রবন্ধের শেষাংশে 'এই অনৈসলামিক ভাবাপানু কবি' কায়কোবাদকে 'জরির টুপি সোনার দোয়াত কলম দিতে অগ্রসর' হবার জন্য মাওলানা আকরম খাঁ ও ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এমদাদ আলী।

প্রবন্ধটির শেষে সম্পাদক নিম্নোক্ত টীকা দিয়েছেন:

"মহাশুশান কাব্য সম্বন্ধে বিখ্যাত সাহিত্যিক মাননীয় সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কায়কোবাদ সাহেবের লেখার দোষের দিকই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাল দিক দিয়া তিনি কিছু বলেন নাই বা বলিবেন বলিয়াও আশ্বাস দেন নাই। মৌলভী আবুল কালাম সাহেব সওগাতে মহাশুশান সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সৈয়দ সাহেবের সমালোচনার জবাব বলিলেই হয়, তাহাতে উক্ত কাব্যের প্রশংসার কথাই বেশী বর্ণিত হইয়াছে, সূক্ষ্ম বিচার হয় নাই।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে অতি অল্প সংখ্যক খাঁটি সাহিত্যিক পাওয়া যাইবে, অধিকাংশ লেখকগণকে সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন ব্রতী বলিলেই হয়। এমতাবস্থায় তাহাদের উৎসাহ নষ্ট হইতে পারে একরূপ ভাবের কোন আলোচনা আপাততঃ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দোষ ত্রুটি থাকিলে তাহা লেখনী সংযত করিয়া ধীরভাবে বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য। মহাশুশানের মতামত লইয়া দেখিতেছি দুইটি দল গঠিত হইয়াছে। একদল মহাশুশানকে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কাব্যের আসনে স্থান দিতেছেন, আর একদল কবিকে ও তাহার কাব্যকে সে আসনের উপযুক্ত নয় বলিয়া তথা হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। মহাশুশান সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা হইতেছে সবগুলিরই লেখার ভঙ্গী সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতেছে। আবুল কালাম সাহেব সৈয়দ সাহেবের সমালোচনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তর সৈয়দ সাহেব দিয়াছেন। পাঠকগণ উভয় লেখা মনোযোগের সহিত দেখিলেই লেখকদ্বয়ের মতামত উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ধীর ও শান্তভাবে আলোচনা না করিলে ঐ সম্বন্ধে আর কোন লেখা আমরা পত্রস্থ করিব না।"

কবি কায়কোবাদ তাঁর মহাশুশান কাব্যের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় এই বাদপ্রতিবাদের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর কাব্য যে 'অনৈসলামিক' নয় সে কথা বোঝাতে চেয়েছেন (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১১)।

কায়কোবাদের কাব্য সম্পর্কে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মন্তব্যও (২:৭, জৈষ্ঠ্য ১৩২৭) গুরুত্বপূর্ণ: "ছন্দ সর্বত্রই অমিত্র পয়ার মাত্র। তবে এই বিষয়ে তাহাকে বেশী দোষ

দেওয়া যায় না, কারণ তিনি যে কবির উপাসক সেই কবির নবীনচন্দ্র সেনের এবং হেমচন্দ্রের হাতেও অমিত্রাক্ষর ভাল খেলে নাই, প্রায়ই অমিত্র পয়ার হইয়া পড়িয়াছে।

আমার মনে হয় গদ্য ও খণ্ড কবিতা রচনায় কায়কোবাদের প্রতিভা অধিকতর স্ফুটি লাভ করিত এবং এখনও করিতে পারে।”

চৈত্র ১৩২৬ (২:৫) সংখ্যা সওগাতে তরিকুল আলম লেখেন :

“ভাবের মাধুর্য ভাষার লালিত্ব এবং আদর্শের মহত্ত্ব এই তিনটি হচ্ছে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। * * যে দেশের বা যে জাতির সাহিত্যে যত অধিক পরিমাণ প্রকৃত সাহিত্য আছে, সে দেশ বা সে জাতি তত অধিক পরিমাণে উন্নত। সে জাতির বা সে দেশের নরনারী আজীবন সেই সাহিত্য সুধা পান করতে করতে অলক্ষিতে আপন আপন চরিত্রে একটা মহৎ আদর্শ গড়ে তোলে এবং সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে যখন পরীক্ষায় পড়ে, তখন অনেক সময়ে সেই আদর্শের জোরে বিপদ-সাগর তরিয়ে যায়। বাঙ্গালী মুসলমানের উপরোক্ত প্রকার জাতীয় সাহিত্যের একান্তই অভাব। তাই বাঙ্গালী মুসলমান আজ সকল সভ্যজাতির নীচে স্থান পাইয়াছে। যতদিন না সে এই সাহিত্য গড়ে তুলতে পারবে, ততদিন তার উন্নতির গতি দ্রুত হওয়া সম্ভবপর নয়। * * একথা অবশ্য স্বীকার্য্য-যে আজ ক’বৎসর থেকে বাঙ্গালী মুসলমান সাহিত্যিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে—কিন্তু শুধু গণতিতে বেশী হয়ে কি হবে, গুণেও বেশী হওয়া চাই। দুঃখের বিষয় এই সাহিত্যিকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রে আবর্জনা বেড়ে চলেছে বেশী, সাহিত্যের বাগানে এখন পর্যন্ত ভাল ফুলের আমদানী হয়েছে বলে মনে হয় না।”

এই প্রসঙ্গে সৈয়দ এমদাদ আলী জৈষ্ঠ্য ১৩২৭ (২:৭) সংখ্যায় “আমাদের শিক্ষিত সমাজ ও বাঙ্গালা সাহিত্য” শিরোনামে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তার আলোচনায় সৈয়দ এমদাদ আলী সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমানের পশ্চাৎপদতা নোচনে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানদের কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেন। তার মূল বক্তব্য নিম্নরূপ :

“...মোলভী তরিকুল আলম সাহেব যা বলেছেন আমি তা সবই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এর জন্য দোষী করব কাকে? আমাদের শিক্ষিত সমাজকে নয় কি? এই শিক্ষিত সমাজ কি এত দিন নিজের জাতির কোন ধার ধরেছেন, না তাদের কিসে ভাল হয়, তার একবিন্দু চেষ্টা করেছেন? তারা খেয়েছেন মোগ্লাই খানা, আর স্বপ্ন দেখেছেন উর্দুর। নিজেদের যে কখনও সেই স্বপ্নের রাজ্যে থেকে বাস্তবের পথে হেটে চলতে হবে এ তাঁরা মনেই করতে পারেন নি। কুড়ি বছর আগেকার কথা এখন বেশ মনে পড়ছে। আমরা যখন আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা জেনে তাব চর্চায় মন দিয়ে দিলুম, তখন মুসলমান উচ্চ রাজকর্মচারিগণ নাক না সিটুকে আমাদের দিকে কৃপা চাহনি দিয়ে চাইতে পেরেছিলেন কি? তা পারেন নি, আর আজ তাদেরই মধ্যে একজন ফোড করছেন যে বাঙ্গালা সাহিত্যেয় মুসলমান দিকটা একেবারে কিছু নয়। তিনি একথাটা কেন ভুলে গিয়েছেন যে, যে সাহিত্যেয় চর্চা করা একদিন তাঁদের মধ্যে অপমানের বিষয় ছিল, সে সাহিত্য কেমন করে কয়েকজন দরিদ্রের সেবায় বড় হয়ে উঠবে? দরিদ্রেরা যা পেরেছে তাই করেছে। আর তারি ফলে আজ ডেপুটি সাহেবরাও হাটি হাটি পা-পা করে, সেই দরিদ্রের খড়ের ঘরে এসে হাজির হচ্ছেন। এখন তারা খোদার নাম নিয়ে লেগে গেলেই এই খড়ের ঘরের পরিবর্তে বিরাট সৌখ ভৈরি হয়ে যেতে পারে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের হিন্দুদিকটাকে কারা এমন জমকাল সাজে সাজিয়েছেন? দরিদ্র অক্ষয়কুমার দত্ত কি বিদ্যাসাগরের একার চেষ্টায় তা হয়নি। ডেপুটি বক্সিম, নবীন, যোগেন্দ্রনাথ, রঞ্জনাল, সঞ্জীবচন্দ্র, প্রভৃতি এবং মধুসূদন ও হেমচন্দ্র, তাঁদের মনীষা দিয়ে রমেশচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাঁদের উচ্চ জ্ঞান সম্পদ ও গবেষণা দিয়েই এদিকটাকে বড় করেছেন। যাঁরা ধনে ও মানে তখন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাঁরাও বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় নিজের মনকে এমনি করে বিলিয়ে দিতেন যে তারি ফলে বাঙ্গালা ভাষা ভারতবর্ষের আর সব প্রাদেশিক ভাষাকে পিছনে রেখে কেবলই এগোতে পারছে আর আজ বিশ্ব সাহিত্যে তার একটা স্থান হয়েছে।

পাইকপাড়ার ধনী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় উন্নতির জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন কত চেষ্টাই না করেছেন! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজের পরিবারে বাঙ্গালা ভাষার চর্চাকে একটা উচ্চস্থান দেওয়ার ফলেই আজ তাঁহারই কনিষ্ঠপুত্র বরেন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পঁছরে দিতে পেরেছেন।* আমাদের ধনী সমাজ ও আমাদের শিক্ষিত সমাজ কি তা করেছেন? করেননি বলেই ত আজ জেগে দেখছেন যে কি পিছনেই বাঙ্গালা সাহিত্যের মুসলমান দিকটা পড়ে আছে! তাঁরা যদি এটাকে উঠাতে চান, তবে তাঁদের একবার আরাম কেন্দারার আশ্রয় ছেড়ে সাহিত্যের বন্ধুর পথে নেবে আসতে হবে। এতটা খাটো হতে কি তাঁরা পারবেন? এই আমাদের মত দরিদ্র ও পদমর্যাদাহীন লোকদের সঙ্গে মিশতে কি তাঁদের কষ্ট হবেনা? মুসলমান জাতিটার উপরে খোদার কোন অভিযাপ আছে কি না জানিনা; নতুবা আজ যাকে বিনয়ী বন্ধু-বৎসল দেখছি, নিজের জাতের জন্য যার খুবই মমতা আছে দেখছি, কাল তিনি ডেপুটি কি তেমনি কোনও একটা চাকুরী পেলেই অতীতটাকে একেবারেই ধুয়ে মুছে ফেলেন। কাল যাদের চিনতেন, আজ তাদের খুব বেশী 'পাওয়ারের' চশমা চোখে দিয়েও চিনতে পারেন কিনা সন্দেহ। তখন তাঁরা এমন বড় ও গভীর হয়ে যান যে সেণ্টিমেন্টালিটির দিকটা মোটেই মাড়াতে চান না! অতএব সাহিত্যও তাঁদের সেবা হতে বঞ্চিত হয়। আমি সাহিত্য বলছি, বাঙ্গালা সাহিত্য বলছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হতে আজ পর্যন্ত আমীর আলী সাহেব ছাড়া আর কোন মুসলমান তনুয়তার সহিত সাহিত্যের সেবা করে কিছু রেখে গেছেন বলে এখনও খবর পাইনি। একথাটা কাগজে কলমে আগেই লিখে রাখা এইজন্য দরকার যে, কিছুকাল পরে আবার এজন্য কাউকে আলোচনা করিতে গিয়ে গলদঘর্ষ হতে হয়।

যারা উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা যদি লেগে যান, তবে আমাদের এই সাহিত্যটা কোনও রূপেই এমন খাটো হয়ে পড়ে থাকবে না। একদিন ইহা দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। Palace Of Art গড়বার মাল মশলা তাঁদের হাতের কাছেই পড়ে আছে। একবার তাঁরা দয়া করে তা কাজে লাগিয়ে দিলেই হয়। সে দয়া কি তাঁরা করবেন?

মৌলভী তরিকুল আলম সাহেব বলছেন “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক বাঙ্গালা শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়ায় বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় জীবনের এই ক্ষীণ সাড়াটুকু পূর্ণতেজে বিকাশপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই লয় হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। কেননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক শিক্ষার (Islamic Studies) ব্যবস্থা স্বভাবতঃই প্রতিভাবান মেধাবী মুসলমান ছাত্রকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাবে।” তাঁর এই উক্তি সহিত

* আর একজন সবচেয়ে বেশী করে বঙ্গ ভাষাকে বড় করবার সহায় হয়েছেন, তিনি মাননীয় শার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তার তুলনা নেই। মৌলভী সাহেবও সে কথা বলেছেন।

সায় দিতে পারছি না বলে বড়ই দুঃখিত হচ্ছি। যাঁরা এই Islamic Studies, এর জন্য খুব খেটেছেন, তাঁরা যে মুসলমানের হৃদয়কুঞ্জ থেকে বাঙ্গালা ভাষাটাকে তাড়িয়ে দিতে চান, তাঁদের ব্যবহারে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমাদের মাতৃভাষার শুকনো ঘাটে যখন বাণ ডেকে জোয়ারের জল এসে পঁহুঁচেছে এবং সাগরের সঙ্গে এর একটা সম্বন্ধ জন্মো গেছে, তখন এই জলটা যে খালের একটা দিক দিয়েই বয়ে যাবে, আর একটা দিক একেবারেই শুকনো পড়ে থাকবে, এই রকম একটা কথা কোন রকমেই মনে স্থান দিতে পারছি না।

অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজে যেমন গ্রীক ও ল্যাটিনের চর্চা হয় ইংরাজীর তেমন হয় না। তথাপি ইংরেজ ইংরাজী ভাষাকে ছোট হয়ে পড়ে থাকতে দেয়নি, এমন বড় করে তুলেছে যে অন্য কারো সঙ্গে তার তুলনাই হতে পারে না। আর অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজে যেমন ইংরেজের জাতীয় জীবন গড়ে উঠছে, এমন আর কোথাও নয়। আমরা সাহিত্যকে খেলনার মত ব্যবহার করতে চাই বলেই আমাদের মনে এমন ধারণা জন্মাতে পারে না যা নিয়ে আমরা মানুষ হয়েছি বলে নিজেদের চিনতে পারি। ফলে, না আমাদের সাহিত্য উন্নত হয়, না আমাদের জীবন উন্নত হয়। আমার মনে হয়, Islamic Studies, এর এই আলোচনার ভিতর দিয়া আমরা সারাসানিক শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শটাকে খুবই ভাল করে বুঝতে পারব এবং তার ফলে আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে আমাদের নিজেদের আদর্শের দিক দিয়ে এমন করে গড়ে তুলতে পারব, যা করতে পারলেই আমাদের এই প্রিয়মান লজ্জাশীর্ণ সাহিত্য আপনা আপনি প্রাণের সাড়ায় চকিত, চঞ্চল হয়ে উঠবে।”

সংগাতের প্রধান প্রাবন্ধিকদের মধ্যে আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন অন্যতম। ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রবন্ধ “কথাসাহিত্য ও বঙ্গীয় মুসলমান”। প্রবন্ধটির প্রথমার্শ, উপন্যাসের বিষয় নির্দেশ প্রসঙ্গে, বঙ্গিমচন্দ্রের অভিমত (বিবিধ প্রবন্ধ) সমর্থন করে আবুল কালাম শামসুদ্দিন লিখেছেন:

বঙ্গিমচন্দ্রের মন্তব্যের সমীচীনতা সম্বন্ধে আশা করি কাহারও দ্বিমত হইবে না। উপন্যাসের বিষয় মনুষ্য চরিত্রের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, মনুষ্যের হৃদয়বৃত্তি কোন্ সময়ে কি ভাবে চালিত হয়, তাহারই হৃদয়চিত্রণ। মনুষ্য দেবতা নহে, মহাপ্রাণ মনুষ্যেরও কিছু না কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি থাকিবেই। অনেক উপন্যাসিকই মহাপ্রাণ মনুষ্য চরিত্র আঁকিতে গিয়া তাহাতে কেবল গুণরাশিই পুঞ্জীভূত করিতে থাকেন; যেন তাহাতে দোষ ক্রটি কিছু মাত্র নাই। ইহাতে খাঁটি মনুষ্য-চরিত্র ঠিক হয় না, উপন্যাস সার্থক হয় না। মনুষ্য চরিত্রের পশুত্ব ও দেবত্ব এতদুভয়ের যাত প্রতিযাত, একের অল্পতায় এবং অপরের আধিক্যে যে চরিত্র সৃষ্টি হয়, তাহাই সার্থক সৃষ্টি।

সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্য ও স্বভাবানুকারিতা থাকা চাই, এতদুভয়ের কোন একটা না থাকিলে সৃষ্টি কিঞ্চিৎ প্রশংসা যোগ্য হইলেও তাহাকে সার্থক সৃষ্টি বলা যায় না।

আজকাল উপরোক্ত মতের সমীচীনতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হইতেছেন। এই শ্রেণীর লেখক ও পাঠকসম্প্রদায় সৃষ্টির স্বভাবানুকারিতাকেই আঁকড়িয়া ধরিতেছেন। তাঁহাদের মতে সৃষ্টি স্বভাবাতিরিক্ত হইবার প্রয়োজন নাই। এই মতাবলম্বীগণ Realism এর ধূয়া ধরিয়া সাহিত্যে নগ্ন বীভৎসতা আমদানী করিবার পক্ষপাতী। মনুষ্য হৃদয়ের সমস্ত Sentimentsই ইঁহারা উন্মুক্ত করিয়া ধরিতে ভালবাসেন। কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের কোন ভাগ গ্রহণীয় এবং কোন ভাগ বর্জ্জনীয়, তাহা যিনি বুঝিতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

উপন্যাসিকের আর একটি গুণ রসোদ্ভাবন। রসস্ফুর্তি না ঘটিলে কথাসাহিত্য-রচনা নিরর্থক। কিন্তু এ কার্যটি এতই কঠিন যে স্বাভাবিক প্রতিভা ও রসানুভূতি ব্যতিরেকে ইহার সাফল্য একপ্রকার অসম্ভব। অনেক লিপিকুশল লেখকের রচনাও সম্যক্ রসানুভূতি দৈন্যে একেবারে নিরর্থক। সুতরাং রস-পরিচালনে অত্যন্ত সাবধানে লেখনি চালনা করিতে হয়। অনেক লেখকেই লিপিকুশলতার বাহার এবং চটকদার শব্দ-সম্ভারে পাঠক-গণকে চকিত করিয়া তুলিতে পারেন বটে, কিন্তু রস-পরিচালনে অক্ষম বলিয়া প্রায়ই তাঁহাদের রচনা সমজদার পাঠকগণের নিকট নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হয়। কৌশলী লেখকের সোজা দুই একটা রেখাপাতেই রসচিত্র চমৎকার ফুটিয়া উঠে।

“কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে...অতএব সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য” বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য উদ্ধৃত করে আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর পর লিখেছেন :

আজকাল একশ্রেণীর সাহিত্যিক সাহিত্যে ‘নীতি’, ‘নীতি’ করিয়া চীৎকার করিতেছেন। তাঁহারা ধর্মের বচন, জাতীয়তা, নীতি প্রভৃতি কতকগুলি ছোট বড় শব্দ লইয়া অত্যন্ত লুফানুফি করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত মত তাঁহাদের কিছু কাজে আসিবে কি না, জানি না। তবে আমাদের মনে হয়, নৈতিক উদ্দেশ্যযুক্ত কাব্য বা উপন্যাস অপেক্ষা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি উদ্দেশ্যযুক্ত কাব্য বা উপন্যাস উৎকৃষ্ট ও সার্থক সৃষ্টি। নীতি প্রভৃতি উদ্দেশ্যারোপে আর্ট স্কুণ্ণ হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বাংলা কথাসাহিত্য ধারায় বাঙ্গালী মুসলমানের দৈন্য প্রসঙ্গে এরপর প্রাবন্ধিক লিখেছেন :

বঙ্গসাহিত্যে কথা সাহিত্যের ধারা যে ভাবে চলিয়াছে, তাহা আশাপ্রদ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকবর্গের লেখনি বর্তমানে কথা সাহিত্যের ধারাকে যেস্বরে উন্নীত করিয়াছে, তাহা জগতের যে কোন উন্নতিশীল সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে কথা-সাহিত্যের দৈন্য অত্যন্ত অধিক। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, কতিপয় মুসলমান সাহিত্যিক সাহিত্যে কথা-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই অনুভব করিতেছেন না। তাহাদের মতে কথা সাহিত্যের দ্বারা লোকশিক্ষা কিছুতেই হইতে পারে না। কথাসাহিত্য কতকগুলি লঘুচিত্ত ও অসার ভাবপ্রবণ পাঠক সৃষ্টি করে মাত্র। এ-মত কতদূর সমীচীন, তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। কারণ, কথা সাহিত্যের আবশ্যিকতা এখন সহস্রকণ্ঠে সমর্থিত হইতেছে। তবে সত্যের অনুরোধে আমরা একথা বলিতে বাধ্য, যে কল-কৌশলহীন কথা সাহিত্যের আমরা পক্ষপাতী নহি। অবশ্য এই শ্রেণীর কথা সাহিত্য আজকাল বঙ্গসাহিত্যে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে। নিরর্থক ‘প্রেম’ (love) লইয়া কল-কৌশলশূন্য উপন্যাস রচনা করাই আজকালকার ক্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ লেখকদের কলাকৌশল জ্ঞানের দৈন্য এবং লিপিকুশলতার অভাবই যে ইহার একমাত্র কারণ তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে কথা সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে ইহা আশার বিষয় বলিতে হইবে বটে, কিন্তু অধিকাংশ কথাগ্রন্থ পড়িয়াই যে আমাদের হতাশ হইতে হইয়াছে, তাহাও না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। প্রায় কোন কথাগ্রন্থই আমরা লেখকের শক্তির পরিচয় পাই না। যাহাই মনে আসিবে, তাহাই লিখিয়া ছাপাইতে হইবে, আমাদের অধিকাংশ লেখকের মূলমন্ত্র যেন এইরূপ। উপন্যাস লিখিতেও যে বিশেষ সাধনার আবশ্যিক, তাহা ভ্রমেও কাহারো মনে উদ্ভিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, “যাহা লিখিবেন

তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না; কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক, উপন্যাস, দু'একবৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।" আমাদের অধিকাংশ লেখকের মনেই সাহিত্য সম্রাটের এই অমূল্যবাণীর কোন প্রভাবই নাই। এই জন্যই বাঙ্গালার ছাপাখানা আজকাল অসংখ্য রাবিশগ্রন্থ প্রসব করিতেছে।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন এরপর বাঙালী মুসলমান ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। মন্তব্য নিম্নরূপ:

মীর মোশাররফ হোসেন : বিধাদ-সিদ্ধু। "ইহার সরস মধুর ভাষায় যে একটা করুণ রস প্রবাহ উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহা জগৎ-সাহিত্যে বরণীয়।" এই জন্যই ইহার এত খ্যাতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মৌলিকতা ইহাতে কিছুই নাই। ইহার পুট লেখক গ্রন্থান্তর হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।"

নজিবর রহমান : আনোয়ারা হাসান গজাবাহমণী, প্রেমের সমাধি, পরিণাম। "উপন্যাস কৌশল এ সকলের মধ্যে অল্পই রক্ষিত হইয়াছে।"

মোজাম্মেল হক : জোহরা। "উপন্যাস হিসাবে ইহা সার্থক সৃষ্টি নহে। ইহার ঘটনা-প্রবাহ আরব্য উপন্যাসের ন্যায় বা বাঙ্গালার রূপকথার মত অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ভঙ্গি তরঙ্গিত হইয়া প্রান্তরে, কান্তারে, বনে, জঙ্গলে, মাঠে ঘাটে ছুটিয়া চলিয়াছে। তবে ইহার সরস হাস্যচপল ভাষা মুসলমান সমাজে অনেক দুর্নীতির উপর যে সুমিষ্ট বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য।"

ইসমাইল হোসেন সিরাজী : "তাহার একখানি উপন্যাস পড়িয়াও আমরা আনন্দ পাইলাম না। তাহার একখানি গ্রন্থেও কথাসাহিত্যের কলা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ঔপন্যাসিক আর্ট ও আদর্শের প্রতি কম মনোযোগী হইয়া তিনি অন্য একটি নিতান্ত নগণ্য বিষয়ের প্রতি সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া উপন্যাস সৃষ্টির প্রতি যে অবমাননা দেখাইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই নিতান্ত ক্ষোভনীয়।"

"সফিউদ্দীন সাহেবের "কনোজ কুমারী", নূরুলহক চৌধুরী সাহেবের "আকর্ষণ", শেখ ইদ্রিস আলী সাহেবের "বন্ধিম দুহিতা", প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধেও উপরি উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করা চলে। কারণ এইগুলি সকলই একজাতীয় উপন্যাস। এ সকলের মধ্যে ঔপন্যাসিক কলা-কৌশল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের অনুরোধ এই সমস্ত গ্রন্থকারকগণ যেন ইত্যাকার গ্রন্থাদি লিখিয়া নিজ নিজ শক্তির অপচয় না করেন।

শাহাদত হোসেন সাহেবের "মরুর কুসুম" নামক উপন্যাস খানা পাঠ করিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। বিশেষ একটা প্রতিভার, একটা শক্তির পরিচয় পাওয়া না গেলেও ইহাতে উপন্যাস বলিবার যে একটা মনোরম কবিত্বপূর্ণ ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা আশাপ্রদ।

কাজী আবদুল ওদদ সাহেব একজন উদীয়মান কথাসাহিত্য-রচয়িতা। তিনি সুশিক্ষিত, প্রতিভাশালী ও জ্ঞানী। তাহার নিকট হইতে আমরা এমন কিছু পাইতে আশা করি, যাহাতে একটা প্রতিভার ছাপ লাগিয়া আছে, একটা বিশেষ শক্তির পরিচয় প্রকটমান হইয়া আছে। এ পর্যন্ত আমরা তাহার নিকট হইতে দুইখানা গ্রন্থ পাইয়াছি,—মীর

পরিবার ও নদীবক্ষে। কিন্তু আমরা তাঁহার নিকট হইতে যেমনটি চাহিয়াছিলাম, তেমনটি যেন পাই নাই।

তিনি শরৎবাবুর অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎবাবু ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য-রচয়িতাদের লেখায় যে তরল স্মৃষ্টি হাসি ও রসিকতা আমরা পাই, কাজীসাহেবের গ্রন্থে আমরা তাহা পাই না। নিতান্ত গম্ভীরভাবেই যেন তিনি গল্প বলিতে ভালবাসেন। তিনিও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় অল্প কথায় যেস্থানের বিশ্লেষণ উপন্যাসোচিত, আর্ট-সম্পন্ন ও সুন্দর হইত, সেই স্থানে তিনি অনেক কথা নিতান্ত বাহ্যল্যভাবেই খরচ করিয়াছেন।

এইবার আমরা একজন লেখকের নিকট উপস্থিত হইব, যাহার লেখায় আমরা একটা প্রতিভার—একটা শক্তির—একটা নূতনত্বের—একটা মৌলিকতার পরিচয় পাইয়া আশা নিত হইয়াছি। ইনি ‘রবীন্দ্র প্রতিভার’ প্রতিভাশালী লেখক একরামুদ্দীন। তিনি ‘কাচ ও মণি’ নামক একখানা উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছেন। ‘সওগাতে’ তাহা মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে। এখনও ইহা সমাপ্ত হয় নাই। কাজেই এখনও উহার সমালোচনার সময় আসে নাই। কিন্তু তথাপি ইহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, আমরা প্রথম হইতেই একটা নূতন শক্তির পরিচয় পাইয়া পুলকিত ও আশান্বিত হইয়াছি। ইহা আধুনিক ঔপন্যাসিক রীতিনীতি-যুক্ত নহে বটে, ভাষাও শরৎচন্দ্রী ভাষা নহে ইহাও ঠিক, ঘটনা প্রবাহও আধুনিক Realism এর বড় বেশী অনুকূল নহে, ইহাও সত্য; কিন্তু ইহার মধ্যে যে ঔপন্যাসিক আর্ট বিদ্যমান আছে, যে একটা চমৎকার ভঙ্গি আমরা প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, তদুপরি লেখকের যে একটা সহৃদয়তাপূর্ণ রসিক প্রাণের ছাপ এই রচনাকে নন্দিত করিতেছে, তাহা বাস্তবিকই খুব উপভোগ্য এবং যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিভার পরিচায়ক।”

উপসংহারে প্রাবন্ধিক লিখেছেন: “উপসংহারে নিবেদন, যাহারা কথাসাহিত্য রচনায় মন দিয়াছেন, তাহারা যেন কথাগ্রন্থের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, আদর্শ, বিশেষত্ব প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। বর্তমান কথাগ্রন্থ রচনার যে প্রবল শ্রোত বহিয়া চলিয়াছে, এই শ্রোতের মুখে পড়িয়া যা’ তা’ লিখিলে সাহিত্যের জঞ্জাল বৃদ্ধি হইবে মাত্র। তাহাতে পয়সা উপার্জিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্য-দরবারে ইহা একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তাই কথাসাহিত্য-জগতে নূতন প্রবেশার্থী সাহিত্যিক গণকে আমাদের সানুনয় অনুরোধ তাঁহারা যেন বড় বড় সাহিত্যিকগণের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কথাগ্রন্থ রচনার কলা কৌশল সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়া এ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাহা হইলেই আমাদের সাহিত্য তাঁহাদের রচনাসম্ভারে অচিরেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।” প্রবন্ধটির শেষ সম্পাদক টীকা দিয়েছেন:

“আমরা দুই এক স্থানে লেখকের সহিত এক মত হইতে পারিলাম না—সম্পাদক।”

৪র্থ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যায় আবদুল মজিদ একটি বিশ্লেষণাত্মক দীর্ঘ প্রবন্ধে বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য আলোচনা করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে একটি প্রবন্ধ হলেও দুই সংখ্যা শিরোনামে কিছু ভিন্নতা আছে। প্রথম সংখ্যায় শিরোনাম “বাঙালী মোসলেম ভাষা ও সাহিত্য”। দ্বিতীয় সংখ্যায় শিরোনাম “বাঙালার মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য”। আবদুল মজিদের ভাষা প্রাজ্ঞল, স্বচ্ছন্দগতি। তিনি বাংলার ইতিহাস, আর্য-অনার্য প্রশ্ন, মুসলিম আগমন পূর্ববর্তী শাসকদের ভূমিকা আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে লিখেছেন:

“মগধে বৌদ্ধ রাজত্বকালে পালি সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল। প্রাচীন বাঙলায় পাল বংশের আমলে অনেক গাথা ও ছড়ার জন্ম হয়। সেন বংশের রাজত্বকালে জয়দেব সংস্কৃত গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন। তাঁরা বাঙলা ভাষার জন্য কিছু করে যাননি। ডাক ও খনার বচন নাকি আসামেই বানানো হয়েছিল।

মুসলমান আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই ছিল বাঙলার সাহিত্যের অবস্থা। ১২০৩ খৃঃ আফগানী মোস্লেমেরা বাঙলা ফতে করে গোড়ে সোহ্তানাত্ কায়েম করেন। তখন থেকে একদিকে বাঙলায় বিনাড়ম্বরে ফকীর দরবেশদের চেষ্টায় ও চরিত্র বলে ইসলাম প্রচার হ’তে থাকে, অপর দিকে আস্তে আস্তে বাঙলা ভাষারও সৃষ্টি হয়ে বাঙলা সাহিত্যের গোড়ীয় যুগের পত্তন হয়। মুসলমান আমল থেকেই বাঙলা দেশের হিন্দু ও বৈষ্ণব কবিগণ মঙ্গল কাব্য ও বৈষ্ণব কাব্য এবং মুসলমান কবিগণ পুঁথি-সাহিত্য রচনা করতে শুরু করেন। এই নূতন ক’রে গড়া ভাষাকে আপনারা হিন্দুর ভাষাই বলুন, আর মুসলমানের ভাষাই বলুন, ইহা বাঙালীরই ভাষা, এতে করেই বাঙালী নিজের প্রাণের কথা বলেছে, শুনেছে, গেয়েছে।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর যে পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য :

“কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ফলে, মুসলমানের হাত হতে ইংরাজের হাতে রাজ্য চলে যাওয়ায় বাঙলা ভাষা তার নিজের স্বরূপ হারিয়ে ফেলে।”

এরপর পণ্ডিতেরা বাংলাকে সংস্কৃত শব্দ বহুল করে ফেলেন। ফলে সাহিত্যের ভাষা জনসংলগ্নতা হারিয়ে ফেলে। পরে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিরা আবার ‘বাঙালীর বাংলায়’ লিখতে শুরু করেন। এ সময় বাঙালী মুসলমানের অবস্থা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের মন্তব্য :

“একটু একটু করে সরে আপন খাতে চলে যাচ্ছে। ঠিক এমনি সময়ে বাঙলা একদল আশরাফ মোস্লেম বাঙলা ছেড়ে উর্দুকেই বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা করবার জন্য বিশেষ চিন্তিত হলেন, আর জন কয়েক মোসলেম লেখক পুরাতন সাহিত্যের বন্ধন ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য সংস্কৃতানুগ সাহিত্য গড়তে চেষ্টা করলেন। তাতে ফল এই হ’ল যে তাঁরা প্রতিজ্ঞা অর্জন করে নিজের সমাজের সাথে চলতে পারলেন না। একেবারে দল ছাড়া হয়ে পড়লেন। আর যারা আরবী ফারসী শব্দ মিশিয়ে বাঙলা লিখতেন, তাঁরা সমাজের নিম্নস্তরের ভিতর তাঁদের আধিপত্যটা বজায় রাখলেন সত্য, কিন্তু সমগ্র সমাজকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারলেন না। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে শক্তি সঞ্চয় হলনা বলেই বাঙালী মোস্লেমরা আঁধারেই পড়ে আছেন। কিছু দিন আগে কাজী নজরুল ইসলামী-ভাষায় লিখতে শুরু করেছিলেন, এবং তাঁর রচনার ভিতর ইসলামী ভাবের খোঁশ্বু পেয়ে সমাজ খুবই যে আশান্বিত হয়েছিল সে কথা আমরা জানি। কিন্তু তিনি মনে করলেন বাঙলার মোস্লেম সমাজ তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত আদর করেনি। এই ভুল ধারণা নিয়ে তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁর রচনায় ইসলামী ভাব একেবারে বাদ দিয়ে দিলেন। মোস্লেম সাহিত্য গড়বার দিনে তাঁর এই মত পরিবর্তন নিতান্ত দুঃখের বিষয় বটে। বাঙলার মোস্লেম সমাজ তার নিজের লোকদের দেওয়া অনেক অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করেছে, এটাও তাঁদের সহ্য করতে হবে।”

আবদুল মজিদের প্রবন্ধের পরবর্তী অংশের মূলকথাসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

“যে বাঙলায় মুসলমান শতকরা পঞ্চাশজন সেখানকার ভাষায় যদি ইসলামী প্রভাব না থাকে তবে তা কি বাঙলা? তাকে আর যে কোন নামে চালিয়ে নাও কিন্তু তার বাঙলা

ভাষা নাম দিয়ে তাকে পঙ্খ ক'রনা। উত্তরে নেপাল ও ভূটান, দক্ষিণে বঙ্গসাগর পশ্চিমে উড়িষ্যা ত্রিভূম, মানভূম ও বিহার, পূর্বে আসাম, গোয়ালপাড়া, কাছাড় প্রভৃতি সীমার মাঝখানে, যেখানে অধিবাসীরা সকলে বাঙলা ভাষায় কথা বলে তাই হ'ল বাঙলা মূলক। এই মূলকের সকল বাসিন্দাদের কথা ভাষা মিলিয়ে যে লেখ্য ভাষা তৈরী হবে তাই হবে বাঙলা ভাষা। বর্তমানে স্কুল কলেজে পাঠ্য পুস্তকে কেবল মাত্র হিন্দু ভাবময় বিদ্যাসাগরী (Style) এর যে সব বাঙ্গলা পুস্তক পড়ান হয়, তা বাঙ্গালীর সাহিত্য নয়। সেই জন্যই তো বাঙ্গালী মুসলমানেরা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার বাহন যাতে বাঙলা না হয় তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। এটা ঠিক বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান নয়, সংস্কৃত বাঙলার বিরুদ্ধে অভিযান।***

আইন পড়ানোর বেলায় যেমন Jurisprudence এর এবং ডাক্তারী পড়াতে যেমন Physiology র definition বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তেমন ভাষা শেখার কালে মুসলমানের বাঙলা ভাষা, মুসলমানের গড়া সাহিত্য ফেলে দিয়ে হিন্দু ভাষার সাহিত্য গঠন করতে চেয়েছেন। আফিসে আদালতে, স্কুলে কলেজে, তারা যেমন এক-চেটিয়া ব্যবসায় চালিয়ে নিয়েছেন, সেরূপ তাঁরা বাঙলা সাহিত্যেও করেছেন। টেক্সটবুক কমিটিতেও তাঁরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁরা। তাঁদের মতে ভাষাতে সংস্কৃত শব্দ না লাগাইলেই নয়। কিন্তু বাঙলা দেশ কি কেবল হিন্দুর? বাঙলা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের। অতএব বাঙলা ভাষায়ও মুসলমানের অধিকার থাকা উচিত। মুসলমানকে তাঁর এই জন্মগত অধিকার থেকে চ্যুত করার উদ্দেশ্য কি, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তা সহজে বুঝতে পারেন।***

আসল কথা হচ্ছে এই যে বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য বাঙ্গলা ভাষার এখনও লোপাৎ তৈরী হয়নি, এটা করতে হবে। আমাদের মৌলবী সাহেবদের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল কোরান হাদিস, ফেকা উম্মুল প্রভৃতির বাঙলা তরজমা করতে শুরু করেছেন, তার মধ্যে অনেক আরবী ফারসী শব্দ তাঁরা হুবহু রেখে দিয়েছেন। বাঙলার শিক্ষিত মুসলমানদের তাঁদের রচিত বই পড়ে ঐ সকল শব্দ আয়ত্ত করতে হবে। তা'হলে অতি সহজে এবং বিনা আড়ম্বরে তাঁরা তাঁদের রচনার মধ্যে ইসলামী ভাব ও আদর্শ প্রচার করতে পারবেন।

একশত বছর হিন্দুর লেখা পড়ে আমরা উন্নতি করতে পারিনি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের নিজের ভাষা ছেড়ে না দিয়ে উহারই সেবা ও সাধনা করতাম, তা'হলে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই আমাদের ভাষা শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠত। আর আজ আমরা যে অভাব দৈন্যের মধ্যে পড়ে হা হুতাশ করছি, তা কখনও করতে হত না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইসলামের উচ্চতম আদর্শের ভিতর দিয়েই আমাদের জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। আমাদের জন্য অন্য পথ নেই, অন্য গতি নেই। আমাদের বেঁচে থাকতে হবে ইসলামের জন্য। দেশকে আমরা ভালবাসবো, দেশের আমরা সেবা করব, ইসলামকে কতল করে নয়, ইসলামকে সজীব, সচেতন রেখে।***

বাঙ্গালী মুসলমানেরা সকলে অবশ্য আরবী, তুর্কী, ইরানী, তুরানীর আওলাদ ন'ন। তাঁদের বেশীর ভাগই যে আর্থ্য হিন্দু ও অনার্য্য দ্রাবীড় ও বৌদ্ধদের সন্তান এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই। এটা হ'ল ইসলামের ফখরের জিনিষ।***

ভাষা লিখতে ও জানতে ব্যাকরণ চাই। বাঙলা ব্যাকরণ সংস্কৃতের কন্যা হলেও কোন কোন ব্যাকরণ কর্তা সত্য গোপন না করে, মুসলমানদের লেখা ফার্সী ব্যাকরণে Arabic

Element এর Chapter এর মতো বাঙলার আরবী-ফারসী শব্দ, বাঙ্গালা সন্ধি, ধাতু, সমাস, কৃৎ তদ্ধিৎ প্রভৃতি কথা লিখে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কোন পণ্ডিতজি বা বাবু এ যাবত বাঙলায় সংস্কৃত Element বলে ব্যাকরণে কিছু লিখেননি।

বাঙলার মুসলমানেরা ভাব প্রকাশের জন্য যে সকল সহজ বোধ্য আরবী ফারসী শব্দ কথা ভাষায় ব্যবহার করেন, সে সকল শব্দ তাঁরা বাদ দিয়ে কোন রূপেই জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে পারেন না। লেখ্য ভাষার গতি এখন কথা ভাষার দিকেই যখন চলেছে, তখন মুসলমানগণ যদি ঐ সকল শব্দ অবিরত লেখ্য ভাষার মধ্যে ব্যবহার করেন, তবে ওগুলির সর্বত্র প্রচলন হতে কোন বাধা বিপত্তি উপস্থিত হবে না। যাঁরা এখন ওগুলির প্রচলনে ঘোর আপত্তি করছেন, তাঁরা তখন ওগুলির ব্যবহার না করে পারবেন না। এটা করতে পারলেই বাঙলা ভাষার উপরে আমাদের যে অধিকার আমরা হারিয়ে ফেলেছি, তা নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, তাকে ফিরে আসতেই হবে! বাঙলা ভাষার গঠন কার্যে এটাই হবে বাঙালী মুসলমানের শ্রেষ্ঠ দান। বাঙলার সর্বত্র এক কথা ভাষা প্রচলিত নয়। তাই কথা ভাষার আদর্শ হবে শান্তিপুর ও কলিকাতার কথা ভাষা মিশিয়ে যে ভাষা হবে সেই ভাষা। এতে ফল এই হবে যে বাঙলার সর্বত্র কথাভাষার প্রকৃতি এক হয়ে যাবে। বিভাগ ভেদে উচ্চারণ বৈষম্য ঘটবে সত্য কিন্তু তা হলেও ওর আদর্শ একই থাকবে।”

ভাষা বিষয়ক এই আলোচনার পর পরবর্তী সংখ্যায় (৪:২) প্রকাশিত আবদুল মজিদের প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ সাহিত্য-বিষয়ক। এই অংশের মূল মন্তব্যসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

“এক কথায় সাহিত্য হচ্ছে একটা মজহাব, কওম, সম্প্রদায় বা জাতির খেয়الاتের সমষ্টি। তা হ'লে বাঙলা সাহিত্য বলতে কি হিন্দু-রচিত নাটক, নভেল, গদ্য-পদ্য পুস্তক ও সংস্কৃত হতে অনূদিত গ্রন্থই বুঝাবে? অনেক মুসলমানের গদ্য-পদ্য রচনা বর্তমান থাকতে তা কি বাঙলা সাহিত্য বলে গণ্য হবে না?

কথা উঠতে পারে, এখনও বাঙালী মুসলমানেরা এরূপ একজন কবি বা লেখক দিতে পারেনি যাঁর রচনা জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজ পড়া আবশ্যিক মনে করেন। মুসলমান জনসাধারণ এখনও পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে রসের সন্ধান পাচ্ছে, আনন্দের সন্ধান পাচ্ছে, কিন্তু শিক্ষিত সমাজ Intelligentsia তা পাচ্ছেন না। তার কারণ, আমাদের সাহিত্য চলতে চলতে পথে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে অনেক দিন, তাকে আবার নূতন করে চালিয়ে নেওয়ার জন্য কেউ চেষ্টা করেন নি। মোসলেম শিক্ষিত-সমাজ ভেবেছিলেন, ও বালাই ওখানেই থাক, ওকে আবার সাথে নিয়ে কি হবে? ওটা চাষা-ভূষোর ভাষা হয়েই থাক, আমরা মনের সাথে সংস্কৃত বাঙলার ভিতর দিয়েই আমাদের বিজয় রথ চালিয়ে নেবো। কিন্তু সে রথ আর চলতে চায়না, সাম্নেও নয়, পিছনেও নয়। রথ বন্ধে তোমাদের যে শক্তি দিয়ে আমরা চালালে আমি বেশ চলে যেতে পারতুম, সে শক্তি তোমরা ফেলে এসেছ পল্লী-প্রান্তরে চাষী ও মজুরের কাছে। আর যা নিয়ে আজ আমরা চালাতে চাচ্ছ ওটা যে তোমাদের নয়, ঠিক দাঁড়কাকের ধার-করা ময়ুর পুচ্ছের মত ওটা যে সামান্য বাতাসেই খসে পড়ছে। আসল কথা আমাদের চলা উচিত ছিল পুঁথি সাহিত্য যেখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে। তা হলে আমাদের সাহিত্যের ইজ্জত আজ অনেকটা বেড়ে যেতো, আর শিক্ষিত সমাজের কাছে তাকে খাঁটো হয়ে থাকতে হতোনা। পুঁথি সাহিত্য বাঙলা ভাষার বাইরের জিনিষ নয়, ওটা তারই একটা বিশিষ্ট সম্পদ। মুসলমান সমাজে হরহামেসা যে সকল আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়, ওতে

তা এস্তুমাল করা হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ বাঙালী মুসলমানের কথা ভাষার ভিতর দিয়েই পুঁথি-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। বাঙালী মুসলমানের যদি বাঙলা ভাষাকে কিছু দেওয়ার থাকে, তবে তা দিতে হবে পুঁথি সাহিত্যের সহিত যোগ রেখে। তার ভিতরে যে কি অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে আছে, তার পরিচয় কাজি নজরুল ইসলাম দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন বাঙলার মুসলমানকে কোন পথ দিয়ে সাহিত্য সাধনা করতে হবে।***

চলতি ভাষায় রচনা করা কাজি নজরুলের বিশেষত্ব। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন ইসলামী শব্দ সংযোগে কেমন সুন্দর ও উচ্চভাবপূর্ণ কবিতা লিখা যায় এবং ইচ্ছা করলে তাতে কেমন প্রাণ ও শক্তি ঢেলে দেওয়া যায়। তিনি যত গুলি ইসলামী কবিতা লিখেছেন তাতে তিনি যে ভাব ফুটিয়েছেন, তা যেমন ইসলামী, তার ভাষাও খাঁটি ইসলামী। তিনি দেখিয়েছেন, ইসলামী বাঙলা ভাষা কোন মতেই বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রের ভাষার চেয়ে কম মধুর ও প্রাজ্ঞ নয়। বরং তার ভিতর হতে যে একটা শক্তির লীলা ফুটে বেরোয়, যে একটা মধুরতা, যে একটা সৌন্দর্য্য আত্ম-প্রকাশ করে, তার সন্ধান সাংস্কৃতিক বাঙলা রচনায় পাওয়া যায় না। হিন্দু পৌরাণিক গল্প নিয়ে, হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে এই বাঁধন-হারা বিদ্রোহী মোসলেম কবি ইসলামী শরিয়ত বিরুদ্ধ কয়েকটা কবিতা লেখাতে তাঁর প্রতি বাঙলার মোসলেম জনসাধারণ বেজার হলেও, তিনি যে মোসলেম কবিদের মাথার মণি একথা অস্বীকার করা যায় না। আজীবন হিন্দু সমাজে চালফেরা করে হিন্দু পৌরাণিক গল্প পড়ে, তিনি যে হিন্দু ভাবের কবিতা লিখবেন তাতে বিচিত্রতা কি? হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন আমাদের এই বিদ্রোহী কবি আবার ঘরে ফিরে আসবেন খাঁটি মুসলমানের সাজে, খাঁটি মুসলমানের মন নিয়ে। যৌবনের উদ্দাম বাসনা যখন খেঁতিয়ে যাবে, দৃষ্টি যখন অবাস্তব থেকে বাস্তবে ফিরে আসবে, যে মায়া-মৃগের পিছনে তিনি এখন ঘুরছেন, তা যখন তাঁর দৃষ্টির অতীত হয়ে যাবে, তাকে পাওয়ার আর কোন ভরসাই থাকবে না, তখন তাঁকে যে তাঁর নিজের গভীর মধ্যে, নিজের কোঠায়, আবার ফিরে আসতে হবে, এ আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। খোঁদা করুন, সে খুসীর দিন যেন শীঘ্রই আসে।***

সাহিত্যে জাতির ভাব-সমষ্টি ফুটে উঠে। তা হয় শব্দের গাঁথুনিত। আগে বলা হয়েছে, বিদ্যাসাগরের পূর্বে এদেশে ছিল সহজ, সরল, বৈষ্ণবী বাঙলা আর মুসলমানী বাঙলা। এই দুই বাঙলা মিশে এক হয়ে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল এবং তা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বাঙলা থেকে প্রাকৃত ও আরবী-ফারসী শব্দ ও এবারত উঠিয়ে দিয়ে সে স্থান পূরণ করেন সংস্কৃত শব্দ ও এবারতের সাহায্যে। তাঁরা বাঙলায় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রূপ সংস্কৃতে বাঙলা সাহিত্যের এমারত তৈরী করে গেছেন।***

বিদ্যাসাগরের জীবিত কালেই বাঙলা সাহিত্যে আর এক নব জ্যোতিষের উদয় হলো, তিনি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি দেখলেন এ দেশ হিন্দু-মুসলমানের, স্মৃতি-ভাষাও তাদের। তাই যদিও তাঁর লজপত্ৰায়ী ধাত ছিল, তবুও তিনি বিদ্যাসাগরী ভাষার রূপ বদলিয়ে দিয়ে তাকে কতকটা দেশী ছাঁচে ঢেলে নিলেন। বিদ্যাসাগর যে সকল মুসলমানী শব্দকে মানবিক বোধে বাঙলা সাহিত্যের বুক থেকে টেনে ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাদের কতকগুলিকে আবার টেনে নিলেন বুকের কাছে। এই কাজ ক'রে তিনি সকলকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, বাঙলায় একটা নিরেট বাঙালী জাতি গড়তে হলে মুসলমানকে বাদ দিয়ে চলবেনা, চলতে পারে না। চরিত্র সৃষ্টি বিষয়ে তিনি মুসলমানের প্রাণে বহু আঘাত দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁর বাঙলা ভাষাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার সঙ্কল্পের ভিতরে যে মহান উদ্দেশ্যটি লুকানো ছিল, তা হচ্ছে

ভাষার দিক দিয়ে হিন্দু মুসলমানের মিলন ঘটিয়ে দেওয়া। বর্তমানের দিকে ফিরেও তাকান নি তিনি, তাঁর দৃষ্টি পড়ে ছিল স্বদূর ভবিষ্যতে, যেখানে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মহা-মিলনের কল কোলাহল শুনে পেয়েছিলেন। দেবী চৌধুরাণী হতে সামান্য একটা অংশ উদ্ধৃত করে বন্ধিম যে ভাষা গড়তে চেয়েছিলেন তার নমুনা দিচ্ছি।— ‘হর বল্লব বলিলেন, আমার সঙ্গে পাঁচসাত শত সিপাহী পাঠাইতে হুকুম হউক, সাহেব সিপাহীর হুকুম দিলেন। “বন্দুক আর সঙ্গিন হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। লাঠি তুমি বাঙ্গালার আবরু পর্দা রাখিতে।”

বাঙলা ভাষায় ‘আওয়াজ’ শব্দটা স্থান পেতে পারে কিনা তাই নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু প্রধানরা বলেন, সিপাহীর পরিবর্তে যোদ্ধা, হুকুম—আজ্ঞা, সাহেব—মহাশয়, বন্দুক—আগ্নেয়াস্ত্র, আবরু—পরদা—, শুদ্ধান্ত হ’লে Chaste ও Elegant হয়। তাঁদের মতে ইসলামী শব্দ হলেই Unchaste ও Unelegant এর ভিতরে একটা বিপুল জাতি বিদ্রোহের গন্ধ পাওয়া যায়। একরূপ করে তাঁরা ভাষার স্বচ্ছন্দ গতিতে আড়ষ্টতা এনে দিয়েছেন। একদল সাহিত্যিক কথ্য ভাষাকে লেখ্য ভাষায় পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করছেন সত্য, কিন্তু তাও চলতি আরবী ফারসী শব্দ গুলি বাদ দিয়ে। তাঁরা ওগুলিকে Untouchable করে রাখতে চান। কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন, যে শব্দগুলি বাঙলার শতকরা ৬০ জন লোক ব্যবহার করে আসছে, তার অস্তিত্ব লোপ করে দেওয়া সোজা কথা নয়। আজ বাঙলার মুসলমানের দৃষ্টি যখন ওদিকে পড়েছে, তখন ওগুলিকে আবার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ভিতরে ঠাই করে দিতেই হবে।

মীর মশারফ হোসেন, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দিন, মোজাম্মেল হক সাহেব প্রভৃতি তাঁদের রচনায় বিদ্যাসাগরী ভাষার অনুকরণ করেছেন, তাই তাঁরা মুসলমান বাঙলা সাহিত্যের দিক দিয়ে মুসলমানদের প্রচুর আনন্দ দিয়ে থাকলেও তাঁরা বাঙলার মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি, সাহিত্য সেবার দিকে ঠিক যেমনটি বন্ধিম করে গেছেন। যে কয়জনা বাঙালী মুসলমান লেখক উপন্যাস রচনা করেছেন, তাঁরা কেউ বন্ধিম হতে পারেননি। তাঁরা মুসলমানের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে যাননি, তাঁরা চেয়েছেন হিন্দু পাঠক পাঠিকার খোরাক যোগাতে, তাই তাঁদের সকল শ্রম ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। তাঁদের রচনার ভিতরে যে কয়টা আরবী ফারসী শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়, তা যেন অভিধান থেকে বেছে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া গোছের, তাঁদের প্রাণ থেকে যেন আনন্দে উচ্ছ্বাসে ওগুলি বের হয়নি। তাই মোসলেম-সাহিত্য সৃষ্টির হিসাবে ওগুলি নিতান্তই নিরর্থক ব্যর্থ রচনা। কোন জাতি বেঁচে আছে কি মরে গেছে, কোন জাতি নূতন জীবনের সাড়া পেয়ে চঞ্চল চকিত হয়েছে কিনা, তার নিদর্শন পাওয়া যায় সে জাতির চলতি সাহিত্য থেকে। মোসলেম সাহিত্যের আজ কাল যে অবস্থা, তাতে বেশ বুঝা যায়, জাতি হিসাবে, কণ্ঠ হিসাবে মুসলমান পড়ে আছেন ধূলা কাদায় পর্বতের পাদদেশে, তারা পাহাড়ে উঠে সেখানকার নির্মল হাওয়া ভোগ করার স্বপ্নান পাননি।

সংস্কৃত বাঙলার আশ্রয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে আমরা যে ভুল করেছি তার সীমা পরিসীমা নেই। আমরা আমাদের রচনা মোসলেম জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য করে রেখেছি, তাই তারা আমাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি, তারা আগেকার মতো পুঁথি সাহিত্য নিয়েই মশগুল হ’য়ে আছে। আমাদের মতে যে রচনার প্রভাবে জনসাধারণ প্রভাবিত হয়নি, সে রচনা উৎকৃষ্ট হলেও অকেজো; কারণ তা জাতির প্রাণে কোন নূতন আকাঙ্ক্ষা, কোন নব চেতনা জাগাতে পারেনি।

আমরা বাড়ীতে খেস-বেরাদরদের সাথে কথা বলবার সময় বহু আরবী ফারসী ও উর্দু শব্দ ব্যবহার করি। তখন আমরা যে ভাষায় কথা বলি তাই হলো আমাদের প্রকৃত ভাষা। আমাদের সাহিত্য একদিন সেই ভাষায়ই গড়ে উঠছিল, কিন্তু আমরা ভাল কাণ্ডারী নই বলে তার পথ বদলে দিয়েছিলাম। তার ফলে আমরা গন্তব্য স্থানে পঁহুঁছিতে পারিনি, মাঝ দরিয়ায় আমাদের নৌকা বান্চাল হয়ে গেছে। এতদিন পরে আমরা সে ভুল বুঝতে পেরে তা শোধরাবার চেষ্টায় আছি। মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ সাহেব, কাজি নজরুল ইসলাম, খান বাহাদুর মৌলভী আহসানুল্লাহ সাহেব, কবি গোলাম মোস্তাফা এবং মওলভী ইব্রাহীম খাঁ তাঁদের রচনার ভিতরে বহু মুসলমানী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ করে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের ভাষার আদর্শ কি হবে। আমাদের এখন থেকে প্রধান চেষ্টা হবে ইসলামী ভাব ও ভাষা দিয়ে সাহিত্য গড়ে তোলা। যতদিন আমরা এ কাজ না করতে পারবো, ততদিন আমাদের ভিতরে কোন স্থায়ী উন্নতির লক্ষণ দেখা যাবে না। *** মুসলমান বাঙলা সাহিত্যের একটা হিসাব নিকাশ করলে আমরা দেখতে পাই, পদ্য সাহিত্য মহাকাব্য Heroic poem, হেঁকায়েত Romance tales এবং Ballads আমরা কতকটা গড়ে ফেলেছি, কিন্তু Allegorical, Reflective, Romantic, Satirical বা Descriptive কবিতা আমাদের নাই। আমাদের কোন কবি সনেট লিখতেও চেষ্টা করেন নি। কিন্তু Lyrical কবিতায় আমরা কতকটা অগ্রসর হয়েছি। কাজি নজরুল ইসলাম ও গোলাম মোস্তাফা সাহেব গীতি কবিতা ও প্রেমের কবিতা লিখে বেশ যশস্বী হয়েছেন। কাজি কবির যুদ্ধসঙ্গীত, দেশ প্রীতিমূলক সঙ্গীত ও কসিদা বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যে গুলি নেই তাদের না থাকার কারণ হচ্ছে, আমাদের উচ্চ ভাব নেই, আমাদের যেমন ভাষা নেই, তেমন ভাবও নেই। *** গদ্য সাহিত্যে মুসলমানের হাত দিয়ে স্থায়ী কিছু যদি বার হয়ে থাকে তবে তা কেবল মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের বিষাদ সিন্ধু। উপন্যাস যে কয়খানা বার হয়েছে তার একখানাও স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত না। জীবন চরিতের দিক দিয়ে কোন কোন লেখক যে ধোরাক আমাদের দিয়েছেন তা উপভোগের জিনিষ বটে। বলতে গেলে তার সব কয়খানাই হজরতের জীবনী।

পদ্য লিখতে হলে ছন্দ ও বহর চাই, বালাগাত বা অলঙ্কারের দরকার হয়, তা আমাদের শিখিয়ে দেওয়া হয় না। বাঙলায় সংস্কৃত অলঙ্কার ও সংস্কৃত ছন্দ যথেষ্ট আছে, হিন্দুরা তার ব্যবহার করেছেন এবং এখনও করছেন। কিন্তু আরবী, ফারসী তুর্কী ছন্দ ও বালাগাত আমাদের ভাষায় আনবার চেষ্টা আমাদের নেই। গদ্য লিখতে গেলেও Rythm ঝঙ্কার বা এলান চাই। তা না হলে রচনার জান আসেনা।

মুসলমানের আরবী ফারসী কাব্য শাস্ত্র অবলম্বনে কাব্য ও কবিতা রচনা করলে তাঁরা যে কেবল ইসলামী তার ও ভাষার আমদানী করতেন তা নয়, তারা বাঙলা সাহিত্যকে একটা নূতন রূপ দিতে পারতেন।

সাহিত্য বলতে গেলে কেবল গদ্য ও পদ্য বুঝায় না। Art এবং Science নিয়ে যত রচনা হতে পারে সবই বুঝায়। সাহিত্যের এই বৃহত্তর গণ্ডির মধ্যে কিছু সৃষ্টি করতে হলেই পারিভাষিক শব্দের দরকার হয়। ইউরোপীয় ও আমেরিকানরা পারিভাষিক শব্দ নেন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা থেকে, হিন্দুরা নেন সংস্কৃত থেকে। আমাদের নিতে হবে কোন্ ভাষা হতে? আমার মনে হয়, আমাদের পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করতে হবে আরবী থেকে।

এখন কথা হইতেছে, আরবী শব্দ বাঙলা হরফে আমরা কেমন করে লিখবো? মোহাম্মদী ও সোলতান প্রভৃতি মাওলানা সাহেবদের সম্পাদিত বাঙলা সংবাদ পত্রে 'স'

এর জায়গা 'ছ' কে নিবিববাদে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই 'ছ' অক্ষরের উচ্চারণ কোমল নয়, কঠিন। 'ছ'র ঝাঁটি উচ্চারণ করতে গেলে 'চ' এর সঙ্গে যে তার জ্ঞাতিত্ব আছে, তা বেশ ভাল করে দেখাতে হবে। তাই কলিকাতা অঞ্চলের কোন মুসলমান ছেলেকে 'মুসলমান' বা 'মোছলমান' লিখে পড়তে দিলে, সে পড়ে বসে 'মুচলমান' বা 'মোচলমান'। মোশুরেকে বাঙলায় 'ছ' অক্ষরের ঠিক উচ্চারণ হয় না তাই সেখানকার ছেলেরা 'ছ' এর উচ্চারণ সিনের মতই করে থাকে। কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে দস্ত 'স'র যে উচ্চারণ করা হয় তাই হলো এই অক্ষরটার ঝাঁটি উচ্চারণ। তার সাথে সিনের উচ্চারণের একটুও তফাত নেই। মোট কথা বাঙলা বর্ণমালার ঠিক ঠিক উচ্চারণ যদি শিশুদের প্রথম থেকেই ধরে দেওয়া যায় তা হলে এ বৈষম্য মোটেই থাকবে না। র, ড় ও ঢ এর যা আসল উচ্চারণ তা না করে তাদের নাম ধরে ডাকতে গিয়ে মোশুরেকে বাঙলার ছেলেরা গুরু থেকেই গোলমাল পাকিয়ে বসে। বর্ণ পরিচয়ের সময়ে ওস্তাদ একটু যত্ন নিলেই এ দোষটা ঝুঁরে যেতে পারে। শ, ষ, স সম্বন্ধে ও সেই এক কথাই প্রযোজ্য। প্রথম থেকে ছেলেরা এমনি করে গড়ে নিলে আর তাদের মুখ দিয়ে 'মুশলমান' বেরোবে না, বার হবে 'মুসলমান'। ইচ্ছা করলে 'মোসলমান'ও বলতে পারেন, ওতে কিছু ইতির বিশেষ নেই।

অনেকে মুসলমানের জন্য বাঙলা ভাষা হারাম করে দিতে চান। কিন্তু তাঁরা এ কথা কেন ভুলে জান যে বাঙালী মুসলমানের মাতৃ ভাষাই বাঙলা। ওটাতে হারাম করে দেওয়া সোজা কথা নয়। তা করতে গেলে তাদের প্রকৃতির সাথে লড়াই করতে হবে।***

রচনায় যদি প্রাণ থাকে, তাব যদি পরিস্ফুট হয়, তা হবে আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগেও ওতে বিন্দুমাত্র আভাস আসবে না। যাঁরা আজ মুসলমানের বাঙলা রচনায় আরবী-ফারসী শব্দ দেখে শঙ্কায়-সঙ্কোচে আঁৎকে উঠছেন, তাঁরাই আবার ভাষার পুষ্টি-লাভের জন্য ওগুলির অধিকার নিয়ে আর ফাসাদ করবেন না। তাঁদের ওগুলি কাণে সয়ে যাবে আর যাঁরা বাঙলা ভাষাকে তাড়িয়ে দিয়ে উর্দুর বৈঠক বসাতে চান, তাঁরাও দেখবেন, আরবী-ফারসী যে সকল শব্দ আমরা কথ্য ভাষায় ব্যবহার করি, তাদের স্প্রয়োগ দ্বারা বাঙলা ভাষাকে আমরা ইসলামী শেক্স দিতে পেরেছি। এই পারাই আমাদের চরম ও পরম লাভ। এরই জন্য আমাদের কোসেস করতে হবে সকল মন প্রাণ দিয়ে।***

আমাদের জাতীয় জীবনে আনন্দের অভাব ঘটায়, আমাদের সাহিত্যেও তার ছায়া পড়েছে। আনন্দহীন সাহিত্য জাতীয় জীবনের সকল উন্নতির পরিপন্থী। বাঙলার মুসলমান সমাজে যে সকল আনন্দোৎসবের প্রচলন ছিল, তা যেন দিন দিন কমে আসছে।*** নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে যোগ রেখে যদি আমরা আমাদের ধর্মের সেবা করি, তাতে ধর্মের ভাব ম্লান না হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। জাতীয়-জীবনে আনন্দ ফুটে উঠলে জাতির সজীবতা ও সরলতা প্রমাণ করে দেয়। আশা করি আমাদের সাহিত্যসেবিগণ ও সমাজ নেতৃগণের দৃষ্টি এদিকে পড়বে।

দুঃখবাদের সাহিত্য গড়ে তোলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আনন্দবাদের সাহিত্যই আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আনন্দের ভিতর দিয়ে যা গড়ে উঠে তা স্থায়ী হয়। দুঃখের ভিতর দিয়ে যা গড়ে উঠে তা স্থায়ী নাও হতে পারে।

আমাদের সাহিত্যের এখন গঠন যুগ। এযুগে আমাদের সঙ্কীর্ণ-মনা হলে চলবে না। কিছু উদার আমাদের হতেই হবে। সঙ্কীর্ণতাকে আশ্রয় করে কোন দেশে কোন কালেও যে সাহিত্য গড়ে উঠেনি একথাটা আমাদের ভাল করে জেনে রাখা উচিত

মতও পথের পার্থক্য যেন আমাদের পরস্পরের মনকে অন্ধ না করে দেয়। নিজের আদর্শ দিয়ে সকলকে যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা সঙ্গত নয়। কারণ মানুষের মন যেমন বিচিত্র ও বিভিন্ন, তাদের আদর্শও ঠিক সেইরূপই হয়ে থাকে।

হে বাঙলার মুসলমান, তোমাদের লক্ষ্য স্থির হ'ক, তোমাদের আদর্শ মহান হ'ক। তোমরা সেই মহান আদর্শ বুকে করে স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও। পথভ্রান্ত তোমরা হবে না। তোমাদের সাহিত্য তোমাদের হাতেই নবরূপে উজ্জ্বল হয়ে গড়ে উঠবে।”

আবদুল মজিদের এই প্রবন্ধ একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, বাংলা ভাষা হিন্দু মুসলমান উভয়ের ভাষা। বাঙালী মুসলমানকে তার ভাষামূল থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলবেনা। বাঙালী মুসলমানকেই সৃষ্টিপ্রবাহের দ্বারা বাংলা ভাষায় আপন স্থান করে নিতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে মুসলিম ঐতিহ্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গীভূত করে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আবদুল মজিদ বঙ্কিমচন্দ্র ও নজরুল ইসলাম সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা-ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোহাম্মদ আবদুল হাকীম, বিক্রমপুরী রচিত “বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান মহিলা” (৪:৩, ভাদ্র ১৩৩৩) কয়েকজন ‘বিদূষী মহিলার সাহিত্য কর্মের, উল্লেখসহ “সংক্ষিপ্ত বিবরণ”। মিসেস আর. এস. হোসেন (বেগম রোকেয়া), ‘রত্নাধার’ রচয়িতা আফজালুনুসা, সতীর পতিভক্তি রচয়িতা খায়রুনুসা খাতুন, ‘স্বর্গের জ্যোতি’ রচয়িতা সারা তৈফুর, কবি সাজেদা খাতুন (“বোধ হয় বাঙ্গলার মুসলিম লেখিকাদের মধ্যে ইনিই একমাত্র মহিলা কবি”), মিসেস এম. রহমান, সোদামিনী বেগম, কাসেমা খাতুন, দৌলতপুরের রিজিয়া খাতুন ও তাঁর ভগ্নী রহিমা খাতুন (উভয়ে উচ্চ প্রশংসিত অংকনশিল্পী ও প্রাবন্ধিক), চট্টগ্রামের শামসুন নাহার (মাহমুদ) ও ঔপন্যাসিক নুরুন্নেসা খাতুন—মোহাম্মদ আবদুল হাকীমের আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছেন।

সৈয়দ এমদাদ আলীর প্রবন্ধ “খান বাহাদুর কাজি ইমদাদুল হক” (৪:৩ ভাদ্র ১৩৩৩ ও ৪:৪ আশ্বিন ১৩৩৩) পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ, ইমদাদুল হকের পরলোক গমন উপলক্ষে রচিত। প্রবন্ধে ইমদাদুল হকের ব্যক্তিজীবনের নানা প্রসঙ্গ আছে। নিজের প্রসঙ্গে ও তখন লুপ্ত ‘নবনূর’ পত্রিকা সম্পর্কেও প্রাবন্ধিক কিছু মন্তব্য করেছেন।

আনওয়ার হোসেনের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং মোসলমান” (৪:৮, মাঘ ১৩৩৩) ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের কিছু মন্তব্যের প্রতিবাদ। ডক্টর সেন মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের দুরবস্থা বর্ণনা করে যে মন্তব্য করেছেন তার ঐতিহাসিক কার্যকারণ অনুসন্ধান আবশ্যিক বলে প্রবন্ধকার মন্তব্য করেছেন।

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের “কাব্য সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান” (৪:৩, ভাদ্র ১৩৩৩, ৪:৫ কা্তিক ১৩৩৩, ৪:৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ৪:৭ পৌষ ১৩৩৩, ৪:১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪) শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে বাংলা কবিতার পটভূমিতে মুসলমান কবিদের অবদান পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বৈষ্ণব পদাবলীতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের অবদান পর্যালোচনা করে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, “চণ্ডীদাসের মত প্রেমোন্মত্ত কবি এযাবৎ পৃথিবীতে কখনো জন্মগ্রহণ করেন নাই।”

আলাওলের কাব্যে প্রেম অপেক্ষা 'যৌন প্রেমের' প্রাবল্য লক্ষ্য করেছেন প্রবন্ধকার। তাঁর মতে, পরবর্তী 'বস্তুতাত্ত্বিক কবি' ভারতচন্দ্রই আলাওলের 'সর্বশ্রেষ্ঠ তুলনাস্থল'। "কালের পরিমাপে ইহাদের রচনা আদর্শের দিক দিয়া অতি নিম্নস্থান পাইলেও তাঁহাদের যুগে তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। আদর্শ ছাড়িয়া দিয়া শুধু কবিত্ব ও রসের দিক দিয়া বিচার করিলে তাহাদের সমকক্ষ কবি বাঙলা সাহিত্যে খুব বেশী আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়না।"

প্রবন্ধকার পুঁথি সাহিত্যের গুরুত্ব স্বীকার করেও বলেছেন, "কাব্যাদর্শ হিসাবে পুঁথি সাহিত্যের যুগ মুসলমান বাঙালা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ।"

ইংরেজ আমলে 'যুগপুরুষ মধুসূদনের কাব্যাদর্শ গ্রহণ' করে হিন্দু মুসলমান কবিসমাজে নতুন কবিতার প্রবর্তন হয়। এই সূত্রে প্রবন্ধকার মুসলমান কবিদের মধ্যে কায়কোবাদকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য প্রবন্ধকারের মতে, কায়কোবাদ মধুসূদন অপেক্ষা মধুসূদন 'শিষ্য' নবীনচন্দ্র সেনের 'অনুসারী'।

প্রবন্ধকারের বর্ণনানুযায়ী "মাইকেলী যুগের পর কাব্য সাহিত্য যে যুগ আসিল তাহা রবীন্দ্রনাথের যুগ"। তাঁর ভাষায়, "মাইকেল ভাবুক কবি, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কবি।"

প্রবন্ধকার 'রবীন্দ্রানুকারী কবিসমাজের' মুসলমান সদস্যরূপে শাহাদাৎ হোসেন ও গোলাম মোস্তফার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে "মাইকেলীযুগে যেমন কায়কোবাদ স্বভাবকবি রবীন্দ্রযুগে তেমনি শাহাদাৎ হোসেন একমাত্র স্বভাব কবি।" শাহাদাৎ হোসেনের 'পৌরুষ ব্যঞ্জক' ভাষাকে অবশ্য তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করেছেন। প্রবন্ধকারের বিবেচনায় গোলাম মোস্তফা 'রবীন্দ্রনাথের ভক্ত এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুসারী কবি'। এই কবির মধ্যে প্রবন্ধকার 'সাধনা ও অধ্যবসায়ের পরিচয়' পেয়েছেন কিন্তু কোন 'অসাধারণত্ব' দেখেননি।

সে সময় সদ্যাগত জসীমউদ্দীন প্রসঙ্গে প্রবন্ধকারের মন্তব্য: "ইহার সৌন্দর্য্যগ্রাহিতা বালকের ন্যায়" এই কবির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ (প্রায় অর্ধেক) কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভার পরিচয়। নজরুলের সৌন্দর্য্যচেতনা, নিপীড়িত মানবতার স্বপক্ষে তাঁর উচ্চারণ, তাঁর ইসলামী ভাব ও প্রকাশ ভঙ্গি, এবং সর্বোপরি বেদনার কবিরূপে তাঁর যে বিশিষ্ট পরিচয় তাই আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর আলোচনায় তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। নজরুল সম্পর্কিত আলোচনা প্রবন্ধটির অর্ধাংশ জুড়ে আছে বলে এর পূর্বাংশকে নজরুল আলোচনার ভূমিকা বলে মনে হয়।

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের "কথা সাহিত্যে ত্রয়ী" (৫:১, আষাঢ় ১৩৩৪) বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর "সাহিত্য প্রসঙ্গ" (৫:৫, কার্তিক ১৩৩৪) "কাব্য ও সাহিত্যের আদর্শ" বিষয়ক আলোচনা, দুই বন্ধুর সংলাপ আকারে লেখা। শেষাংশ আদর্শ-প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

১ম।—সাহিত্যের আদর্শ সত্য ও সুন্দর, তারই সাধনা-রত হয়ে মানুষের কল্পনা লীলা ভাষাময়ী হয়ে কাব্য ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে। সমাজ ও ধর্মের গণ্ডী একে এই লীলাকে ক্ষুণ্ণ করলে তার অঙ্গহানি ঘটে।

২য়।—তোমার কথার মানে বোধ হয় এই যে, সকল সত্য ও সৌন্দর্যের আধার যে চরম-পরম আল্লা, তাঁর সন্ধানে কল্পনার রথে বিশ্বেশ্বর অতীতে—কিন্তু বিশ্বেশ্বরই তিতর দিয়ে মানুষের আত্মার যে প্রয়াণ, সাহিত্য তারই ভাষাময় রূপ? তাই যদি হয়, তাহলে সমাজ ও ধর্মের আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শের বিরোধটা কোথায়? আমি ত সোজা বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, দুইটা আদর্শের মধ্যে বিরোধ থাকলেই একটা অপরটাকে ক্ষুণ্ণ কর্তে পারে; আর বিরোধ যদি না থাকে, তবে ত সে কথা বলা চলে না।

১ম।—কিন্তু দেখ, তুমি বড় একটা ভুল করছ। প্রচলিত সমাজ ও ধর্মবিশ্বাসগুলির মধ্যে বিরোধ এত বেশী যে সাহিত্যিক যদি সেইগুলিকেই সম্বল করে চলেন, তাহলে তাঁকে নিতান্তই কুপার পাত্র বলতে হয়।

২য়।—কিন্তু তিনু ধর্ম ও সমাজের মধ্যে নানারকম বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তাদের তিতর কতকগুলি বিষয়ে আবার চমৎকার মিলও আছে। তা'ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধিনিষেধগুলির মধ্যে কিছু কিছু পরস্পর-বিরোধিতা থাকলেও সেগুলির মূলমন্ত্র এক ও অভিনু এবং সে মূলমন্ত্র হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দকে একটা শৃঙ্খলা ও সংযমের তিতর দিয়ে সমষ্টিগত মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রিত করা। সাহিত্যিকেরা যদি এ মূলমন্ত্রটা ভুলে যান, তা'হলে তাদের সৃষ্ট সাহিত্য মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না।

১ম।—তবে কি তুমি বলতে চাও যে সমাজ ও ধর্মবিহিত আইন-কানুনই মানুষের আত্মবিকাশের শেষ কথা? তার ওপরে কি আর কোন মত বা পথ নাই?

২য়।—আছে কি না, সে একটা স্বতন্ত্র তর্কের বিষয়। ধরে নেওয়া যায় যে আছে, তা হলেও সাহিত্যিকেরা কি কোন না কোন বাঁধাধরার মধ্যে থাকবে না? যদি প্রচলিত সমাজ ও ধর্মবিধানগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সাহিত্যিকের সন্দেহ হয়, তা'হলে অন্য যে পথ-কে তিনি সত্য মনে করেন, তা লোককে জানাবার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মনে রেখো, তিনিও যেটা দেখাতে চাইবেন, সেটাও পথ—নগ্ন স্বাধীনতা নয়।

১ম।—তবে কি তুমি বলতে চাও যে, সাহিত্যিকের সৌন্দর্য্যচর্চা তার চারিদিকে আঁকা গণ্ডির তিতরে ঘুরে মরবে, মানুষকে একটা সুন্দরতর একটা মর্ত্যের জীবনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া কি সাহিত্যিকের কাজ নয়? বিশ্বেশ্বর এই বাইরের সৌন্দর্য্যের পিছনে তার যে নিত্য-সত্য আত্মা বিরাজ কচ্ছে, তার সন্ধান মানুষকে দেওয়া কি তার কর্তব্য নয়?

২য়।—নিশ্চয়ই কর্তব্য। সাহিত্যিকের এই কর্তব্য ও দায়িত্ব অস্বীকার করবার কোন কারণ আমি দেখি না। কিন্তু আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ-তর বৃত্তিগুলি—মানুষের সহজ animal nature (প্রাণীবৃত্তি) কে একটা লাগাম পরিয়ে রাখা যার কাজ—তাহাদের দাবীকে যেন সাহিত্যিক একেবারে পরিত্যাগ না করেন। আমার বিশ্বাস যদি আমার এই কথাটি গ্রহণীয় হয়, তা'হলে সমাজ ও ধর্মের আদর্শকে একেবারে পদদলিত করবার কোনো কারণ তুমি দেখবে না।

প্রথম বন্ধুটি দ্বিতীয় বন্ধুর পিঠে একটি চাপড় মারিয়া বলিলেন—থাক্ থাক্ আজ এই পর্য্যন্ত। তোমার মত নীতিবাতিক গ্রন্থের সঙ্গে তর্ক করাই বিড়ম্বনা। এখন উঠি রাত অনেক হয়েছে।”

এস. এম. জহুরউদ্দীনের “বিদ্রোহী-কবির প্রেমের দিক” (৫:৯, ফাল্গুন ১৩৩৪) নজরুলের প্রেমের কবিতার আবেগময় আলোচনা। উপসংহারে প্রবন্ধকার লিখেছেন:

“শেষে বলিব, কবি নূতন ছন্দে যে গজল-গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা মৌলিক ও প্রেমমূলক। ইহার সকল রূপ একান্ত করিয়া দেখিবার সুযোগ এখানে হইবে না; তবে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ব্যাথা বেদনা নিঙুড়াইয়া প্রেমের যে এক নূতন তথ্য ও ভাষা কবি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত জগৎ চোখের পানিতে কবির ‘বিদ্রোহী’ নাম মুছিয়া ফেলিয়া প্রেম দেবতার বরপুত্র হিসাবে তাঁহার কোন নূতন নাম দিতে দ্বিধাবোধ করিবে না।”

অমলেন্দু দাশগুপ্ত “বুলবুলের কবি” (৬:৬, পৌষ ১৩৩৫) শীর্ষক আলোচনায় নজরুলের গীতিপ্রাণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, শ্রেষ্ঠ কবিতা বেদনা উদ্ভিত। এই প্রসঙ্গেই তিনি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের তুলনা করেছেন:

“রবীন্দ্রনাথের ব্যাথায় উদাসীন বৈরাগীর নিলিপ্ত নিবিকার শাস্তির আভাষ আছে; কিন্তু নজরুলের ব্যাথায় মৃত্যুশীল মানুষের হারাইবার বেদনা, পাইয়া না রাখিতে পারার জ্বালা আছে। ব্যাথা সে পাইয়াছে—ইহাই তাহার কাছে সত্য—তাই ধরণীর গাত্রে আর কোন সাস্থনার মিথ্যা আবরণ সে পরায় নাই।”

নজরুল ইসলাম সম্পর্কে অমলেন্দু দাশগুপ্তের মন্তব্য: “একাধারে এমন লাক্ষিত ও সমাদৃত, নজরুলের মত আধুনিক কবিদের মধ্যে অল্পই হইয়াছে। কবির কণ্ঠে কুসুমের মালার, পরিবর্তে নজরুলের ভাগ্য দোষে তাহা কণ্টকেই ভরিয়া আছে, এই কণ্টকমালার প্রতি কণ্টকমুখে যে জ্বালা বিচ্ছুরিত হয়, তাহার দাহে হয় মানুষ মরে নয় গরলপায়ী নীলকণ্ঠের মতই অমর হয়।”

“সাহিত্য ও যুগধর্ম” প্রবন্ধে (৪:৪, আশ্বিন ১৩৩৩) আবুল মনসুর আহমদের মূল বক্তব্য: মুসলিম রচিত সাহিত্যই বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। কেননা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের রচনা পরকীয়া প্রেম বিষয়ক; বিশেষতঃ শরৎচন্দ্র বেশ্যাকে মহীয়সী করেছেন কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেছেন ‘সবল’ সাহিত্য। প্রবন্ধকারের ভাষায়:

“হিন্দুরা বাঙালা সাহিত্যকে কবিত্ব দিয়াছে, আইন দিতে পারে নাই, সৌন্দর্য্য দিয়াছে, পৌরুষ দিতে পারে নাই। কারণ হিন্দু কবির জাতি। কিন্তু নিভাঁজ কবিত্ব দিয়া জাতির উদ্ধার হয় না। সুতরাং বাঙালা সাহিত্যকে পৌরুষ দান করিতে হইবে। তওহীদ-বাদী মোসলমানই সাহিত্যে এই কঠোর পৌরুষের প্রবর্তন করিতে পারে।

মোসলমান অধিক দিন বাঙালা সাহিত্যে নামে নাই। কিন্তু এই অল্পদিনেই নজরুল ইসলাম দেখা দিয়াছে। বাঙালার গীতি-কাব্য যখন সুরা, সুন্দরী ও স্বর্গ লইয়া মাতো-য়ারা হইতে হইতে অবসাদে মৃতকল্প হইয়া গিয়াছিল, যখন ওদিকে অগ্রসর হইবার আর কোনও পথই ছিল না, যখন কবি-প্রিয়র ধ্যানে নিতান্ত অকবিরিও অবসন্ন নিভ্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই সময় নজরুল ইসলাম তাঁর কাড়া-নাকাড়া বাজাইতে

বাজাইতে বাঙালীর হৃদয় দুয়ারে উপস্থিত হইয়া তাকে এমন সবল ঝাঁকুনী দিয়াছে যে, তার প্রেমের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। বাঙলা গীতি-কাব্যের নূতন তোরণ-দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। আমার মনে হয়, এমনি করিয়া কথা-সাহিত্যের দিক দিয়াও মোসলমান এমন এক নূতন দিক খুলিয়া দিবে, যাতে করিয়া বাঙালী অতি সহজেই শরৎ সাহিত্যের তীব্র মদিরার প্রভাব কাটাইয়া উঠিবে। খোদা করুন, তেমন দিন নিটকবর্তী হউক।”

‘মুসলিম’ শব্দ বর্জনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতির সমালোচনা করেন ‘বসুমতী’ (১১ ভাদ্র ১৩৩১)। ‘বসুমতী’কে সমর্থন করে সেই সূত্রে বাংলা ভাষায় ইসলামী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দের উপস্থিতির বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী তাঁর “বঙ্গভাষা ও মুসলমানী শব্দ” প্রবন্ধে (৪:৭, পৃষ্ঠা ১৩৩৩)।

একদিকে সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান বিরোধ অন্যদিকে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে একশ্রেণী বাংলা ভাষাকে হিন্দু বাংলা আখ্যা দিয়ে ‘মাতৃ’ভাষারূপে উর্দুগ্রহণের চক্রান্তে লিপ্ত—এই পটভূমিতে হিন্দু লেখকেরা বাংলা ভাষা থেকে ইসলামী শব্দ বর্জনের প্রয়াস চালালে তা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই স্বার্থ-বিরোধী হবে। লেখক মূলতঃ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকামী। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন :

“...বাঙ্গালাদেশের যুগলসন্তান হিন্দু-মুসলমানের বাঙ্কিত মিলন ও সম্প্রীতি সুদূরপর্যন্ত হইয়া পড়িতেছে, পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেছে, তাহার অন্যতম কারণ এই মুসলমান বিদ্বেষদুষ্ট হলাহলপূর্ণ বাঙ্কলা সাহিত্য। আপনারা তীব্র সমালোচনা ও অন্যবিধ উপায়ে ইহার প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর না হইলে, আপনাদের সকল প্রচেষ্টা, সকল সাধনা, সকল আদর্শ ও সকল সিদ্ধি ব্যর্থতার অভিশাপে মুষ্টিয়া পড়িবে। সম্ভব হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তত্ত্বাবধানে কিম্বা স্বাধীনভাবে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ শ্রেণীর সাহিত্য হইতে হিন্দু-মুসলমানের আপত্তিজনক সকল জঞ্জালরাশি অপসারিত করুন।

আমাদিগকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, হিংসা-বিদ্বেষ, অনুদারতা ও দুর্নীতির ভিতর দিয়া নয়, পরস্পর সাহিত্যের পবিত্র ও সনাতন পথ ধরিয়াই আমাদিগকে লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হইতে হইবে; কারণ সংকীর্ণতা ও দুর্নীতি যে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি, তাহা কদাপি মানবজাতির কল্যাণপ্রসূ হইতে পারে না। আমাদিগকে অধুনা যুগধর্মের অনুসরণ করিয়া এমন সাহিত্য রচনা করিতে হইবে, যাহা হিন্দু-মুসলমানকে—সাম্য-মৈত্রী ও একতার অচেছদ স্বর্ণডোরে বাঁধিয়া দিবে, এবং উভয় ভ্রাতার মনে স্বদেশপ্রেম, অখণ্ড জাতীয়তা, বিশ্বহিতৈষ্য ও মহামানবতার উদ্রেক করিতে, সর্বতোমুখী বীর ধর্মে (chivalry) উদ্বোধিত করিবে। আমাদের আজিকার সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান যুগের বাঙ্কলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক। তিনি ও অন্যান্য শক্তিদ্বার লেখকগণ ইচ্ছা করিলে বাঙালীকে এমন অবদান দিয়া যাইতে পারেন, যাহা যুগযুগান্তেও হিন্দু-মুসলমান একই ভাবে জাতীয় সম্পদ রূপে বক্ষে ধারণ করিবে। যুগধর্মের কথা ও পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিলে প্রাণের কোন্ এক গোপন পুর হইতে এ বাণী অবিরাম ধ্বনিত হইয়া উঠে, ‘আসিবে সেদিন আসিবে।’

হে সমাগত মনীষীবৃন্দ, হে বঙ্গীয় সাহিত্য-কাননের মধুশ্রাবী গায়কগণ, হে সত্য ও স্নহের সেবকগণ, আজ আপনাদিগকে সম্মুখে পাইয়া প্রাণ খুলিয়া বঙ্গ সাহিত্যের যে

অশুভ দিকটার আভাষ প্রদান করিলাম, সেদিকে আপনারা আঙুল দৃষ্টিপাত করুন, ইহাই আমার আকুল নিবেদন।

উপসংহারে আর একটি কথা বলিয়াই আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। একেই ত একশ্রেণীর অদূরদর্শী মুসলমান আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকে ভাষা, ধর্মালোচনা, জাতীয়তা, ইতিহাস, পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক আচার-পদ্ধতির দিক হইতে সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী ভাবের দ্যোতক, ও মুসলিম-বিদ্বেষ-বিজুড়িত স্বতরাং মুসলমানের অপার্থ্য ও অসেব্য মনে করিয়া উর্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষারূপে পরিণত করিবার অস্বাভাবিক চেষ্টায় আদাজল খাইয়া লাগিয়াছে, তদুপরি হিন্দু ভ্রাতৃগণও যদি বর্জজননীতি ও রক্ষণ-শীলতার অনুসরণ করেন, তবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ত বিস্তর ক্ষতি হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মধ্য দিয়া পরাধীনতার লৌহনিগড়ে আবদ্ধ মুক্তিপ্রয়াসী হিন্দু-মুসলমানের যে বাঙ্কনীয় মিলন-মন্দির গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখা যাইতেছিল, তাহা অচিরেই ভাঙিয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম উভয় জাতির সমবেত সেবা ও সাধনার ফলে সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে মিলন-সৌধ রচিত হইবে, তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় প্রাণশক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, উভয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ উহার গাত্রে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইলে—সর্বোপরি মুক্তি ও কল্যাণের আবেহায়াতে অভিষিক্ত হইতে হইলে, চাই প্রীতি, চাই উদার মনোভাব, চাই একতা, সমপ্রাণতা, চাই সমদর্শিতা, সহানুভূতি, আর চাই হিংসা-দ্বেষ শূন্য পবিত্র মন ও মহান আদর্শ। তবেই আমাদের সাহিত্য সাধনা সফল হইবে, স্বরাজ্য কামনা পূর্ণ হইবে—আর ধনে, জনে, জ্ঞানবিজ্ঞানে, ঐশ্বর্য্য-গরিমায়, সুখশান্তি ও স্বাস্থ্য সম্পদে অভাগিনী বঙ্গভূমি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।— ”

পরিণামে হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য বাঙালী মুসলমানের স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়োজন, এ কথাই “সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য কেন?” (৬:৫, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫) প্রবন্ধে বলেছেন—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত হল :

“অল্পদিন হইল মুসলমান শিক্ষকদের দৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, বাঙ্গলা আমাদের মাতৃভাষা এবং এই মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যথোচিত সেবা ব্যতীত আমাদের সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা-ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে নূতন করিয়া পদার্পণ করিয়াই মুসলমানেরা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য-সমিতি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং একটা মোসলেম বাঙ্গলা সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হইয়াছেন।

হিন্দুরা প্রশ্ন করেন, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের ন্যায় সাহিত্য সেবাক্ষেত্রেও মুসলমানদের এই স্বাতন্ত্র্য কেন? অনেকে বলেন, মুসলমানদের স্বভাবই এইরূপ; হিন্দুদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের কোন কালেই নাই; তাঁহাদের একটা ‘ভিনুগোষ্ঠ’ হওয়াই চাই। সর্ববিষয়েই তাঁহারা ভারি অমিশুক; ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

হিন্দু ভ্রাতাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাদের সন্দেহ অপনোদনের চেষ্টা করা বোধ হয় নিতান্ত ‘বাজে কাজ’ নহে। এই বিশ্বাসে আমরা এ-বিষয় দুই চারিটি কথা বলিতেছি।

প্রথমেই বলা উচিত যে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের ন্যায় মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবাব্যাপারেও যদি মুসলমানদিগকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে না হইত, যদি হিন্দুদের সাহিত্য

পরিষদের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গিয়া সাহিত্যসেবার পথে অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ও সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের অপেক্ষা কেহ অধিক স্মৃখী হইতেন না।

যে-সকল কারণে মুসলমানেরা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে হিন্দুদের সহিত সম্পূর্ণ মিলিতভাবে কার্য্য করেন নাই বা করিতে পারেন নাই, তাহা যতই গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হোক না কেন, তাহার ফলে যে অর্থও দেশের কল্যাণ কিঞ্চিৎ পিছাইয়া গিয়াছে এবং 'তৃতীয় পক্ষের' বিস্তার সুবিধা হইয়াছে, তাহা অন্ততঃ আমরা ন্যাশনালিষ্ট মুসলমানেরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বাভাব্য অবলম্বনের ফলে কোন পক্ষের প্রত্যক্ষভাবে এইরূপ কোন সুবিধা ঘটুক বা না ঘটুক ইহাতে যে হিন্দু-মোসলেম উভয় সম্প্রদায়ের অবাধ আশু মিলন ও তৎপ্রসূত দেশমঙ্গলের পথ আপাততঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি মুসলমানেরা বর্তমান সময় সাহিত্যক্ষেত্রে কতকটা স্বাভাব্য রক্ষার পক্ষপাতী কেন—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কিঞ্চিৎ 'গোড়ার কথা' বলিয়া লইতে হইবে।

সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্য কি?—'নির্জলা' আর্ট-ভক্তদের মতামত যাহাই হোক না কেন, যাহারা আর্টের উদ্দেশ্যহীনতা মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ তাঁহারা বলিবেন যে, সমাজকে বর্তমান অপেক্ষা একটা বিরাটতর, উচ্চতর, মহত্তর, সুন্দরতর ভবিষ্যতের দিকে গতিশীল করিয়া দেওয়াই প্রকৃত সাহিত্য-সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু সে ভবিষ্যতের স্বরূপ কি? সাহিত্য-শিল্পীদের নির্মিতব্য সে ভবিষ্যৎ সৌধের ভিত্তি কি? এক কথায়, তাহার ভিত্তি হইতেছে জাতীয় বিশিষ্ট সভ্যতার সর্বজনীন উপকরণগুলি। ফলকথা, যে-সমাজের জন্য সাহিত্য সৃষ্ট হইবে, তাহার নিজস্ব জ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা ও কর্ম-সাধনার বিশুরূপকে সাহিত্যিক তাঁহারা নিপুণ তুলিকার সাহায্যে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়া একটা মোহন সুন্দর আদর্শরূপে তাহার সম্মুখে ধরিবেন, ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। যুগ-ধর্মের প্ররোচনায় এবং অন্য সমাজ ও সভ্যতার সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে, কোন বিশিষ্ট সমাজের পক্ষে নব নব রূপও রস গ্রহণ করা যতই বাঞ্ছনীয় হোক না কেন, তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে সে কোনমতেই বিসর্জন দিতে পারে না; দিলে তাহাকে আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যিনি যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ কোন সমাজ অন্যের দ্বারা পরাজিত ও পরিপ্লাবিত হওয়ার পূর্বে স্বেচ্ছায় এ পাপে কখনও লিপ্ত হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। সুতরাং মুসলমান সমাজও যে অনুরূপ মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

বর্তমানে বাঙ্গলার মুসলমান সমাজকে দুইটা বিরাট, বিসদৃশ সভ্যতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রথম ইউরোপীয় সভ্যতা; দ্বিতীয়, ভারতের হিন্দু সভ্যতা। ইউরোপীয় সভ্যতার কয়েকটা বহিরঙ্গের সহিত ইসলামী সভ্যতার গুরুতর বিরোধ থাকিলেও অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, যে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার ফলে ইউরোপ আজ বিশ্বজয়ী হইয়াছে, আরব বা ইসলামী সভ্যতাই সে বিষয়ে তাহার শিক্ষাগুরু। একথা ছাড়িয়া দিলেও, বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবাক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত আমাদের তেমন প্রত্যক্ষ ও নিকট সংঘর্ষ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে হিন্দু-সভ্যতার সহিত ইসলামী সভ্যতার বিন্দুমাত্রও মিল বা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুসভ্যতার ভিত্তি হইতেছে, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ; অন্ততঃ বহু যুগ পূর্বে হইতে এই বিশিষ্ট রূপেই হিন্দু সভ্যতা আমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে। ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ-সাধনপূর্বক এক অদ্বিতীয় নিরাকার, সর্বগুণাকর, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপাসনা জগতে

সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই ইসলামের উদ্ভব। ইসলাম জাতিভেদ স্বীকার করে না। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভ্রাতা, বরং সকল মানুষই এক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত—ইহাই কোর-আনের অভিমত। এহেন দুইটী পক্ষ-বিরোধী সভ্যতার মধ্যে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সাংসারিক জীবনকর্মের সংঘর্ষ হইতেছে। সাহিত্য-সেবাক্ষেত্রেও এই সংঘর্ষ অবশ্য-ভাবী, এজন্য মুসলমানকে আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। নয়তো তাহার সর্বনাশ হইবে।

ইহা কাহারও অবিদিত নহে যে, হিন্দু-সেবিত বাঙ্গলা সাহিত্য হিন্দু সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়াই দণ্ডায়মান। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, পুনর্জন্মবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার রক্তমাংসে, অস্থিমজ্জায় বিজড়িত রহিয়াছে। মুসলমানকে নিজের সঙ্গী, সহচর ও দোসর রূপে পাইবার আশায় হিন্দু কখনও বাঙ্গলা সাহিত্যের অঙ্গ হইতে তাঁহার নিজস্ব সভ্যতার এই ছাপগুলি তুলিয়া লইতে রাজী হইবেন না। পক্ষান্তরে মুসলমানও নিজের সর্বজনীন বিশিষ্টতাগুলি বিসর্জন দিয়া হিন্দু-সেবিত বাঙ্গলা সাহিত্যকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না কিংবা হিন্দুর অঙ্গ অনুকরণ দ্বারা নিজের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতে সম্মত হইবেন না।

সত্য গোপন করিয়া লাভ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দুরা শ্রদ্ধা করেন, মুসলমানেরাও করেন। কারণ তিনি স্বদেশমন্ত্রের পুরোহিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কি দিয়া গিয়াছেন? তিনি যে-স্বদেশিকতার আদর্শ দান করিয়া গিয়াছেন, মোসলেম বিশেষকেই তাহার ভিত্তি করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ সঙ্গীত—‘বন্দে মাতরম’ গান পৌত্তলিকতার ভাবে পরিপূর্ণ, তাহা কোন অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী নিজের ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। তথাপি হিন্দুরা এই সঙ্গীতটিকেই হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যাহারা অগ্নিমন্ত্রের সাধন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঘোর পৌত্তলিকতার মধ্য দিয়া, মোসলেমহীন বাঙ্গলা বা ভারতের কল্পনা করিয়া, নিজেদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। হিন্দু-সেবিত সাহিত্যের প্রভাব এইভাবে জাতীয় মনের উপর কার্য করিয়াছে ও করিতেছে। ইহাকে মুসলমানেরা যুগপৎ ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক।

অবশ্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে এজন্য দোষী করিতেছি না। তিনি নিজে এবং তাঁহার ব্যক্তিগত অসামান্য প্রতিভা হিন্দু সমাজ ও সভ্যতার অঙ্গ মাত্র। যে ভাবে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে এবং সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্যভাবে তাহার বিকাশ বা প্রকাশের উপায় ছিল না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অসামান্য হইলেও তাহা সর্বজনীনতার স্রুচ্য গ্রামে আরোহণ করিতে পারে নাই।

কিন্তু শুধু বঙ্কিমচন্দ্রকে সমালোচনা করিয়া লাভ নাই। প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু-সেবিত বঙ্গ-সাহিত্য হিন্দুসভ্যতা হইতে রূপরস সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে। পৌত্তলিক হিন্দুসভ্যতাকে ভিত্তি করিয়া, পৌত্তলিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য হইতে জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিয়া পৌত্তলিক হিন্দুমনের ছাপ সর্বক্ষেত্রে ভিতরে বাহিরে ধারণ করিয়া এই সাহিত্য বিরাজমান। মোসলেমসভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে ইহা একান্তই মারাত্মক। মুসলমান ইহা বুঝিতে না পারিয়া একবার সর্বনাশের পথে উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব কবিদের কোমলমধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া, তাঁদের সুললিত পদাবলীর রূপরসে মজিয়া, মুসলমান একবার নিজেকে হারাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব কবিতার সহজ সরল সৌন্দর্য্যে কিছুকাল সন্মেলিত থাকিবার পর মুসলমান বুঝিতে পারিয়াছিল যে যাহাকে

সে স্খুধা মনে করিয়া পান করিতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে তরল গরল ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন প্রাচীন বাঙ্গলা বর্জ্জন পূর্বক তাহার স্থান দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত আমদানী করিলেন, তখন মুসলমানদের চৈতন্য আরও অধিক পরিমাণে ফিরিয়া আসিল। শব্দ ও ধাতুর বিভক্তিয়ুক্ত সংস্কৃত রূপগুলি বাদ দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পুরাপুরি সংস্কৃত ভাষাটাকেই বাঙ্গলা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেন; মুসলমানেরা তাহাতে যোগদান করিতে পারিলেন না। প্রাচীন বাঙ্গলার সহজ সরল রূপের সহিতই তাঁহাদের পরিচয় ছিল; হিন্দু রাজকন্যা সংস্কৃতের চেহারা দেখিয়া তাঁহারা একেবারে খতমত খাইয়া গেলেন। এই অবস্থা মোসলেম চিন্তে অতি শুভ প্রতিক্রিয়া করিল। তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জাগ্রতভাবে নিজের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যের বিষক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা পূর্ব হইতেই বাঙ্গলায় মুসলমানদের ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দ বহুলভাবে আমদানী করিয়া একটা ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় ব্রতী হইয়া ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত-প্রিয়তার ফলে তাঁহাদের এই চেষ্টা ক্রমতঃ হইয়া উঠিল। বাঙ্গলার মুসলমান, হিন্দুসভ্যতার সহিত সংঘর্ষে আসিয়া যতটুকু আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে, এই শুভপ্রচেষ্টার ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছে।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি প্রতিভাশালী সাহিত্যিক ও কবিগণ আবির্ভূত হইয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহাও স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সভ্যতার দ্বারা অন্তরে বাহিরে অনুরঞ্জিত হইল। মুসলমানেরা ইহা হইতে কিছু দিন দূরে রহিলেন। কিন্তু সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শিক্ষিতেরা ক্রমশঃ এই সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন; পুরাতন ‘মুসলমানী’ বাঙ্গলা লিখিত কেতাব-পুঁথি আর তাঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরীয় বাঙ্গলাই শিক্ষণীয় বাঙ্গলা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। যাহাহোক, একদল দূরদর্শী মুসলমান এই অবস্থা সমাজের বৈশিষ্ট্যরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহারা পুরাতন বাঙ্গলা ছাড়িয়া দিয়া তথাকথিত ‘সাধু’ বাঙ্গলায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সকল ভ্রমলোকের মধ্যে মরহুম মুন্সী মেহেরুল্লাহ, মরহুম নীর মশাররফ হোসেন, মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মুন্সী শেখ আবদুর রহিম প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও দুই একজনের উপর হিন্দু সাহিত্যের প্রভাব কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, শুধু ‘বিষাদসিন্ধু’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির ভাষা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হইতে পারিবে।

তারপর এই বর্তমান যুগের বাঙ্গলা সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী-দিগের চেষ্টায় বাঙ্গলা ভাষা পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরল হইয়া আসিয়াছে। এজন্য এবং অন্যান্য কারণে শিক্ষিত মুসলমানেরা এখন বাঙ্গলার দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চা করিতে আসিয়াই তাঁহারা একটা অনাক্ষীর্ণ সঙ্কীর্ণ সভ্যতার বিষবাহেপ রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পরিয়াছেন। তাই পূর্বযুগের সদ্গুণ অনুসরণ করিয়া তাঁহারা আবার আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা চিন্তা-সাধনা, ভাব-প্রেরণা আনয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গলার মুসলমানদের নিজস্ব সভ্যতা ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইহা ব্যতীত তাঁহাদের গতাস্তর নাই।

কিন্তু হিন্দুদের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া মিশিয়া এ কার্য সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত একযোগে কার্য করিতে গেলে মুসলমানের আত্মা ক্ষুণ্ণ

না হইয়াই পারে না। সেখানকার সভাসমিতির উদ্বোধন কালে বাগ্‌দেবী বীণাপাণির বন্দনা করা হয়, বজ্রতা প্রবন্ধে হিন্দুতাব, হিন্দুরীতি, হিন্দুপদ্ধতির অনুসরণ করা হয়, আবার এ সকলে কেহ আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহা বিনা বিচারে অগ্রাহ্য করা হয়। এমন অবস্থায়, কোন্দল কোলাহলে শক্তিক্ষয় না করিয়া মুসলমানদের স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত।

আর তাছাড়া আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টি যে সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়া হইতেছে, ইহাও বোধ হয় সত্য নহে। বরং প্রকৃত কথা এই যে, সাহিত্য-পরিষদের কর্তারা পুরাতন সংস্কৃতমূলক বাঙ্গলাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া আছেন, কিন্তু আধুনিক বাঙ্গলা ক্রমশঃ সরল সহজ পন্থা ধরিয়া অন্যগতিতে চলিয়াছে। সুতরাং এদিক দিয়াও পরিষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার কোন সার্থকতা নাই।

কিন্তু মুসলমানেরা এত যে বিবাদ বিসম্বাদ এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতেও বিবাদের নিবৃত্তি হইতেছে না। পুরাতনপন্থী পণ্ডিতেরা এখনও মাঝে মাঝে হাঁকিয়া বলিতেছেন, যবন স্পেচেলর সংস্পর্শ হইতে বাঙ্গলার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চল। মুসলমানেরা একরূপ আদেশ নতশিরে মানিয়া চলিতে অক্ষম। পক্ষান্তরে, তাহাদের কণ্ঠস্বর এখনও এত উচ্চ হয় নাই যে, আর একটা পাল্টা আদেশ দিয়া পণ্ডিতদের কেলাহল নিবৃত্ত করিবেন। এজন্য দূরে থাকিয়া নিজেদের কাজ করিয়া যাওয়াই তাঁহারা ভাল মনে করিতেছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের আদি যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের যে তীব্র তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ফলে তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পৌত্তলিক হিন্দুর ইসলামের সহিত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিন্দুর অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া, সম্পূর্ণ কণ্ঠে কণ্ঠে মিশাইয়া সাহিত্য-সেবা করিতে গেলেই তাহাকে বাগ্‌দেবী বীণাপাণির রাতুল চরণে ভক্তিকুসুমাজলি উপহার দিতে হইবে। হিন্দু সভ্যতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নহে—বর্তমান যুগে শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-সাধনা ও তজ্জনিত শক্তি সামর্থ্যে বলীয়ান হওয়ায় হিন্দু মানসিকতার সংক্রামণ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার আওতায় গেলে মুসলমানের স্বরূপ লুপ্ত হওয়া আবশ্যিক। এই কারণে মুসলমানেরা স্বতন্ত্র থাকিয়া বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের বৃদ্ধি তাঁহাদের নিজস্ব সভ্যতার জন্য স্থায়ী আসন রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আমাদের মনে হয়, প্রকৃত দেশ-কল্যাণের দিক দিয়া চিন্তা করিলে ইহাতে হিন্দুদের অসন্তুষ্টির কোন কারণ থাকিবে না। হিন্দু-মুসলমানকে এবং মুসলমান হিন্দুকে বুঝিতে না পারিলে, বুঝিয়া উভয়ের মধ্যে মৈত্রীবিধানের একটা পথ আবিষ্কার করিতে না পারিলে, এদেশের কোন প্রকার স্থায়ী কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে না। উগ্রপন্থী হিন্দু এবং চরমপন্থী মুসলমান মনে করিতে পারেন, এ দুই সম্প্রদায়ের কেহ কাহাকে বুঝিবার প্রয়োজন নাই, একটিকে বিনষ্ট করিয়া অপরটি আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবে অথবা উভয়ে চিরদিন অপরিচিত শত্রুর ন্যায় মারামারিতেই মাতিয়া থাকিবে। কিন্তু আশা করি, কোন ধীরবুদ্ধি হিন্দু বা মুসলমান একরূপ উদ্ভট কল্পনা পোষণ করেন না। তাঁহারা মনে করেন, হিন্দু মুসলমানকে বুঝিবে, তাহার ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-সাধনা, ভাব-দোতানা—এক কথায় তাহার নিজস্ব সভ্যতার বিশিষ্ট রূপের সহিত পরিচয় লাভ করিবে এবং মুসলমানও হিন্দুকে অনুরূপভাবে চিনিয়া লইবে; তবেই উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত উদার ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবে, তবেই উভয় সম্প্রদায় দেশের মঙ্গল সাধনে সমব্রতী হইতে পারিবে। সাহিত্যের ভিতর দিয়াই এই উদ্দেশ্য অসিদ্ধ হওয়া সম্ভব।

কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে যদি মুসলমানেরা নিজস্ব ভাবধারা আমদানী করিতে না পারিল, তাহা হইলে হিন্দুরা তাঁহাদিগকে চিনিবেন, জানিবেন, বুঝিবেন, কি রূপে? বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে হিন্দুকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে; কেননা উহা মূলতঃ ও প্রধানতঃ হিন্দুরই সাহিত্য। মুসলমানকেও অতঃপর বাঙ্গলার মারফতে স্বকীয় স্বরূপ লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিতে হইবে। এজন্য বাঙ্গলায় একটা বিরাট ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। সেই চেষ্টাই মুসলমানেরা করিতেছেন।

আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী কোন কোন হিন্দু ভ্রাতা হয়তো একথায় প্রশ্ন করিবেন, বাঙ্গলায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হইবে, ইহাতে বেশ কথা কিন্তু সেজন্য আলাদা থাকিবার দরকার কি? এ প্রশ্নের উত্তর পূর্বেই দেওয়া ইহা আছে। ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যিক, তাহা সহ্য করিবার মত উদারতা কোন হিন্দুরই নাই, একথা বলিব না, কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু সাহিত্যিক ধুরন্ধরেরই নাই, ইহা বাধ্য হইয়াই বলিতে হইতেছে। যে ভাষা হিন্দু চিন্তার বাহন, তাহা হইলে মুসলমানের সকল চিন্তা, সকল ভাব প্রকাশিত হইতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন হইলে আরবী ও ফারসী শব্দ অবোধে বাঙ্গলা ভাষায় গৃহীত হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিত ইহাতে নিশ্চয়ই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, ঐ সকল ম্লোচ্ছ ভাষার শব্দ বাঙ্গলায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রধানতঃ এই জনাই হিন্দুর সহিত মুসলমানের বনিবনাও হইতেছে না। অবশ্য প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া যথেষ্টভাবে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইলে তাহাতে আপত্তি হওয়া অনায়াস নহে; কিন্তু যেখানে ইসলামী পরিভাষার অর্থ ও সম্ভ্রান্তি রক্ষার জন্য ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, সেখানে কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দু ভ্রাতারা এইটুকুও রাজি নহেন। সুতরাং হিন্দুর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া সাহিত্য-সেবা করিতে হইলে মুসলমানকে ভাবে, চিন্তায় হিন্দু হইয়া থাকিতে হইবে। শুধু ইহাই নহে। শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী একবার এক সাহিত্য-সভায় একজন মুসলমান সাহিত্যিককে আস্কান-পায়জামা ও তুর্কী ফেজ পরিহিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন, মুসলমানেরা এই বৈদেশিক পোষাক পরিত্যাগ করিয়া খাঁটি বাঙ্গালীর পোষাক ধূতি চাদর ব্যবহার করুন। ঐরূপ মনোভাবের সহিত একমত হওয়া মুসলমানদের সাধ্যাতীত। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহারা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় মুসলমান সাহিত্য-সেবীদের মধ্যেও এমন দুই চারিজন লোক আছেন, যাহারা ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াশকে সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের নিজেদের দৃষ্টি এতই সঙ্কীর্ণ অথবা স্বজাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান এতই অল্প যে পরের কুযুক্তিকে তাঁহারা সহজেই পরম সূক্ষ্ম বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, হিন্দুরা মুখে যত বড় বড় কথাই বলুন না কেন, কার্যতঃ তাঁহারা হিন্দু সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্যগঠন করিয়াছেন ও করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া চুনোপুঁটি সাহিত্যিক পর্য্যন্ত কেহই হিন্দুসভ্যতাকে বর্জন করিতে ইচ্ছুক নহেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসভ্যতার জয়-গৌরব ঘোষণার জন্য বৃহত্তর ভারত আবিষ্কারের কল্পনায় অধীর হইয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও সাগর পাড়ি দিতে ক্রটি করিতেছেন না। ইহাতে যদি তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ না পায় তবে মুসলমান বেচারারা তাঁহাদের সভ্যতার ছাপ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গে লাগাইয়া দিতে চাহিলে, তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলা হইবে কেন? পরলোকগত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ভিন্ন অন্য কোন খ্যাতিমান হিন্দু বা ব্রাহ্ম সাহিত্যিক এযাবৎ ইসলামীসভ্যতাকে ভালরূপে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই; কেবল হিন্দুসভ্যতা লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত।

ইহাতে যদি তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ না পাইয়া থাকে, তবে ইসলামী সাহিত্য-সৃষ্টি-প্রয়াসী মুসলমানদিগকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বলা হইবে কোন্ অপরাধে?

একথার উত্তরে হিন্দু সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের প্রতি অতিভক্তিসম্পন্ন তথাকথিত উদারদৃষ্টি মুসলমান সাহিত্যিকেরা হয়ত বলিবেন যে, উহাতে হিন্দুদের দোষ কি? আরবী ফারসীকে বাদ দিয়া শুধু ইংরাজী সাহিত্যের মারফতে প্রকৃত ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। অথচ আরবী-ফারসী বাঙ্গালী হিন্দুরা জানেন না। এই জন্যই তাঁহাদের এ উদাসীনতা। আমরা প্রত্যুত্তরে বলি, বেশ কথা। যে-স্বযোগের অভাবে বাঙ্গালী হিন্দুদের সহিত আমাদের প্রকৃত পরিচয় হইতেছে না, আমরা ইচ্ছা করিলেই যখন তাঁহাদিগকে সে-স্বযোগ করিয়া দিতে পারি, তখন আমরা তাহা করিব না কেন? হিন্দুরা যেমন বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে তাঁহাদের সভ্যতার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইতেছেন; আমরা মুসলমান সাহিত্যকেও তেমনই আরবী-ফারসীর মধ্য হইতে ইসলামী সভ্যতার উপকরণগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে হিন্দুদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। তাহা না করিলে আমাদের কৰ্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং যাহারা বাঙ্গলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা কোন মতেই নিম্নার পাত্র নহেন, বরং সর্বদা প্রশংসা পাইবার অধিকারী।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা আবশ্যিক। আমরা নানা কারণে স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চা ও ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইলেও একটা বিষয়ে আমাদের সাবধান হইতে হইবে। বর্তমান যুগের হিন্দু-সেবিত সাহিত্যের ভাষা ও আমাদের ভাষায় যাহাতে গুরুতর রকমের পার্থক্য না ঘটে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা, এরূপ পার্থক্য ঘটিলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আমরা আবশ্যিক হইলে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতে ক্রটি করিব না; কিন্তু এরূপ শব্দ ব্যবহারে যেন আমাদের অতি লোভ না জন্ম। ইসলামী সাহিত্য-সৃষ্টির নামে একেবারে “আমির হামজা বা ছহি বড় সোনাভান” বা “সূর্য উজ্জ্বল বিবির কেচ্ছা” রচনা করা কোন মতেই সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আমরা জানি, আমাদের মধ্যে যাহারা ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির কথা শুনিলে চটিয়া উঠেন, এইরূপ একটা আশঙ্কা তাঁহাদের মনে বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ আশঙ্কার তেমন কোন কারণ নাই, অবশ্য আমাদের সমাজে দুই এক জন লোক এমন আছেন, যাহারা কোন ব্যক্তিকে ‘দয়ার পাত্র’ মনে না করিয়া ‘কাবেলে রহম’ মনে করিলে ইসলামী ভাব প্রকাশ পাইল বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা নিজেরাই দয়ার পাত্র এবং বড়ই সুখের বিষয়, ইহাদের সংখ্যা, প্রতিপত্তি ও সাহিত্যিক যোগ্যতা নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যে ইসলামী ভাব আমদানি করিতে যতই উৎসুক হই না কেন, এইরূপ উৎকট মনোভাব বর্জন না করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, কেবলা জায়-নামাজ, আন্ন, রসূল, পীর, ওলি, ফরজ, ওয়াজেব, জুনুত, বেদ্আৎ প্রভৃতি শত শত ইসলামী পারিভাষিক শব্দ কোন মতেই বর্জন করা যাইতে পারিবে না। কেননা, বাঙ্গলা ভাষায় ঐ সকল শব্দের অনুবাদ হওয়া অসম্ভব। এইভাবে উভয় দিক বিবেচনা করিয়া আমাদের ধীরে ধীরে গম্ভ্য-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি, কোরআন। ইহার নিম্নে বিশ্বস্ত হাদিসের স্থান। তারপর ফেকা, দশন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। ইসলামের এই সকল উৎস হইতে ভাবধারা সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে। তবেই আমাদের সাহিত্য-সাধনা সফল ও সার্থক হইবে।

সর্বশেষে আর একটি কথা বলিয়া আমরা বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, মুসলমান ও হিন্দু যদি এই ভাবে পৃথক থাকিয়া সাহিত্য চর্চায় ব্যাপৃত হয়, তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে উভয়ের মিলন কবে হইবে, কিরূপ হইবে? রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায় বহুদিন স্বতন্ত্র থাকিলেও পরিশেষে তাঁহাদের মিলন ঘটিতেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে এ শুভদিন কখন, কি ভাবে আসিবে? আমাদের মনে হয়, এযাবৎ মুসলমানেরা যেমন হিন্দুদের ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, মুসলমানদের ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত গতিতে চলিলে অল্পকাল পরেই হিন্দু-রাও তেমনই মুসলমানদের নিজস্ব ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচয় লাভ করিবেন। এই সময় হইতে উভয় সম্প্রদায় একযোগে, একই ভাবে সমবেত শক্তি প্রয়োগে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পরিচর্যা করিতে পারিবেন। আমরা আশা করি, এই উদ্দেশ্য বাঙ্গলার শিক্ষা ও চিন্তার কেন্দ্রসমূহ হইতে ‘পণ্ডিত’ সক্ষীর্ণতা ও কুপমগুরুতা লোপ করিবার জন্য উভয় সম্প্রদায় সমবেতভাবে চেষ্টিত হইবেন। কারণ এই চেষ্টা যত শীঘ্র সফল হইবে, সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমানের পূর্ণ মিলনও তত সত্ত্বর সম্ভব হইবে। কিন্তু আমরা জানি, এরূপ চেষ্টা দুই কিংবা পাঁচ বৎসরে সফল হইবার নহে। মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা—শক্তিশালী সাহিত্য সেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। হিন্দু ভ্রাতারাও ক্রমে ক্রমে মোসলেম-সেবিত সাহিত্যের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইবেন। ইহার ফলে পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে। তখনই হিন্দু মোসলেম সম্মিলনের রুদ্ধ দ্বার আপনা হইতেই মুক্ত হইয়া যাইবে। ঠিক করে বলিতে পারি না, তবে সে-শুভদিন যে নিশ্চয়ই আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের “বাঙ্গলা গদ্য” (৬:৯, চৈত্র ১৩৩৫) বাংলা গদ্যের আদিপর্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তবে “আধুনিক কথা সাহিত্য” (৬:১২, আষাঢ় ১৩৩৬) প্রবন্ধে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

(১)

“আমাদের কথা-সাহিত্যের বয়স খুব বেশী নয়, শ’খানেক বছর হয় কিনা সন্দেহ। ইংরেজরা এদেশে আসার সাথে আমাদের সাহিত্যের সত্যিকার গদ্যের স্ফূরণ হয়েছে। পূর্বে গদ্য ছেড়ে পদ্যে এদেশের ইতিহাস লিখা হ’ত। আর শুধু এদেশের কথাই বলি কেন, পূর্বে সকল দেশেই গদ্যের চেয়ে পদ্যের চর্চা বেশী ছিল; ফরাসীরা পর্যন্ত তাদের ইতিহাস কাব্যাকারে লিখত। ইংরেজরা এদেশে আসার সাথে সাথে কথা-সাহিত্যের দিকে বাঙ্গালীর নজর পড়ে। প্রথমে তাঁহারা উর্দু পার্সী হ’তে আরব্য-উপন্যাস, তোতাকাহিনী ও চাহার দরবেশ ইত্যাদির অনুবাদ আরম্ভ করে।—অতঃপর ইংরেজী গল্প-সাহিত্যের দিকে মনযোগ দেওয়া হয়।

এ-সব অনুবাদের মধ্য দিয়ে হাতে-খড়ি হচ্ছিল, শেষে বে’র হ’ল চমকপ্রদ উপন্যাস-‘বাবুবিলাস’; পড়ে সকলে আশ্চর্যান্বিত হ’ল। এই উপন্যাসখানা খাঁটি বাঙলা উপন্যাস, বাঙ্গালী-জীবনের নিখুঁত ছবি এতে শিল্পীর তুলির স্পর্শে অপরূপ রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। এমনতর চাবুক-মারা উপন্যাস বাঙ্গালী খুব বেশী লিখতে পারে নাই।

এরপরে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র প্রভৃতি। বঙ্কিম থেকেই আমাদের স্তম্ভ কথা-সাহিত্যের বিকাশ আরম্ভ হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই সাহিত্যের স্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে মনস্তত্ত্ব জিনিষটার অনেকটা অভাব হয়ত পরিলক্ষিত হয়। কথা-সাহিত্যে এই অপূর্ণ

সামগ্রী প্রয়োজনমত দিয়েছেন অমর-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-সাহিত্য-সৃষ্টি বিশেষ কোন কালের সীমার মধ্যে জাতির সংস্কার-সংকল্প নিয়ে রচিত, এই সময় অতীত হ'লে এবং এই প্রয়োজন সার্থকতা লাভ করলেই, সেই সাহিত্যের দাম অনেকটা কমে যাবে। আজকাল যে গল্প সাহিত্যের খোসরোজ চলছে তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট হয়ে আছে। তাঁর মত সর্বোত্তমখী প্রতিভাবান সাহিত্যিক বাংলা-সাহিত্যের ভাগ্যে দ্বিতীয় আর ঘটে নাই।

(২)

আমরা শরীর এবং আত্মা, এই দুটা জিনিষ নিয়ে গড়ে উঠেছি—একটা হচ্ছে শরীরী আর একটা হচ্ছে অশরীরী; একটা ফুল, অন্যটা তার স্মরণ। সাহিত্যও তেমনি হয়েছে দুটা জিনিষ নিয়ে, একটা প্রয়োজনবোধ ও অন্যটা প্রয়োজনাতীতকে নিয়ে; অর্থাৎ একটা চিরন্তন আর একটা সাময়িক। সাময়িক ও চিরন্তন, এই দুটা জিনিষেরই প্রয়োজন সাহিত্যে আছে এবং চিরকাল থাকবে। Uncle Tom's Cabin “নীলদর্পন” হালীর “মসাদ্দস” সাময়িক রচনা;—“Foust” “ঘরে বাইরে” রুমীর “মসুনবী” চিরন্তন সৃষ্টি। সাহিত্য জাতির মনের প্রতিচ্ছবি; তার আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা উন্নতি-অবনতি এতে নিত্যকালের জন্য রূপ নিয়ে থাকে। সাহিত্য জাতির মনের ইতিহাস, তার উত্থান-পতনের কাহিনী। আধুনিক জগতের সাহিত্যে কথা-সাহিত্য এক বিরাট শক্তিশালী অঙ্গ। মনে হয়, ভবিষ্যতে কথা-সাহিত্যের প্রভাব আরও বেশী হবে; কেননা শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যেমনি তার কর্তৃত্ব বাড়তে থাকে তেমনি তার মন শ্রান্তি দূর করবার জন্যে এই কথার কল্পলোকে যেতে উন্মুখতর হ'তে থাকবে।

আমাদের বাংলা-সাহিত্যে কথা-সাহিত্য পাঠকের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অংশ (lion's share) অধিকার ক'রে আছে। কথা-সাহিত্য ও কাব্য-সাহিত্য ছাড়া আমাদের সাহিত্যের অন্য কোন দিক বিশেষ বিকশিত হয় নাই।

(৩)

অধুনা কথা-সাহিত্য শুধু আরব্য-উপন্যাসের নিছক কাহিনী নিয়ে খুসী নয়, প্রকৃতই সে সমাজ-নীতি রাজ-নীতি, আইন-তত্ত্ব প্রভৃতির রাজ্যে হানা দিতে শুরু করে দিয়েছে, এবং এর ফলে বের হচ্ছে—ইব্‌সেনের “Ghost”—গোকির “Mother”,—গল্‌স ওয়ার্ডের “Justice”,—রবীন্দ্রনাথের “গোরা”। সর্বত্র কথা-সাহিত্যের আবরণ দিয়ে জগতের নানা সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা চলছে। সমস্যা যতই জটিল, এঁদের সমাধান ততই অপূর্ব হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার ঢেউ এসে বাংলায়ও লেগেছে, তাই আজ-কালকার কথা-সাহিত্যে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের মত দক্ষ শিল্পী বাংলা-সাহিত্যকে নবতর সম্পাদশালী ক'রে তুলেছেন। তাঁর রচিত কথা-সাহিত্যে ফুটে উঠেছে বাঙ্গালী হিন্দু সমস্যার কথা। তিনি সমাজের অসংখ্য সমস্যার মধ্য হতে বিশেষ ক'রে বেছে নিয়েছেন নারী-সমস্যা—তা শুরু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ “নষ্টনীড়” ও “ঘরে-বাইরে”তে যে-সমস্যার ইঙ্গিত করলেন, শরৎচন্দ্রের “শ্রীকান্ত” “চরিত্রহীনে” বের হ'ল তার টীকা-ভাষ্য।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর এলেন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশগুপ্ত প্রভৃতি। শরৎচন্দ্রের কাছে যা ছিল Sociology, তাঁর পরবর্তী এই অতি আধুনিক কথা-সাহিত্যিক-

দের কাছে তা হ'য়ে উঠল Sexology; যে কথাটি তিনি অন্তরাতে গাইলেন এই অতি-আধুনিকরা তা আরম্ভ করলেন 'কোরাস'-খাদে। বলা যেতে পারে, লেখকরা প্রভাবান্বিত হয়েছেন যেমন ন্যুট-হাম্‌সুন, মোপাসাঁ দ্বারা, তেমনি শরৎচন্দ্রের দ্বারাও। শরৎচন্দ্রের আত্মতাকে তাঁরা রক্ষা করতে পারেন নি; তাঁরা কথা-সাহিত্যে যৌনতত্ত্বের বিশ্লেষণ উল্লেখ প্রকাশ্যভাবে চালালেন। এরই ফলে রচিত হ'ল 'সাহিত্যধর্ম'। কথায় কথা বাড়তে, সে-বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হ'ল না; নরেশচন্দ্র-শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথা ও আদর্শের প্রতিবাদ করলেন। ফলে অধুনা বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে তরুণ ও প্রবীণ নামে দুইটি দল দেখা দিয়েছে।

(৪)

প্রাণ-ইসলামিক আরবী কবিতা, যাকে বিশ্বের কাব্য-কোহিনুরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা যেতে পারে, তার মধ্যে খুঁজলে 'অনুদামজলের' গোষ্ঠলীলা পাওয়া যাবে। কিন্তু তার নির্মলতা আবিলতাময় নয়; কেননা তার মধ্যে আছে বাধা-বন্ধহীন বেদুইনদের দুর্গদ প্রাণের অভিব্যক্তি, তাঁদের কলঙ্কের মত তার মধ্যে যদিও কলুষ আছে, তথাপি তার দিকে কারো নজর পড়ে না, সকলে স্বাধীন প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও দুর্ধর্ষ শক্তির রূপময় মুক্তি দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়। ইবসনের 'Ghost'-এ নীতি-বিরুদ্ধতা আছে, তবুও তা অপাংক্ত্যেয় নয়। টলষ্টয়ের Resurrection-এ সত্যীত্বের অবমাননা আছে, তবু তা বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য হয়। ডস্টএভস্কির Crime and Punishment-এ নরহত্যার বীভৎস লীলা আছে; তবু তা জগতের সাহিত্যের মুকুটমণি।

টলষ্টয় যেখানে দুর্নীতির সমর্থন করলেন, সেখানে শরৎচন্দ্র 'করুণাময়ী'কে নিয়ে গিয়ে নীতিকে ভয়ে ভয়ে বাঁচালেন; তবে পার্থক্য কোথায়?

হিন্দু সমাজের সব চেয়ে ভয়ঙ্কর সমস্যা নারী-সমস্যা অর্থাৎ বিধবা-বিবাহ, নারীর স্বাধীন প্রেম ও অবাধ মেলা-মেশা।

রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী বিমলাকে, এবং শরৎচন্দ্র করুণাময়ী রাজলক্ষ্মীকে এই সমস্যার বিভিন্ন দিক দেখাবার জন্যে অত্যন্ত সতর্কভাবে হাজির করলেন।

কিন্তু অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যিকরা যৌন-প্রেমকেই নিলেন; এবং তা' নিয়েই সাহিত্যে বর্তমানে মাতামাতি চলেছে।

বাংলার কথা-সাহিত্যে চলেছে এখন মদনোৎসব। সকলে এখন তাঁদের শক্তি নিয়ে এই দেয়ালী-উৎসবের আলো জ্বালছেন।

অতি-আধুনিকদের বিকৃত রসের প্রভাব থেকে বাংলা কথা-সাহিত্যকে মুক্ত করতে না পারলে আর কল্যাণ নাই! আমাদের শত শত সমস্যা কথা-সাহিত্যে রূপলাভ করুক, ইহাই জাতির কামনা।"

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী "মুসলিম মহিলার সাহিত্য-সাধনা" (৭:১, ভাদ্র ১৩৩৬) প্রবন্ধে নারী শিক্ষা ও শিক্ষিতা নারীদের সাহিত্য সাধনার গুরুত্ব আলোচনা করেছেন:

"মহিলা লেখিকাদের কাছে অনেক বেশী আশা করা যায়। শিক্ষিতা নারী জাতির প্রধান সম্পদ, কেননা সমাজের জন্য জননীই প্রথম ও উত্তম শিক্ষয়িত্রী। স্বতাবতঃ নারী ও

পুরুষ মানব-চরিত্র গঠনের দুই দিক ভাগ ক'রে নিয়েছে। পুরুষ অনু বস্ত্র ও পুথিগত বিদ্যা সম্ভানকে দান করতে পারে—কিন্তু নারী মেহ যত্ন ভালবাসা দিয়ে, এমন কি নিজকে উৎসর্গ ক'রেও সম্ভানের মনের সুক্কা অনুভূতিগুলিকে জাগ্রত করে ও জীবন্ত রাখে। পুরুষ কর্মপ্রবণ, নারী প্রধানতঃ ভাব-প্রবণ। বিনা-মূলধনে শুধু প্রাণ নিয়ে যাদের কার-বার, তাঁরা যে মানব-মনের সুখ-দুঃখ ইত্যাদি যত রকম অনুভূতি আছে তা সহজে বুঝতে ও অপূর্ব বর্ণ-সম্পাতে উজ্জ্বল ক'রে ফুটিয়ে তুলতে পারবে, তা বলাই বাহুল্য। মন বুঝে চলা যাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, মানব-মনের ঘাত প্রতিঘাতময় কাহিনী—কঠিন পথের দুঃখ-বেদনার সান্ত্বনা-বাণী লোকে সেই নারীদের মুখেই শুনতে চায়।”

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ-র “কবি দিদারুল আলম স্মরণে” (৭:৬, মাঘ ১৩৩৬) দিদারুল আলমের মৃত্যুতে রচিত নিবন্ধ। দিদারুল আলম চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুন থেকে ‘যুগের আলো’ নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং রেঙ্গুনের প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক ‘সন্মিলনী’ ও কিনে নেন। উভয় পত্রিকায় মুসলমান সমাজের জাগরণের উদ্দেশ্যে তিনি লেখনী ধারণ করেন। মুহম্মদ হবীবুল্লাহ ভাষায় :

‘যুগের আলো’ এবং ‘সন্মিলনী’তে দিদার বে-পরোয়া ভাবে এমন সব কথা বলিয়াছে যাহা বাঙলা-ব্রাহ্মণ মুসলিম সমাজের পক্ষে মুখরোচক হয় নাই। যুগসংযুক্ত সংস্কারের গোড়ায় আঘাত দেওয়াতে অস্থির সেদিন ‘হাঁউ মাঁউ খাঁউ, নূতনের গন্ধ পাউ’ বলিয়া দাঁত খিঁচাইয়া ছিল। সে গর্জনে দিদার বিচলিত হয় নাই। উদ্যত যষ্টিকে সে নমস্কার করে নাই। ‘তওবা’ পড়িলে, বা নতি স্বীকার করিলে, সেদিন সে রক্ষা পাইতে পারিত; কিন্তু সে জীবন অপেক্ষা সত্যকে বড় ভাবিয়াছিল। আদর্শের জন্য সে আঘাতকে বরণ করিয়া লইল। এই আঘাত হইতে তার কাল ব্যাধির উৎপত্তি। এই কাল ব্যাধি হইতেই তার জীবনের শেষ। তাকে শহীদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি এই জন্যই। দিদার, তরুণ আন্দোলনের প্রথম শহীদ দিদার, চলিয়া গিয়াছে। তার মহিমার উদ্দেশ্যে আজ তরুণের হাতের পতাকা অবনমিত হোক।”

দিদারুল আলমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে নিবন্ধের শুরুতে মুহম্মদ হবীবুল্লাহ লিখেছেন :

“পরাদীন দেশের, সম্মোহিত জাতির সব চেয়ে বড় বিড়ম্বনা এই যে এখানে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয় যত তার চেয়ে ঢের বেশী যুদ্ধ করিতে হয় আপনার জনের সঙ্গে। দিদার, আমাদের বড় আদরের দিদার, তার আপনার জনের সঙ্গে লড়াই করিয়া মরিয়াছে। সে শহীদ হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দকের গুলিতে সে প্রাণ দেয় নাই, জানি। কারাগারের অন্ধকূপে প্রায়োপবেশন করিয়া জীবন আহুতি দেয় নাই, স্বীকার করি। তবু তাঁকে আমরা শহীদ বলিয়াই অভিহিত করিব। মতের জন্য সে লাঞ্চিত হইয়াছে, আদর্শের জন্য প্রাণপণে লড়িয়াছে—বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়া মৃত্যুকে সে বরণ করিয়াছে।”

নিবন্ধে দিদারুল আলমের সাহিত্য কর্মের প্রসঙ্গ অনালোচিত। তবে দিদারুল আলমের চিন্তা চেতনা ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য অল্পকথায় ফুটিয়ে তুলেছেন মুহম্মদ হবীবুল্লাহ :

...“স্বপ্ন সে অনেক কিছু লইয়াই দেখিত। আমাদের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার, শিক্ষা, পারিবারিক জীবন, যৌন-জীবন সব কিছুই নূতন করিয়া যাচাই করিবার, ঢালাই করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা সে পোষণ করিত। ধন সাম্যের আদর্শ

তাকে মাঝে মাঝে বেশ একটু অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিত। তার ধারণা হইয়া গিয়াছিল— সম্পত্তির মালিক হওয়া দস্যতারই অপর দিক, যাহা আমার আছে তা' হইতে অপরে বঞ্চিত হইবে এই ধারণাটাই Property, কতকগুলি লোক বিনা পরিশ্রমে, বিনা কৃতিত্বে সমাজের মাথায় বসিয়া unproductively শ্রমিকের রক্ত-জল-করা উৎপন্ন দ্রব্য consume করিয়া যাইবে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ।

দিদারুল আলম মনে করিত intellectuals দেৱও কর্তব্য শরীর খাটাইয়া কিছু কিছু উৎপন্ন করা। শ্রমের কাজ করিয়া কোন শিক্ষিত মানুষকে এত আনন্দ পাইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। দুধ-দোহা, জাল দিয়া মাছধরা, ঘরামীর কাজ, মাটি কাটা, এ সমস্ত ব্যাপারে দিদারের যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তাহাদের বাড়ীর প্রায় ত্রিশ-হাত লম্বা বাঁশের ঘরখানা কাহারো সহায্য ছাড়া তাহারা দুই ভাই মিলিয়া তৈরী করিয়াছিল। বাড়ির ছোট পুকুরটা তারা নিজ হাতে কাটিয়াছে। এক-দিনের কথা মনে আছে, দিদার-দেব একটা টাট্টু ঘোড়া হারাইয়া গিয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর চাক্তাইর চরে ঘোড়াটির সন্ধান মিলিল। দিদার ঘোড়াটিকে ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কোট-পেণ্ট-টাই পরা সাহেব দিনে দুপুরে আন্দর কিল্লার রাস্তার উপর দিয়া ঘোড়ার রশি ধরিয়া চলিয়াছে; লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই। রাস্তার লোকে মুখ চাওয়া চাওয়া করিতে লাগিল।

অনেকে হয়ত জানেন না, দিদার মটর ড্রাইভারি করিয়াছে। ভাল লেখাপড়া জানা সোফার দেখিয়া অনেকেই অবাক হইত। 'সওগাতে' প্রকাশিত 'মটর-ষ্টাণ্ড' গল্পে তার ড্রাইভার-জীবনের একটা ছবি সে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের আনন্দ, মানুষের বেদনা, যে নব নব রূপ লইয়া ফুটিয়া ওঠে তার নব নব আবিষ্কারেই ছিল দিদারের তৃপ্তি।"

এস. ওয়াজেদ আলি "বাঙ্গলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী মুসলমান" (৮:৭, ভাদ্র ১৩৩৮) প্রবন্ধে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করেছেন। তিনি ভাষা, দেশ ও ধর্ম তিনটি বিষয়কেই গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন। তাঁর মতে বাঙ্গালী মুসলমানকে বাংলা ভাষার চর্চা করতে হবে এবং ধর্ম ঐতিহ্য সেই সাহিত্যচর্চায় অঙ্গীভূত করতে হবে। তিনি ইসলাম ধর্মের ইতিবাচকতা থেকে অনুপ্রেরণা পেতে চান তবে তিনি ধর্মাত্মতার বিরুদ্ধে। এস. ওয়াজেদ আলির বক্তব্যের প্রধানাংশসমূহ নিম্নরূপ:

"বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা হচ্ছে বাঙ্গলা। বাঙ্গলা ভাষার চর্চা আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। এ বিষয় এখন আমাদের মধ্যে আর মতভেদ নাই। তবে এই মাতৃভাষা আমাদের হাতে কি-রূপ পরিগ্রহণ করবে তা নিয়ে আমাদের সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়।"

আমার মনে হয়, এ-সমস্যার সমাধান "আমরা বাঙ্গালী মুসলমান" এই কথাটুকুর মধ্যেই রয়েছে। তিন কোটি মানুষের স্বাভাবিক ভাষা যদি একটা সাহিত্যের বাহন না হতে পারে, তা হলে কোন ভাষা যে, সে গৌরবের অধিকারী তা বলতে পারি না।

আমাদের স্বাভাবিক ভাষা কি?

ক্রিয়াপদ বাচক শব্দগুলি, যথা,—করিতেছি, যাইতেছি, আসিতেছি, কিম্বা, করছি, যাচ্ছি, আসছি প্রভৃতি, হিন্দু এবং মুসলমান জাতি নির্বিশেষে সমান ভাবে আবহমান কাল থেকে ব্যবহার করে আসছেন। এ বিষয় মত ভেদের প্রয়োজন নাই, অবকাশও নাই আর

এই জন্যই জোরের সঙ্গে আমরা বলতে পারি বাঙ্গলা ভাষা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই মাতৃভাষা, কেননা ক্রিয়াপদের আকার প্রকার নিয়েই ভাষার জাতি নির্ণয় হয়ে থাকে।

কিন্তু ক্রিয়াপদ ছাড়াও ভাষার অন্যান্য অনেক জিনিষ আছে, আর তাদের আকার প্রকার এবং জাতিবিচার নিয়ে হিন্দু এবং মোসলেম সাহিত্যিকের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাই অসংখ্য আরবী ফার্সি এবং উর্দু শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহার করতেন, পরিপূর্ণভাবে মনের ভাব অভিব্যক্ত করবার জন্য। আদালতের ভাষা এখন পর্য্যন্ত সেই পথেরই অনুসরণ করে আসছে। সাহিত্যের ভাষা কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় একেবারে বদলে দিয়েছেন। তিনি আরবী, ফার্সি এবং উর্দু ভাষা মূলক, শব্দসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে, তাহাদের যায়গায়, সংস্কৃত মূলক শব্দের আমদানি করেছেন। ফলে পণ্ডিত বাঙ্গলার সৃষ্টি হয়েছে! বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শিক্ষিত হিন্দুরা মাতৃভাষার চর্চায় আত্ম-নিয়োগ করেন। আর তারই ফলে বর্তমান বাঙ্গলা হিন্দু সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধু ভাষার প্রবর্তন করেন তখন বাঙ্গালী মুসলমানদেরও সমৃদ্ধ এক সাহিত্য, তাদের কালচারের এবং স্বাভাবিক ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের মত স্বজাতিপ্রেমিক কোন মনীষী যদি আমাদের সমাজে থাকতেন তা হলে তাঁর প্রচেষ্টায় আমাদের সেই প্রাচীন পুথিসাহিত্যও নূতন রূপ পরিগ্রহ করতো, এবং যথাসময়ে, বর্তমান কালোপযোগী ভাব এবং চিন্তার উপযুক্ত বাহন হয়ে দাঁড়াত। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তির উর্দু এবং ফার্সির মোহেই তখন মেতে রইলেন, মাতৃভাষার দিকে ব্রক্ষেপ মাত্র করলেন না। আমাদের জাতীয় সাহিত্য তাই নূতন যুগের উপযোগী হয়ে উঠতে পারলো না। লাক্ষিত, অনাদৃত হয়ে বোচারী পল্লীর কুটীরেই পড়ে রইলো। পক্ষান্তরে হিন্দুদের জাতীয় সাহিত্য, তাঁদের অক্লান্ত সেবায়, সমৃদ্ধ এক সাহিত্যে পরিণত হল।

তারপর দুই একজন করে মুসলমানেরা যখন বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরে নামতে আরম্ভ করলেন তখন হিন্দুর ব্যবহৃত বাঙ্গলা ভাষা সমস্ত শিক্ষায়তনগুলিকে দখল করে বসে। সংবাদপত্র প্রভৃতিকে দখল করে বসেছে, দেশের সাহিত্যকে দখল করে বসেছে, এক কথায় সমস্ত দেশকেই দখল করে বসেছে। জাতীয় ভাষা ব্যবহার করবার মত সাহাস, শক্তি এবং প্রতিভা আমাদের তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিল না। হিন্দুর ব্যবহৃত ভাষাকেই তাঁরা রুচিসম্মত এবং ভদ্রতাসম্মত বলে মনে করলেন, আর সেই ভাষাতেই সাহিত্য সাধনা করলেন। মীর মোশাররফ হোসেন, রেয়াজুদ্দিন, শেখ আবদুর রহিম প্রভৃতি হচেচন সেই যুগের লক্ষ প্রতিষ্ঠ মুসলমান সাহিত্যিক।

তারপর এসেছে আমাদের এই বর্তমান যুগ বিদ্যাসাগরী গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে এবং মীর মোশাররফ হোসেন প্রমুখ সাহিত্যিকদের অন্ধ অনুকরণ প্রিয়তার বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক বিদ্রোহ বা natural re-action দেখা দিয়েছে। আমরা আস্তে আস্তে এখন বুঝতে পারছি, আমাদের স্বাভাবিক জাতীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করা লজ্জার বিষয় নয়, উপরন্তু সেই ভাষাতেই আমাদের প্রকৃত সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আমাদের স্বাভাবিক ভাষা বা কি?

বাঙ্গালী মুসলমানের বাঙ্গলা যে বাঙ্গালী হিন্দুর বাঙ্গলার থেকে অনেকাংশে ভিন্ন সে বিষয় সন্দেহ মাত্র নাই। আর প্রভেদ অহেতুক নয়। এর যথেষ্ট ঐতিহাসিক, মজ্জহাবী এবং কালচারগত কারণ বর্তমান আছে। সেই সব কারণের দরুণ এক সময় পুথির ভাষা

স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্যের বাহনও এই পুথির ভাষারই এক নতুন ধরণ হবে, পণ্ডিত ভাষা হবে না। অবশ্য এখন হিন্দুরা সাহিত্যের ভাষাকে অনেকটা সোজা এবং সহজবোধ্য করে ফেলেছেন। আমাদেরও তাই করতে হবে। বিদ্যাসাগরী ভাষা যেমন এখন হিন্দুদের মধ্যে চলেনা, আমির হামজার দস্তানের ভাষাও আমাদের মধ্যে আর চলবে না। হিন্দুরা তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাষার অনুসরণ করে সরলতার পথে অগ্রসর হবেন, আমরাও আমাদের স্বাভাবিক ভাষার অনুসরণ করে সরলতার পথে অগ্রসর হব। পরে হয়তো এই দুই উপভাষায় মিলে ব্যাপকতর এক ভাষার সৃষ্টি করবে। তবে সে পরিণতি নির্ভর করবে আমাদের হিন্দু বন্ধুদের উপর, কেননা তাঁদের উপভাষা গ্রহণে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অগ্রসর হয়েছি। তাঁদের এখন আগিয়ে অর্ধপথে এসে আমাদের সঙ্গে মিলতে হবে।

সাহিত্যের আদর্শ এবং বিষয় বস্তু

সাহিত্যের কাজ হচ্ছে ব্যক্তির, জাতির, বিশ্ব মানবের এমন কি সমগ্র বিশ্বের সুখ, দুঃখ আশা, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা সমবেদনা প্রভৃতি অনুভূতিকে সুন্দর, সরস, মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করা। সেই হিসাবে, সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য হচ্ছে প্রত্যেক মানব সন্তানের আপনাতত্ত্ব জিনিষ; সে হিসাবে সাহিত্যের জাতি বিচার নাই, ধর্ম বিচার নাই, শ্রেণী বিচার নাই, বর্ণ বিচার নাই। সেক্সপিয়ার পড়ে একজন ইংরাজ যেমন আনন্দ পায়, বাঙ্গালীও তেমনি আনন্দ পায়; দেওয়ান হাফেজ পড়ে আমরা যেমন আনন্দ পাই জার্মানীর থুগেনেরাও ঠিক তেমনি আনন্দ পায়। কেননা ইংরাজ এবং বাঙ্গালী, থুগেন এবং মুসলমান সকলেই মানুষ, আর, তাদের বহিরাবরণের ভিতর যে বিশ্ব মানুষটা আছে, তারই প্রাণের কথা হাফেজ এবং সেক্সপিয়ার অতুলনীয় দক্ষতার সঙ্গে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আর তাই তাঁরা কেবল তাঁদের দেশের সাহিত্যে নন, বিশ্ব সাহিত্যেও অমর।

সাহিত্যের কাজ হচ্ছে মানুষের অন্তরের অন্তরতম সত্যকে ভাষায় রূপায়িত করা। সে হিসাবে সাহিত্যের জাতি বিচার নাই। তবে প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক যুগের সাহিত্যের দেশগত, জাতিগত যুগগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে। আর যে সাহিত্যে সে বৈশিষ্ট্য নাই, সে সাহিত্য অসার জিনিষ, বিশ্ব-সাহিত্যে তার স্থান হইতে পারে না।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অবশ্য universal man বা বিশ্ব মানব বলে একটা জিনিষ আছে, ক্ষিদে পেলে সে খায়, যাতনা পেলে সে ছুটোছুটি করে, সন্তান-সন্ততিকে সে ভাল বাসে, প্রবাস থেকে দেশে ফিরলে মন তার আনন্দে নেচে উঠে। এ সব তার universalism বা বিশ্ব মানবতার পরিচায়ক।

কিন্তু universalism ছাড়া মানুষের মধ্যে Particularism বা সীমা নির্দেশক বৈশিষ্ট্য ও আছে। সে হয় সাদা কিম্বা হলদে কিম্বা বাদামী কিম্বা কাল রংএর মানুষ। তার দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ কিম্বা ইরান কিম্বা ইংলও কিম্বা অন্য কোন স্থান। সে স্বাধীন জাতির একটা unit কিম্বা কোন পরাধীন জাতির unit যে গরম দেশে বাস করে, কিম্বা মোতাদেল আবহাওয়া (temperate) দেশে বাস করে, কিম্বা ঠাণ্ডা দেশে বাস করে। তার সেই দেশ সমতল কিম্বা পর্বত-প্রধান। প্রত্যেক মানুষেরই এই সব বিশেষত্ব আছে। এই সব বিশেষত্ব ছাড়া abstract মানুষ হ'তে পারে না। আর এই সব বিশেষত্ব ছাড়া যেমন একটা বিশেষ মানুষ হ'তে পারে না, তেমনি বিশেষ কোন

সমাজ ও হ'তে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এবং প্রত্যেক সমাজের মধ্যে এই সব বিশেষত্ব আবহমানকাল থেকে চ'লে আসছে এবং চিরকাল থাকবে।

একদল সাহিত্যিক আমাদের সমাজে আছেন, যারা জাতীয় বিশেষত্বকে গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁরা মনে করেন সমাজের কোন শ্রেণীগত বিশেষত্ব থাকা উচিত নয়। সে বিশেষত্ব যত শীঘ্র উঠে যায়, ততই ভাল। আর সে, বিশেষত্বকে আমাদের সমাজ থেকে তাড়ান একান্ত দরকার। অবশ্য ভারতীয় মুসলমান সমাজের, বিশেষত্বঃ বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য ক'রেই তারা এসব কথা বলেন। কেননা, Territorial Nationalism বা দেশাত্মক জাতীয়তা বাদে তারা একান্ত বিশ্বাসী; আর সেই আদর্শের পূর্ণ উপলব্ধির জন্যই আমাদের কালচার মূলক বিশেষত্বকে বর্জন করতে তাঁরা উপদেশ দেন। তাঁদের আদর্শ হচ্ছে হিন্দু এবং মুসলমান কালচার মিলিত ভারতীয় culture সেই অনাগত কালচারের উপলব্ধির জন্য ইসলামিক culture কে তাঁরা বর্জন করতে চান।

সেরূপ করা কি সম্ভবপর, সেরূপ করা কি উচিত? এই সমস্যারই এখন আলোচন করা যাক।

Universalism বা বিশ্ব মানবতার সবচেয়ে বড় সমর্থক হচ্ছেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ব মানবতার বিষয় তিনি যত লিখেছেন, আর কেউ বোধ হয় তত লেখেন নি। তাঁরই লেখা পড়ে এবং বক্তৃতা শুনে একদল বিশ্বপ্রেমিক আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছেন, আর তাঁরা ইসলামিক সভ্যতাকে ভারতবর্ষ থেকে, অন্ততঃ এই বাঙ্গালা দেশ থেকে তাড়াবার জন্য বন্ধপরিকর হয়েছেন, এবং হিন্দু ও মোসলেম সভ্যতার সমন্বয় করে নূতন একটা কিছু গড়বার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা এ সব করছেন তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে ভারতবর্ষ থেকে বড় বড় পণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে ক্ষুদ্র বালী দ্বীপে যাচ্ছেন, হিন্দু-কালচারের পুনরুত্থানের জন্য; নটরাজের পালা লিখছেন, বাঙ্গালী ছেলেদের হিন্দু পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিকতা শেখাবার জন্য। বেদ-মন্ত্র পাঠে তাঁর জ্ঞান-তিথি উৎসব সম্পন্ন হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু আদর্শকে জাগিয়ে রাখবার জন্য। যে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখলে, দশবার তাতে উপনিষদের উল্লেখ করতে ছাড়েন না, তাঁরই নির্দেশিত পথের অনুসরণ করে, আমাদের সমাজের সাহিত্যিকেরা ইসলামিক কালচারের শত্রুতা সাধনে আত্মনিয়োগ ক'রেছেন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

হিন্দু-সভ্যতা এবং স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন বন্ধিম দেখেছিলেন। সে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য আজ সমস্ত হিন্দু সমাজ উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁদের এই বিরাট প্রচেষ্টার ফল কি হবে কে ব'লতে পারে?

যে সব মুসলমান মিলিত ভারতীয় কালচারের স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের কোন প্রভাব হিন্দুদের মধ্যে নাই। হিন্দু যে ভবিষ্যৎ ভারতীয় কালচারের স্বপ্ন দেখেন, তা' লুপ্ত হিন্দু সভ্যতার দ্বিতীয় বা অধুনিক সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়।

জাতীয় জীবনের সঙ্গে জাতির Culture এর ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ—যেমন শরীরের সঙ্গে প্রাণের। প্রাণ ছাড়া যেমন শরীর কায়ম থাকতে পারে না, Culture ছাড়া তেমনি একটি জাতিও কায়ম থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে যতদিন প্রাণ আছে, ততদিন যেমন

শরীরের লয় নাই ; তেমনি, যতদিন জাতীয় Culture বর্তমান আছে, ততদিন জাতির মৃত্যু নাই। সেই জন্যই বিপদগ্রস্ত পরাধীন জাতিরা এমন দৃঢ় ভাবে জাতীয় Culture কে আঁকড়ে ধরে থাকে। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেই জাতীয় Culture এর সাহায্যেই জাতি শেষে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করে সিদ্ধির, মুক্তির উদার আকাশ তলে দাঁড়ায়। জাতীয় Culture কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল বলেই এহুদীর ফেরাউনের দাসত্ব এবং অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করেছিল।

আপনারা জানেন এক সময় প্রায় সমগ্র স্পেন দেশ মুসলমানদের অধীনে ছিল। স্পেনের মুসলমানদের মত সুশিক্ষিত, সুসভ্য এবং উন্নত জাতি পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। স্পেনের খ্রীষ্টানেরা তখন সরহদ্দেব সংকীর্ণ পার্শ্বত্যা অঞ্চলে বাস করতো। তাদের না ছিল শিক্ষা, না ছিল সম্পদ, না ছিল সভ্যতা। সাহসে শৌর্য্যে বীর্য্যে তারা কোন অংশে মুসলমানদের, সমকক্ষ ছিল না। অথচ শেষে তারা সমস্ত স্পেন দেশ জয় করতে এবং সুসভ্য মুসলমানদের সেখান থেকে জড় শিকড় এবং ডাল-পালা সমেত তাড়াতে সমর্থ হয়েছিল।

কারণ অনুসন্ধান ক'রলে দেখতে পাবেন, খৃষ্টানদের কৃতকার্য্যতার মূলে ছিল তাদের গোঁড়ামী, আধুনিক রুচিসম্মত কথায়, জাতীয় কালচার প্রীতি। আর মুসলমানদের পরাজয়ের মূলে ছিল, তাদের আত্মঘাতী উদারতা, জাতীয় কালচার প্রীতি বা গোঁড়ামীর অভাব এবং পর কালচার (যথা গ্রীক কালচার) প্রীতি।...

কেউ মনে করবেন না, আমি যুক্তিহীন, দৃষ্টিহীন, উদ্দেশ্যহীন গোঁড়ামীর এখানে প্রশংসা দিচ্ছি। যে গোঁড়ামী উচ্চকণ্ঠে আমীন বলার জন্য দোজখের ব্যবস্থা করে, যে গোঁড়ামী মিউজিক শোনার অপরাধের জন্য বিবি তালকের ফংওয়া দেয়, যে গোঁড়ামী সর্ব্ব্বরকম উৎসব এবং আনন্দের সঙ্গে অনাবশ্যক জেহাদ ঘোষণা করে, সে গোঁড়ামীর সমর্থন আমি করি না। সে গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে আমি আমার জীবনের অন্যতম প্রধান কর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করি।

আমি সমর্থন করছি,—সেই Enlightened Fanaticism বা জ্ঞানদীপ্ত নিষ্ঠার, যাতে জাতীয় Culture জাতির জীবনে তার উপযুক্ত স্থান দেওয়া হয়।...

মুসলমানের গোঁড়ামীর কথা, মুসলমানের ধর্ম্মাঙ্কতার কথা, মুসলমানের communalism এর কথা চরিত্রিক গুনতে পাই। আসলে সত্য কিন্তু ঠিক তার বিপরীত মুসলমানের মত উদার Tolerant এবং সাম্প্রদায়িকতা হীন জাতি পৃথিবীতে নাই। উদারতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির অভাবের দরুণই মুসলমান তার রাজ্য হারিয়েছে। তা' না হলে, আজ পৃথিবীতে এক আল-হেলালের ঝাঙা ছাড়া আর কোন পতাকা দৃষ্টিগোচর হত না। মুসলমান যদি Toleration এর মূর্ত্ত বিগ্রহ না হত তা হ'লে সেখান থেকে চীন পর্য্যন্ত আজ মুসলমান ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী মানুষ দেখতে পাওয়া যেত না, আর ইসলামের উপর সাম্প্রদায়িকতার দোষ দেবার লোক এই বিশাল ভূখণ্ডে খুঁজে পাওয়া যেতো না।..."

তারতর্ষ্যে মুসলমানের বর্তমান দুর্দশার কারণ হচ্ছে তাঁর সাম্প্রদায়িক মানসিকতার অভাব। হিন্দু মুসলমানের লেখা বই পড়ে না, অথচ মুসলমান আগ্রহের সঙ্গে, তৃপ্তির সঙ্গে হিন্দুর লেখা বই পড়ে যাচ্ছে। হিন্দু মুসলমানের তৈয়েরী খাবার কিনলে জাতিচ্যুত হয়, অথচ হিন্দুর তৈয়েরী মিঠাই না হ'লে মুসলমানের রসনা তৃপ্ত হয় না। হিন্দু সাহিত্যিক তাঁর গল্পে কিম্বা উপন্যাসে মুসলমান চরিত্রের আমদানি করা একান্ত অনাবশ্যক বলে মনে করেন, অথচ একটা না একটা হিন্দু চরিত্রের আমদানি না ক'রলে

মুসলমান সাহিত্যিকের গল্প এবং উপন্যাস লেখা হয় না। হিন্দু সুপেও টুপি, কিম্বা আচকান কিম্বা পায়জামা পরবার কথা ভাবেন না; আর আধুনিক রুচির মুসলমান যুবকের ধৃতি চাদর না পরলে সখ মেটে না। হিন্দু সুপেও তার উপাস্যকে 'আল্লা' কিম্বা 'খোদা' বলে না, আর মুসলমান সাহিত্যিক 'আল্লা' কিম্বা 'খোদা' শব্দ ব্যবহার ক'রলে দর্শবার তার কৈফিয়ত দিতে ভুলেন না। আর কত বলবো একটু চিন্তা করলেই আপনারা শত শত দৃষ্টান্ত দৈনন্দিন জীবনে খুঁজে পাবেন।

আমি আপনাদের অ-মোসলেম জাতি সমূহের সঙ্কীর্ণ Intolerant অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার চর্চা ক'রতে বলছি না। ইসলামের নির্দেশিত পথকেই আমরা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি, সুতরাং ইসলামের toleration ইসলামের উদারতা, ইসলামের অসাম্প্রদায়িকতার অনুশীলনই আমাদের করতে হবে।....”

“আমাদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য ক'রলে, তিনটি সত্য একান্ত স্পষ্ট হয়ে আমাদের চোখের সামনে ধরা দেয়; যথা আমরা ধর্ম, কালচারে এবং রক্তে মুসলমান রাষ্ট্র এবং ভৌগোলিক বিভাগ হিসাবে আমরা ভারতবাসী মাটি, ভাষা, স্বাভাবিক সভ্যনুভূতি হিসাবে আমরা বাঙ্গালী। এই তিনটি বড় সত্য আমাদের জীবনকে অতীতে নিয়ন্ত্রিত ক'রেছে, বর্তমানে করছে, এবং ভবিষ্যতেও করবে। এই তিনটি সত্যের কোন একে অবহেলা করে সমাধান ক'রলে সে সমাধান আমাদের মনঃপুত হবে না। যে সমাধান আমাদের প্রাণে প্রেরণার সঞ্চার করবে না, সে সমাধান তাদের সমস্যার নিষ্পত্তিও ক'রবে না।

আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষ কতকগুলি প্রতিবেশী দেশের সমষ্টিগত নাম ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবর্ষ হচ্ছে একটি মহাদেশ, একে দেশ বলাই ভুল। দেশের যে সব বিশেষত্ব থাকা দরকার, “এক ভাষা, এক জাতি, ভৌগোলিক একতা, ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আবহাওয়ার দেশগত বৈশিষ্ট্য এ-সব ভারতবর্ষের এক একটি প্রদেশে আছে বটে; কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে নাই। প্রদেশ গুলিই হচ্ছে এক একটি দেশ আর ভারতবর্ষ হচ্ছে একটি মহাদেশ। এই বঙ্গ ভূমিই হচ্ছে আমাদের দেশ, আর ভারতবর্ষ হচ্ছে, আমাদের মহাদেশ। আমাদের কালচারের প্রতি যেমন আমাদের কর্তব্য আছে, আমাদের মহাদেশ বা দেশসমূহের প্রতি যেমন আস্তা আছে, আমাদের দেশের প্রতিও তেমনি আমাদের কর্তব্য আছে। এই তিনটি দাবী সমান। তাদের মধ্যে বিরোধ হ'তে আমরা দেবো না। কেননা, তাদের বিরোধেই আমাদের মৃত্যু আর সেই জন্য তাদের প্রত্যেকের দাবী এবং ঘরের সীমা নির্দেশ করা একান্ত দরকার।

আমাদের সাহিত্যে আমাদের মানবতা, আজকালকার পরিভাষায় বিশৃঙ্খলিততা প্রকাশ পাবে, সে সাহিত্যে প্রকাশ পাবে যে মোসলেম কালচারের শিশু আমরা; সে সাহিত্যে প্রকাশ পাবে যে ভারতবর্ষ আমাদের মহাদেশ, রাষ্ট্রসমূহ; সে সাহিত্যে আরও প্রকাশ পাবে যে, বাংলাদেশ আমাদের ওয়াতান, মাতৃভূমি।”

সৈয়দ মোকাররম আলীর মুন্সী শেখ আবদুর রহিম (৮:৭, তারিখ ১৩৩৮) পরিচিত-মূলক প্রবন্ধ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক শেখ আবদুর রহিমের পরলোকগমনে তাঁর জীবনকথা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

নূপেঞ্জকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বর্তমান বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব (৯:৩, কাতিক ১৩৩৯) একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। তৎকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যের তিনি ছয়টি প্রধান ধারা নির্দেশ করেছেন। তাঁর ভাষায় ধারা ছয়টি হল:

- (১) The wanderer spirit—যাযাবর বৃত্তি।
 (২) Life of instinct—সামাজিক অনুষ্ঠান আর অনুশাসনের মধ্য দিয়ে মানুষের আদিম, চিত্ত-বৃত্তিকে দমন করে রেখে মানুষ নিজের ক্ষতি করেছে—
 (৩) False modesty in expression of life—অথবা naturalism—জীবনে যা ঘটেছে বা ঘটে তা প্রকাশ করার মধ্যে কোনও কুণ্ঠা বা অন্যায় কিছু নেই।
 (৪) Sex-motiff নানা আকারে অথবা নানারূপে মানুষ সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে, কখনও জ্ঞাতসারে কখনও অজ্ঞাতসারে এক অমোঘ যৌন-নিয়ম মেনে চলছে। একথা স্বীকার করার মধ্যে মানুষের পক্ষে কোনও লজ্জার কারণ নেই। এটা হলো মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।
 (৫) War-motiff—অন্যায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফলে মানুষ যুদ্ধের সৃষ্টি করে এবং সমস্ত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও আজও পশু-যুগের এই জঘন্য নিদর্শনকে সগৌরবে বয়ে বেড়ায়।
 (৬) Pan-phychism—সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাইরের ঘটনার বিশেষ কোনও মূল্য নেই। মানুষের অন্তরে নিত্য সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম যে-সব চিন্তার ষাত-প্রতিষাত হচ্ছে সেগুলিই হলো আসল রূপ-বস্তু।”

মোটামুটিভাবে বর্তমান যুরোপীয় সাহিত্য—যার সঙ্গে আমরা অনুবাদের মধ্য দিয়ে পরিচিত হয়েছি—মোটামুটিভাবে এই ছটা হলো, তার বিশেষ ধারা।”

বাংলা সাহিত্যে এই ধারাসমূহের প্রভাব-প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন :

“বর্তমান যুগের যুরোপীয় সাহিত্য পড়তে গেলেই—আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যুরোপ এমন একটা ওলোট-পালটের মধ্য দিয়ে গেছে যে জগতের ইতিহাসে কখনও আর তা হয় নি। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত যুরোপ রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক জীবনে যে সব আদর্শ মেনে এসেছে মহাযুদ্ধ এসে নির্মমভাবে তা সব ভেঙ্গে দিল, প্রত্যেক জাতি তার জাতিগত আত্মমর্যাদা বাঁচাবার জন্যে একান্ত নিরুপায় হয়ে—তারা যা নিয়ে এতকাল ধরে গর্ব করে এসেছে—নীতি, ধর্ম, বিশ্বাস, জীবনের সুখ শান্তি, নারীর মর্যাদা, শিশুর স্বাস্থ্য, সমস্ত বিসর্জন দিল—সেই ভগ্নাবশেষ যুরোপ শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যখন নিজের দিকে ফিরে চাইলো তখন দেখলো যে, ধরে-থাকবার-মতো কোন আদর্শই সে আজ বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি। অতীতের যা কিছু ছিল সব সে ভেঙ্গেছে, বর্তমানে এখনও সে কিছু গড়ে তুলতে পারে নি। চোখের সামনে দিনের পর দিন যে সব দৃশ্য তাকে দেখতে হয়েছে, তাতে তার চিত্ত অবিশ্বাসী হয়ে উঠলো কিন্তু এমনই হলো যে সে বলতে পারতো যে সে এইটে বিশ্বাস করে না—কিন্তু কোনটে বিশ্বাস করে তা সে সেদিন বলতে পারে নি। এই ভাঙ্গনের মুখে সে যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছে—তাতেও এই নেতিবাদ ফুটে উঠেছে—বন্ধন মানি না—না নীতির, না বাইরের গঠনের—কি বিশেষ করে কি যে মানি তা জানি না। তাই সহসা মহাযুদ্ধের পর সাহিত্যের বাইরের রূপের দিক দিয়ে যেমন নানারকমের বিচিত্র গঠন হতে লাগলো—তার ভেতর দিক থেকে তেমনি একটা নৈতিক নেতিবাদ জেগে উঠলো কিন্তু এই নেতিবাদ এবং গঠনের দিক দিয়ে এ বিচিত্রতা—যেটা হলো অন্তরের চঞ্চলতার একটা বিকৃত মূর্তি—আজ যুরোপেই ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে আসছে কিন্তু এই বাইরের গঠনের বিচিত্রতা এবং নৈতিক নেতিবাদ বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এসে পড়েছে। গঠনের বিচিত্রতা হয়ে উঠেছে সাহিত্যের অন্তর ধর্ম। মহাযুদ্ধের পর যুরোপ আজও পর্যন্ত নিজের মানসিক স্থৈর্য খুঁজে পায় নি—তাই সে নিত্য নব গঠনের বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে সে তার অন্তরের বিক্ষোভ

জানাতে চেয়েছে। এবং অনেকস্থলে এই বিক্ষোভ সত্য হওয়ার দরুণ প্রকাশের বিচিত্রতা সেখানে স্বাভাবিক হয়েছে। বর্তমান যুরোপীয় কাব্যে এবং সাহিত্যে form এর বিচিত্রতা—সেটা তার সাময়িক বিক্ষুব্ধ চিত্তেরই পরিচয়। একান্ত দুঃখের বিষয় যে সেই সাময়িক বিক্ষোভের বিকৃত প্রকাশ আমরা আবার কাব্যে ও সাহিত্যে অনুকরণ করে—কমা, ফুলটপ কমিয়ে বা বাড়িয়ে—বা এক অক্ষরে একটা পদ লিখে ভাবছি একটা নূতন রূপ সৃষ্টি করলাম।

বর্তমান যুরোপীয় সাহিত্য আমাদের বর্তমান সাহিত্যের উপর যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে—তার যে চিত্র আমি আঁকলাম—তাতে জানি না কে সন্তুষ্ট হবেন বা অসন্তুষ্ট হবেন।

অপরকে নয়, নিজেদের যেভাবে বুঝেছি, দেখেছি বা চিনেছি, সেই ভাবেই লিখেছি। আমার পক্ষে এ আত্মবিশ্লেষণ মাত্র।”

সাঁদত আলি আখন্দের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের নও-বেলাল (১৯:৪, ফাল্গুন ১৩৪৫) মূলতঃ নজরুল-প্রাসঙ্গিক মন্তব্য।

“যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে একটা নবীন যুগ আসিয়াছে। রাবীন্দ্রিক যুগের ভিতরই ইহার আভাষ পাওয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা “এবার ফিরাও মোরে” এই যুগের একটা অপ্রত্যাশিত ব্যতিক্রম। কবির উদাত্ত-কণ্ঠ সেই প্রেম-সঙ্গীতের যুগেও মানুষের অন্তর বিষিয়ে তুলিয়াছিল—মানুষ বলিতে শিখিয়াছিল :—

“বল, মিথ্যা আপনার সুখ, মিথ্যা আপনার দুঃখ
স্বার্থগণা যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হ’তে
সে কখনো শিখেনি বাঁচিতে।”

যে দিন বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের অবসানে সৈনিক কবি অসি ছাড়িয়া বাঁশীতে তুর্য্য-ধ্বনি করিলেন—

“বল, বীর বল, উন্নত মম শির”—

সেই দিনই বাংলা-সাহিত্যের এই নূতনরূপ আমাদের চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বাংলা-সাহিত্যের এই অভিনব অভিব্যক্তি দেখিয়া মানুষ বিস্ময়-পুলকে শিহরিয়া উঠিয়াছে, আপনার অপরাধের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে।

কবি নজরুল যুদ্ধোত্তর বাংলা-সাহিত্যের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহারথী। তিনিই প্রেমে জর্জরিত বাঙ্গালী জাতির শিখিল শিরায় নতুন স্পন্দন জাগাইয়া দিয়াছেন, জাতির তরুণ দল যখন পথ না পাইয়া বিপথেই অভিযান করিয়াছে, তখনই নজরুলের বাঁশী বজ্রকণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছে—

“দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার”

—কিন্তু এই রক্ত পাগল করা গান বেশী দিন গাওয়া চলিল না। যে কণ্ঠে একদিন নিপীড়িত মানুষের দুঃসহ ব্যথা বাজিয়া উঠিয়াছিল, সেই কণ্ঠে একদিন শোনা গেল—

“ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ছিদ”

এই নতুন গানের অভিনব সুরে বাঙালী জাতি চমকিত হইয়া দেখিল—বাংলা সাহিত্যে ‘গজল-সঙ্গীতের’ যুগ আসিয়াছে।

কবি নজরুলের কণ্ঠে ইসলামের এই নবীন অভিব্যক্তি বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ। তাঁহার গজল-গানের ভিতর দিয়াই বাংলার হিন্দু-মুসলিম পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনিবার অবসর পাইতেছে। হয়ত একদিন দেখা যাইবে যে গজল-গানের ভিতর দিয়াই বাঙালী হিন্দু-মুসলিমের মিলনের পথ নিকটতর হইয়াছে।

নজরুলের পরে যে নবীন ভগীরথগণ তাঁহার সেই পুরাতন “বিদ্রোহী” কবিতার ভাষা বাংলা সাহিত্যে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিজয়লাল, বেনজির ও মহীউদ্দীনের নাম বাঙালী পাঠকের নিকট পরিচিত। কৃষক-মজুরের দুঃসহ করুণ কাহিনীই ইহাদের কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি কাতর কণ্ঠে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

—“আর কতদিন—কতদিন ভগবান।
দুর্ভিক্ষনীতে প্রশ্রয় তুমি অবাধে করিবে দান?
নির্দোষ, দীন, দুর্গত জন, তাদের রাখিতে হবে—
আশ্রয় হীনে আশ্রয়দান তোমারে করিতে হবে।
অত্যাচারীর কবলে কাতর দুর্বল অসহায়—
তুমিই রক্ষা করিবে তাদের কাতরে তোমারে চায়।”

বাংলা-সাহিত্যের এই অতি আধুনিক রূপ ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা ছাপাইয়া অনেক উর্ধ্বে উঠিতেছে। মানুষ হিন্দুও নয় মুসলিমও নয় মানুষ; শুধু মানুষ—এই শাস্ত্রত বাণী বাংলা সাহিত্যে অতি দ্রুত ভাবে প্রবেশ করিতেছে। শুধু মানুষের কল্যাণ কামনা করিয়াই বাংলার নও-বেলালগণ গাঁথিতেছেন—

“অন্যায় যত অত্যাচারের হোক চির অবসান—”

হৃষিকেশ ভট্টাচার্য “সাহিত্যের স্বরূপ” প্রবন্ধে (১৯:৪, শ্রাবণ ১৩৪৩) সাহিত্যে বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। তাঁর বক্তব্য:

“আদর্শ-শিল্প সুন্দর হোতেই পারে না যদি সে বাস্তবতার উপর স্থাপিত না হয়। যা সুন্দর, তা সত্য হোতেই হবে। কীটন-এর বাণী ‘Beauty is truth, truth is beauty’ আর্টের সত্য কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য নয়। কবি বলেছেন “যাহা ঘটে, তাহা সত্য নয়।” আর দৈনিক ঘটনা সত্য যা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা সব সময় আর্টে সত্য নয়। আদি রসাত্মক সাহিত্য যৌন-সম্বন্ধ নিয়েই রচিত। কিন্তু যৌন চিন্তার উল্লস প্রকাশ, সুন্দর হোতে পারে না তরুণ-তরুণী প্রেমলীলা মনোহর হোয়ে ওঠে কাব্যে—ইঙ্গিতের মধ্যে—সঙ্কেতের মধ্যে—আভাসের মধ্যে। কিন্তু জীব-ধর্মের কায়িক প্রকাশ কাব্য-সৌন্দর্যের সহকারী নয়। অস্পষ্টতার মধ্যে দিয়ে এই লীলা প্রাচীনকাল থেকে কাব্যে সুন্দর হোয়ে উঠেছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা যৌন-বৃত্তিকে দমন করেছেন বা দহন করেছেন। দর্শন তাই মদন-দহন। কিন্তু কাব্য মদনমোহন।

বাস্তবতা সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে হয়। বাস্তব-কর্কশ, লোমশ, বাহ্য ও স্থূল। বাস্তববাদীর কাজ হোলো বহু যুগের চিন্তাসমষ্টিকে বিশ্লেষণ কোরে, তার মধ্যে বস্তুর ও বাস্তবের ভেদাভেদ নিরূপণ করা। বিচারের তুল্যদণ্ডে সত্যের মূল্য নির্ধারণ করা ও পরে সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে আর্ট সৃষ্টি করা।

বাস্তববাদ সম্বন্ধে তৃতীয় কথা—সাহিত্য সৃষ্টি সৃষ্টাবিশেষের প্রতিভার দ্বারা সাধিত হয় বটে, কিন্তু তার পশ্চাতে সমস্ত জাতিগত সত্যতা অদৃশ্যে কাজ করে। আমাদের প্রাদেশিক কৃষ্টি প্রত্যেক শিল্পকে প্রেরণা দিচ্ছে। স্বজন সেই সহজ প্রেরণা-প্রসূত, সেটি একসঙ্গে জাতীয় ও সর্বজনীন।”

সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ : “...আমাদের বাঙলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট কর্তে হ'লে তার মাল-মসলার জন্য অভিজ্ঞতা প্রসারের প্রয়োজন। আর দরকার আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-বিচার। আত্মসমালোচনা আমাদের যত বৃদ্ধি হবে, সাহিত্য ততই পরিপুষ্ট হবে। সাহিত্যে সরলতার অভাব আমাদের যথেষ্ট আছে। সাহিত্যে পৌরুষের স্থান প্রকাশ এখন বড়ই প্রয়োজন হোয়ে পড়েছে। আমরা দুঃখে দৈন্য মেরুদণ্ডহীন হোয়ে পড়ছি। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে সমালোচনা-সাহিত্য।”

কাব্য সাহিত্য প্রবন্ধে (২১:৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬) শাহাদাৎ হোসেন লিখেছেন, “ঋঁটি কাব্য বা কবিতা যা, তার ঐশ্বর্য্য হচেছ তিনটি ভাব ভাষা এবং ছন্দ। ভাব দেয় কবিতার প্রাণ, ভাষা দেয় রূপ, ছন্দ দেয় গতি।” প্রবন্ধের শেষে সাহিত্যের সার্বজনীনতার সমর্থনে তাঁর বক্তব্য :

“সকলের আগে আমাদের ভেবে দেখতে হবে—কাব্য থেকে আমরা কি আশা করি কি পেতে চাই। আর সেই আশা করাটা এবং পেতে চাওয়াটা যদি সত্যিকারের আশা করা এবং পেতে-চাওয়া হয়, তাহোলে আর আমাদের “গেলে রাজ্য, গেল মান” বোলে চোঁচাবার দরকার হয় না।

কাব্য একদিকে যেমন রস, আনন্দ এবং সৌন্দর্য্যের প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন ভাবধারার মিলন-কেন্দ্র। এই মিলন কেন্দ্রে হিন্দু-মুসলমান, জৈন-বৌদ্ধ, ইহুদী-খ্রীষ্টান সবাই এসে দাঁড়িয়েছে নিজের জ্ঞান, সভ্যতা, কৃষ্টি এবং আদর্শের উপচার নিয়ে। এই সবার সমবায়, সকলের অর্থা-উপচারে গোড়ে উঠেছে যে শাশ্বত চিরন্তন কাব্য, তাকেই আমি বরণ করি সত্যিকারের কাব্য হিসেবে—অন্তরের অন্তস্তল থেকে। আজকাল অনেক কাব্য কবিতায় ক্ষণস্থায়ী সাময়িক উন্মাদনা দেখতে পাই। সময় এবং ঘটনার উত্তেজনা মুহূর্তেই সাধারণতঃ এগুলোর সৃষ্টি হোয়ে থাকে। যাঁরা এসবের সৃষ্টা, তাঁরা হয়ত ভেবে দেখেন না যে এই ঘটনা এবং উত্তেজনার অবগানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের এ-সৃষ্টি মোরে যাবে। তবু যে তাঁরা তা করেন, তার কারণ অন্য কিছু নয়—কবি-স্থূলভ ভাবপ্রবণতা। আমি যে এটার নিন্দা কোরছি তা নয়; তবে এতে বৃহত্তর এবং মহত্তর সৃষ্টির পথে কিছু-কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বোলেই কথাটা তুললাম।

আমি আর বেশী সময় আপনাদের নেব না। শেষ কথা এই বোলতে চাই যে কাব্যের পীঠ-কেন্দ্রে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় বা দেশ-কালের ভেদাভেদ নেই। এটা হোচ্ছে সর্বজাতি, সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের মিলন-কেন্দ্র”।

আবদুল কাদিরের মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা (২৩:৩, মাঘ ১৩৪৭) একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ। সনোট চরয়িতা মধুসূদন সম্পর্কে আবদুল কাদিরের অভিমত নিম্নরূপ :

“সনেটকার হিসাবে মধুসূদনের নাম এদেশে অমল হইয়া থাকিবে। তাঁহার সনেটে ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তিনি তাঁহার বক্তব্যকে উদাহরণ সহযোগে ছবির মতো মুর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিতেন। “করুণ, রস” ‘রৌদ্র রস’ প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মধুসূদন বাংলা ভাষার প্রথম সনেট রচয়িতা, ইহাই এ ক্ষেত্রে তাঁহার একমাত্র গৌরব নয়। তাঁহার কয়েকটি সনেট ছন্দোগতি ও কল্পনা-গুণে কালজয়ী হইয়া থাকিবে।”

আবদুল কাদিরের আবুল হুসেনের চিন্তাধারা (২৩:৫, চৈত্র ১৩৪৭) একটি তথ্য-মূলক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ। বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আবুল হুসেন সম্পর্কে তথ্যবহুল রচনা সম্ভবতঃ এই প্রথম। প্রবন্ধে আবদুল কাদির বলেন:

“মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতির দরুণ তিনি বুঝিতে পারেন যে, সাম্রাজ্যবাদের জন্য মানুষের সৃষ্টি নয়, বিশ্ব-মানবের মঙ্গল-বিধানের জন্যই শাস্ত্রের সৃষ্টি। মানুষের জন্য এই প্রেমের অনুভূতিই তাঁহার জীবনে দিয়াছিল সাহিত্যের প্রেরণা। ‘ঝগটুর’ মা, ‘খাদু’, ‘নাদু বো’ প্রভৃতি গল্পে তিনি দুস্থ জীবনের যে-বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাতে আবেগাতিশয্য সত্ত্বেও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির পরিচয় আছে। এদেশের অসহায় নারীজাতির প্রতি তাঁহার অকপট মমতা তাঁহার রচিত গল্পে করিয়াছে বেদনাময় মূর্ত্তলাভ। প্রথম জীবনে “নারীর অধিকার” শীর্ষক একটি রচনায় তিনি বলিয়াছিলেন—“পুরুষ শহরে বাজারে নিজের চরিত্রকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিবিকার চিত্তে গৃহে ফিরিয়া স্বীয় দেবকন্যা তুল্যা পত্নীকে অনাদর-অবজ্ঞার পাত্র করিয়া তুলিতেছে সেজন্য কোনো শাস্তি পায় না; কিন্তু দুর্ভাগিনী পত্নী যদি সামান্য চরিত্রদোষে দুষ্ট হয় তবে স্বামী তাহাকে সময় সময় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া বসে। এই অসমান ব্যবহার ও শাস্তির অবসান কবে হইবে?”... (সাধনা, ভাদ্র, আশ্বিন ও পৌষ ১৩২৮) তাঁহার এই মর্মান্তিক প্রশ্নের উত্তর আমাদের নারী-সমাজই একদিন দিবে।

তিনি “মিলন-মঙ্গল” নামে একখানি সামাজিক নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাহা সাধারণে আজও প্রচারিত হয় নাই। সেই নাটকখানিতে তিনি বিশেষভাবে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ অবসানের উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। “সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান” প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমাদের সাহিত্যের ভিতর যেন সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য কোনপ্রকারে না থাকে, তবেই মিলনের পথটি পরিষ্কার হবে।” (দীপিকা, ভাদ্র ১৩৩৪) তবে ব্যক্তিহীন ও পরিপার্শ্বের প্রভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রীতিভোজে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ-কর্তাদের পক্ষ হইতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—“সাহিত্য অনুভূতির বিষয় সেই অনুভূতি বিশিষ্ট আবেষ্টনে সহজেই কেন্দ্রীভূত হয়। সেই কেন্দ্রীভূত অনুভূতি দিয়ে আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধান করতে চাই। সেজন্য চাই একটা বিশিষ্ট আবেষ্টন। তারই জন্য আজ আমাদের পৃথক এই প্রতিষ্ঠান।”

অবশ্য সেদিন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাভাবিক সমর্থন করিলেও রাজনীতিতে কোনোদিন ভেদপ্রথার প্রশ্রয় দেন নাই। মৎসম্পাদিত “জয়ন্তী” পত্রিকায় প্রকাশিত “আমাদের রাজনীতি” শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দৃঢ়তাসহকারে ঘোষণা করেন—“আজ স্বাভাবিক নীতি যারা দাবী করছেন তাঁরা দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ও তার আয়োজনের ধারণা করতেও অসমর্থ। দেশের লোকের ব্যক্তিগত বিকশিত করার জন্য যে-রাজনীতির প্রয়োজন, তার মূল আদর্শ হচ্ছে (democracy)। ভারতবাসী তার নিজের প্রয়োজন নিজেই নির্ধারণ করার ক্ষমতা চায়। সে-ক্ষমতা তাকে দিলে সে যে-আয়োজন করবে, তাতে সকলের

ঠিক সূর্যের আলোক ও বর্ষার বারিধারার ন্যায় সমান অধিকার থাকবে এবং তা সকলের পক্ষে সমানভাবে কল্যাণকর হবে। ***মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু majorityর ভয়ে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন চাচ্ছেন, কিন্তু সে attitude ভিক্ষুকের। ***স্বতন্ত্র-নীতি দুর্ব্বলের নীতি। সে নীতির ফল হচ্ছে চির-দাসত্ব।” ***জয়ন্তী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৭) The Gandhi-Irwin Truce and the Muslims নামক পুস্তিকায়ও তিনি স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-প্রথার অপ্ৰশংসা করেন।”

সাহিত্য চর্চা (২৩:৯, শ্রাবণ ১৩৪৮) সোহরাব আলি খান চৌধুরীর ব্যাপক অধ্যয়নের পরিচয়বহ। প্রাবন্ধিকের মতে, “সাহিত্য স্রষ্টার প্রধান মূলধন হল অভিজ্ঞতা।”

আবু রুশদের “আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ” (২৩:১০, ভাদ্র ১৩৪৮) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে আধুনিকতার সংজ্ঞা-প্রসঙ্গে আবু রুশদ লিখেছেন:

“আধুনিক আমরা তাকেই বলবো যাতে যুগের ছবি পরিস্ফুট এবং যার পশ্চাত্তমি বাস্তবতাকে স্বীকার করে চলেছে। ফুল নিয়ে কবিতা লেখা আজকালকার দিনেও অমার্জ্জনীয় নয়, কিন্তু সে কবিতা আধুনিক হবে কি না তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। ***সমাজ চেতন সংস্কারমুক্ত নৈব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীই আধুনিকতার সহজ মাপকাঠি।”

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার রূপ বিশ্লেষণ করে আবু রুশদ আধুনিক কবিতার পশ্চাত্তমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন:

“মানুষের জটিল ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত বিভেদ ও দ্বন্দ্ব বর্তমান সভ্যতার বিভিন্ন রূপকে চিহ্নিত করেছে, সেই বিভেদ ও দ্বন্দ্বের অশেষ সংঘাতে আমাদের সভ্যতা আজ ধ্বংসমুখী।

অথচ মানুষের নির্বুদ্ধিতাই মানুষকে এই অনিবার্য ধ্বংশের পথে এনেছে। উন্মত্ত গতিবেগে মানুষের উদ্ধত কামনা এখন এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যেখানে ধ্বংসের করালরূপ মুখব্যাধান করে মানুষকে তার বিরাট ব্যর্থতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

অসহায়তার এ নির্মম রূপ বাস্তবিকই করুণ। যে ঘটনাচক্রে নিঃস্পর্শে আজ আমরা উত্মজ্ঞ এবং শঙ্কাকুল তা আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি আমাদের স্বার্থান্ধ বীভৎস গৃহ-তাকে এক মধুর রূপে আচ্ছাদিত করে, আমাদের নিষ্ঠুরতা ও নির্বুদ্ধিতাকে সভ্যতা-সমৃদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিঘোষিত করে।

কিন্তু স্বেহেতু আত্মপ্রত্যারণার ভিত্তি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিথ্যার উপর, স্বেহেতু তার অস্তিত্ব দীর্ঘ নয় এবং সমাজ বিবর্তনের আকস্মিক ঝাপটায় তা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের আশা ছিল অপরিমিত। বিজ্ঞান মানুষকে দিবে বিত্ত, দিবে শক্তি, দিবে অফুরন্ত আশ্বাস। স্বপ্নের মোহে মানুষের মন তখন পৃথিবী ছাড়িয়ে চলে গেছে গ্রহাস্তরে।

সে-আশা স্থায়ী হল না। বিজ্ঞানের ধ্বংসমুখী সম্ভাবনা বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের ব্যাকুল আশাকে গভীর নিরাশায় পরিণত করল। সংশয় দেখা দিল মানুষের মনে, জিজ্ঞাসা এবং সন্দেহের নিষ্ঠুর ক্ষতে মানুষের মন থেকে আশা গেল উবে।

ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষ ভাগে সংশয়বাদ ইংল্যান্ডের বিদগ্ধ সমাজে ছড়িয়ে পড়লো ব্যাধির মতো। আর্থিক এবং রাজনৈতিক সফলতার মহিমাকে এড়িয়ে মনের জিজ্ঞাসাই বড় হয়ে উঠলো। টেনিসনের মত রক্ষণশীল কবিও এই চতুর্দিকব্যাপ্ত নিরাশার জাল থেকে নিজেকে বিচিহ্ন রাখতে পারলেন না। তাঁর ধর্ম সংস্কারেও লাগলো আঘাত—এই স্বপ্নের ছবি নিয়ে সাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করলো ‘ইন মেনোরিয়াম’।

তারপর অভূতপূর্ব চাকল্যের সৃষ্টি করলো ডারউইনের ‘অরিজিন অব স্পেসিস’। ধূলি-লুণ্ঠিত হলো মানুষের যুগ-সঞ্চিত অন্ধ বিশ্বাস, সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে মানুষের ধারণা গেল আমূল বদলে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব হলো, সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার মর্মোপলব্ধি করে মানুষের মন নিজের রহস্যে নিজেই হলো স্তব্ধ। ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি নূতন জ্ঞানোপলব্ধির উন্মাদনার আঘাতে ভীষণ ভাবে নড়ে উঠলো।

বিজ্ঞানে হাঙ্গলী, চিন্তা-ক্ষেত্রে মিলস্ এবং সাহিত্যে টমাস্ হার্ডী সংশয়বাদের এই নূতন রূপকে এক দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তারপর অবিশ্যি ১৯১৪ শতকের মহাযুদ্ধ। সে-সময় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের এক অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল—এলো এবার নবযুগ, জগৎ থেকে চিরতরে বিদায় নিল অবিচার মৈত্রী এবং সাম্যের বন্ধনে বাঁধা পড়লো সমগ্র মানবজাতি।

কিন্তু বাস্তবতা আবার মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে করলো নির্গম পরিহাস। মনোরম মুখোস গেল, খসে, কপটতা ও শঠতার দৈত্য মানুষের আকাশচুম্বী আশাকে নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত করলো। তারপর সবকিছু ভেঙে চুরমার হলো। মানুষের মন ব’লে আর কিছু থাকল না। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব মাত্র দুদিনের অতএব হে বন্ধুগণ, Eat drink and be merry, for To-morrow you die.

অতএব অপরিয়াপ্ত ভোগ, অপরিয়াপ্ত ব্যাভিচার, অপরিয়াপ্ত শক্তিক্ষয়। শারীরিক ক্ষুধার প্রাধান্যই স্বীকার করলো মানুষ, নিজের নগ্ন রূপের বীভৎসতায় মানুষ হোল মোহ-চঞ্চল। পৃথিবী অন্ধকার করে ক্ষুধিত যৌবনের কাম-বর্ষা নেমে এলো।

প্রতিক্রিয়া। ভোগে মানুষ আর তৃপ্তি খুঁজে পায় না। শারীরিক ক্ষুধার পূরণে মানসিক দৈন্যই বেশী রকমে উচ্চারিত হয়ে ওঠে, মানুষের মন আবার খুঁজে মরে আকাশের এক কোণ।

ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসছিলো চিত্তস্বৈর্য, আশা আবার বাস্তবতার ভিত্তিতে ফিরে আসছিলো।

কিন্তু ১৯৩৯ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বরের মুখে আবার ঝলসে উঠলো ব্যঙ্গের হাসি। আকাশে ডানা মেললো গোয়েরিং শিশু। ইউরোপে লাগলো আগুন, পৃথিবী কাঁপলো আবার।

আধুনিক কবিতার সংক্ষিপ্ত পশ্চাত্ভূমি এই। হার্ডীর শেষের কয়েকটি কবিতায় জিজ্ঞাসার চিহ্ন প্রকট, ওয়েন যুদ্ধের নির্গমতা ও কারুণ্যকেই বেশী করে ফুটিয়েছেন তাঁর কবিতায়। এলিয়ট প্রমুখ কবি বাস্তবতাকে স্বীকার করে এক সুক্ষ্ম আশাবাদের প্রবর্তন করেন।”

বাংলা কবিতায় এই আধুনিকতার প্রতিফলন প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার এরপর লিখেছেন :

আধুনিকতার এ-চেউ শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশে এলো, এবং আধুনিকতার এ নূতন রূপ প্রথমে মুক্তি পরিগ্রহ করলো রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই।

কিন্তু আধুনিকতার যে বিশিষ্ট সুর তা রবীন্দ্রনাথে ততটা পরিস্ফুট নয়। বিষ্ণু দে ও সমর সেন-ই বাংলা-কাব্যে আধুনিকতা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশিষ্ট কবি হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র বা বুদ্ধদেব বসুকে ঠিক আধুনিক আখ্যা দেওয়া যায় না; যদিও তাঁদের কাব্য-প্রতিভা সমর সেন বা বিষ্ণু দেবের কাব্য-প্রতিভার চেয়ে খাটো নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

বিষ্ণু দেবের কাব্যের চমৎকারিত্ব এবং বিশিষ্টতা আঙ্গিকে। তা কখনো নুয়ে পড়ে না। ঋজু বলিষ্ঠ শাণিত তাঁর লিখবার ভঙ্গী, যা শব্দের দুরূহতাকেও অতিক্রম করে মননশীল পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ করে।

সমর সেনের কাব্য নিলজ্জ ভাবে আধুনিক হলেও কবিতার মূল সুর সেখানে সর্বত্রই বিদ্যমান। সমর সেনকে এমন কি রোমান্টিক কবিও বলা যায়, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তব-বোধ এই প্রচণ্ড রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পদে পদে ব্যর্থ করেছে, তাই সমর সেনের কাব্যে আমরা এক সংঘাতের পরিচয় পাই যা প্রতিভার অব্যাহত বিকাশের পক্ষে কল্যাণ-কর কিছুতেই হতে পারে না। সমর সেনের কবিতায় পূর্ণতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কচিং দুর্বোধ্য রূপকের প্রতি তাঁর মোহ আমাদের এ-কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, তারুণ্যের গভী এখনো তিনি অতিক্রম করেন নাই। তবুও সমর সেনের মধ্যে সম্ভাবনা অফুরন্ত।”

এই আধুনিকতা বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে কিভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তার বিবরণই এ প্রবন্ধের মুখ্য অংশ। প্রসঙ্গতঃ তিনি কয়েকজন কবি সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন: “সম্প্রতি কয়েকজন মুসলিম কবির মধ্যেও আধুনিকতার জোয়ার এসে পৌঁছেছে। তাঁদের যশ এখনো সীমাবদ্ধ, তাঁদের কাব্য প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তবুও তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের যে শক্তি আছে এবং বিপুলতর সম্ভাবনা আছে তা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।”

তাঁরা সকলেই বয়সে তরুণ (যথার্থই) এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার ক্ষেত্র তাঁদের সামনে এখনও পড়ে আছে; অতএব তাঁদের সহানুভূতির সঙ্গেই বিচার করতে হবে। কিন্তু যেটুকু শক্তির পরিচয় তাঁরা এ পর্যন্ত দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে আমাদের সকলের পক্ষেই আশার কথা।

ফররুখ আহমদ—ফররুখ আহমদ রোমান্টিক কবি, অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক বাস্তব-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য্যের জয়গান অকুণ্ঠ, স্বদূরের প্রতি আকর্ষণও তাঁর কাব্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তবুও তিনি নিঃসন্দেহে আধুনিক। তাঁর একটি বলিষ্ঠ সজাগ তীক্ষ্ণ-অনুভূতিশীল মন আছে যা সৌন্দর্য্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করবার সাহস রাখে, কিন্তু রোমান্টিসিজ্‌মের বিপদ সম্বন্ধে যা সর্বদা সচেতন।

তাঁর মেধা এবং সুক্ষ্ম পরিমাণ-জ্ঞান বিস্ময়কর এবং তাঁর বয়সের কবির রচনায় অপ্রত্যাশিত। শব্দের নিপুণ চয়নে, কল্পনার ব্যাপকতায়, এবং গভীর অর্থে পরিস্ফুট রূপক-সাধুর্য্যে তাঁর কবিতা সহজেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

কবি হিসাবে ফররুখ আহমদের সবচাইতে বড় দুর্বলতা নিজের শক্তির উপর তাঁর আস্থার অভাব। তাঁর প্রকাশ ও দৃষ্টিভঙ্গী রোমান্টিক বলে কবি যেন একটু কুণ্ঠিত এবং এই কুণ্ঠার জন্যে তাঁর অধিকাংশ কবিতা পরিপূর্ণ রূপে রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। নিজের তৈরি যে কারাগারে কবির মন এখন বন্দী তা তাঁর কাব্য-প্রচেষ্টাকে বহু যায়গায় ব্যর্থ করেছে। ফররুখ আহমদের যা সবচেয়ে বেশী জানা দরকার তা এই যে, বলিষ্ঠ রোমান্টিক-সিদ্ধান্ত বাস্তবিকই নিদার কিছু নয়।

আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ আহমদের উপর যদি থেকে থাকে ত' তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র।

আবুল হোসেন—আবুল হোসেনই একমাত্র তরুণ মুসলিম কবি যাঁর প্রথম কবিতার বই ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সমালোচকদের প্রশংসা ও সমাদর পেয়েছে। তবু স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই, যে কবি হিসাবে মাসিক পত্রের আসরে তাঁর আবির্ভাব আমাকে আশান্বিত করে নাই। তাঁর প্রথম দিককার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট প্রভাব আমাকে ক্ষুব্ধ করেছিল, যেমন দুঃখিত হয়েছিলাম ফররুখ আহমদের দীর্ঘ কবিতাগুলিতে নজরুলের উচ্ছ্বাস ও উচ্চস্বর দেখে।

আবুল হোসেন সম্পর্কে আমার মত বদলালো তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'নববসন্ত' পড়ে। এখানে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভা তাঁকে আর অভিভূত করেনি, তাঁর স্বাভাব্য ফুটেছে সাফল্যের সঙ্গেই।

আঙ্গিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আবুল হোসেনের ইদানীন্তন কবিতা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, বিশেষ করে সার্থক সাম্প্রতিক আঙ্গিকের জন্যেই। আধুনিক জীবনের অবিলম্বে, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে তাঁর সজাগ মন একাধিক কবিতায় আত্ম-প্রকাশ করলেও তাঁর বৈশিষ্ট্য তাঁর আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে।

নিজের শক্তির উপর আস্থার অভাবই যদি ফররুখ আহমদের দুর্বলতা হয়ে থাকে তাহলে আবুল হোসেনের দুর্বলতা তাঁর দুর্শ্বদ আত্মবিশ্বাসে। পুরোপুরি আধুনিক হতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে অর্থহীনতার বিপদের ফাঁকে পড়েছেন। যেমন 'নবযুগে' 'কুটিল হিয়ার স্নিগ্ধ প্রবঞ্চনা' যদিও সঙ্কেত মাধুর্য ও ছন্দোচ্ছলতায় তাঁর এ কবিতাটাকে আমি বিশিষ্টই বলব।

যন্ত্রশিল্পের ব্যর্থতা আবুল হোসেনকে বিচলিত করেছে বলে মনে হয়। তার প্রমাণ 'ঘোড়সওয়ার' এ কবিতার শেষটি

‘ওদের বোমাগুলি যদি পারত মরুভূমির মাটি ফাটিয়ে
জলের উৎস ধারা বের ক’রতে,
ওদের ট্যাঙ্কগুলি যদি চেষ্টা ফেলত সমস্ত মরুভূমি,
বেয়োনেটের আগায় মাটি খুঁড়ে বুন্তে পারত ধান’
(সৈনিক—শারদীয়া আনন্দবাজার)

যদিও চমৎকার তবুও সমগ্রতার সৌন্দর্য্যে 'নাবিক' কবিতাটিই শ্রেষ্ঠতর। দৃষ্টিভঙ্গি এর সার্থকভাবে আধুনিক, বাস্তববোধ স্বপ্রত্যক্ষ এবং সর্বোপরি আছে সঙ্কেত, আবুল হোসেনের যা সেরা অস্ত্র।

‘জাহাজ ভেসে চলেছে অতল সমুদ্রে,
 ক্রান্ত মস্তুর তার গতি।
 আকাশে ধূসর কুয়াশার ঝাঁধান আন্তরণ,
 পাণ্ডুর মেঘে ঢেকেছে গাঢ় নীলিমা,
 সন্ধ্যার ক্রান্ত নিঃশ্বাসের শ্বনি উঠল মাস্তুলের মাথায়,
 আবছায়ায় অস্পষ্ট মুক্তি।
 নাবিক দাঁড়িয়ে আছে ব্রীজের ওপর হেলান দিয়ে,
 ক্রান্ত চরণ, নিঃপলক দৃষ্টি, বিবর্ণ মুখ।’ (নাবিক—চতুরঙ্গ)

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারলে আবুল হোসেন উত্তর কালে বিশিষ্ট আধুনিক কবি বলে প্রসিদ্ধিলাভ করতে পারবেন একথা অকুণ্ঠিত চিন্তেই বলা যায়।

আহসান হাবীব—অপেক্ষাকৃত রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও আহসান হাবীবের কাব্য-প্রচেষ্টা প্রধানতঃ বাস্তবতাকেই অবলম্বন করে। তাঁর মন সমাজমুখী, বর্তমান জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর এক স্থির ধারণা আছে এবং তা তাঁর কাব্যেও মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

জীবন সম্বন্ধে কবি খুব অশান্তিত নয়, স্বাভাবিক ভাবেই। বাস্তব জীবনের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘনিষ্ঠ, নিবিড়। আধুনিক যে-কোন মুসলিম কবির চেয়ে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী ও ঝাঁটি। তাই বাস্তবতার যন্ত্রণাদায়ক নিঃস্বপ্নতার উপলব্ধি তাঁর প্রায় রচনাতেই রূপ পেয়েছে।

‘এই অধ্যায়’ কবিতাটিতে আহসান হাবীবের মনের আকুতি ভাবপ্রবণতাহীন ভাবে ফুটেছে। যে সৌন্দর্য্য-সম্ভার নিয়ে চৈত্র আসে তা কবির মনের আদিম কামনাকে জাগ্রত করেছে। বাস্তবতার ‘কুণ্ঠকাতর’ যন্ত্রণাকেও উপেক্ষা করে কবি নিবিড় কামনার পথে এগিয়েছেন, চৈত্রমাসের স্বপ্নের উন্মাদনা কবিকে ব্যাকুল করেছে, হয়ত ক্ষণিকের তরেই।

‘আজকের কবিতা’য় হাবীব আরো সাহসী হয়েছেন। তাঁর বাস্তববোধ এখানে ফুটেছে চমৎকার। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি কবির গভীর সহানুভূতি আছে; কিন্তু যেহেতু বাস্তবতাকে তিনি ভালো করেই চেনেন, সেহেতু মানুষের আশা তাঁর মনে বিষাদ-নিবিড় সংশয়ের স্রষ্টি করে :

এখানে তোমার ছাউনি ফেলোনা আজকে
 —এটা বালুর চর।
 চারদিকে এর কোটিলোর কণ্টকময় বন ধূসর।
 উর্বে আকাশ ম্লান মেঘের,
 নিম্নে অতল বন্যা এর,
 হেথা—বাগ করে শত চাণক্য-শিশু শকুনির বহু বংশধর,
 এখানে তোমার ছাউনি ফেলো না, এখানে বেঁধ না বিরাম ঘর।
 (আজকের কবিতা—মোহাম্মদী)

বাস্তবতাকে, তা যতই পীড়াদায়ক হ’ক, স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। ‘কোনো বাদশাঘাদীর প্রতি’ কবিতায় এই নূতন উপলব্ধি বিচিত্র চটুলতা ও উপভোগ্য হাস্যরসের সঙ্গে ফুটে উঠেছে।

আহসান হাবীব কবিতা মাঝে মাঝে খুব বেশী লেখেন, মাঝে মাঝে একদম লেখেন না। কোনটাই তাঁর শক্তি-বিকাশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। তাঁর মনের বাস্তবজাত উত্তাপ তাঁর কবিতাকে কখনও নিতান্ত মামুলী পর্যায়ে নামিয়ে আনে এবং অর্থের গভীরতার অভাব তাঁর অনেক কয়টি কবিতাকে অসাধারণ হ'তে দেয় নি।''

হাবীবের ভাষা নিঃসন্দেহেই আধুনিক এবং সুন্দর কিন্তু সর্বদা সঙ্কেত মাধুর্য্যে পরিপুষ্ট নয়। কবিতার আঙ্গিক সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা খুব প্রখর ও বৈজ্ঞানিক বলে মনে হয় না।

তবু তিনি যথার্থ শক্তিশালী কবি। পর্য্যবেক্ষণ শক্তির প্রসারতা এবং সাধনা দ্বারা ভবিষ্যতে তিনি আরো ভালো কবিতা লিখতে পারবেন, এ আশা মোটেই দুরাশা নয়।

গোলাম কুদ্দুস—ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গোলাম কুদ্দুস শেষ পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছেন। নতুবা আমাদের পক্ষে আপশোষের বিষয় হ'ত বৈ কি!

একদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গোলাম কুদ্দুসের পক্ষে ভালোই হয়েছে। নিজেকে তিনি অবশেষে চিনবার সুযোগ পেয়েছেন।

এখনও কিন্তু তিনি কোন নির্দিষ্ট পথ খুঁজে পান নি, পথের পথিক তিনি এখনও। এই সময়টা যুগপৎ আনন্দ ও বিপদের। সৃষ্টির উদ্বেজনা এখনও নূতন, অতএব মাদকতাময়; ভুল পথ বেছে নেওয়ার বিপদও এখন।

সহজ কথায় গোলাম কুদ্দুসের কাব্য-প্রচেষ্টা এখনও স্থিতিশীল হ'তে পারে নাই। এখনও তাঁর চোখে পথের বিম্বয়।

শব্দের দুর্ব্বোধ্যতা কিন্তু গোলাম কুদ্দুস বেশ আয়ত্বে এনেছেন। জটিলতা সম্বন্ধে তাঁর মোহ জনাগত বলেই মনে হয়। ভাব-ঐশ্বর্য্যে তিনি নিঃস্ব নন কিন্তু প্রায়ই প্রকাশ-ভঙ্গির ব্যর্থতা ও দুরূহ শব্দের অহেতুক মোহ তাঁর নিগূঢ় ভাবাদর্শকে পঙ্কু করে রেখেছে:

‘মূল্যজ্ঞানটা প্রবৃত্তিজাত। তাই ক্ষিপ্ত
অশ্ব থামল, নামল অস্ত্র আজ ভগ্ন।
মনে পড়ে সেদিনের আনন্দ বলদৃশ,
বিদ্যাগিরির নতিতে প্রকাশ মহালগ্ন।’

(ক্ষমা—ঈদ সংখ্যা, আজাদ)

তবুও আমার মনে হয় আধুনিক মুসলিম কবিদের ভিতর তাঁরই ভবিষ্যৎ সবচেয়ে উজ্জ্বল। কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুতই অসাধারণ। তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, বিশ্লেষণমুখী মন এবং মাঝে মাঝে প্রকাশভঙ্গির নূতনত্ব তাঁর কয়েকটি কবিতাকে বিশিষ্টের গোত্রে সহজেই উন্নীত করেছে।

‘পঙ্কজ’ কবিতাটি নিখুঁত। প্রচলিত ব্যঙ্গ, কল্পনার তির্য্যাকগতি এবং সৌন্দর্য্যবোধে এই কবিতাটি সত্যিই সার্থক। এর প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য্য একে মামুলিভের বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে, যার অভাব কুদ্দুসের বহু প্রতিশ্রুতিশীল কবিতাকে ব্যর্থ করেছে। এ দুটি চরণ চমৎকার:

‘এখানে ওখানে বেতুল চৈত্রে কৃষ্ণ চুড়ায় কড়
বর্ণ বিলাসে সুরের আগুন লাগে।’ (পঙ্কজ)

তঁার ‘প্রান্তর’ কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। কল্পনার ব্যাপ্তি এতে ফুটেছে প্রতি ছন্দে। বিপুল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতেও যে একটি নিবিড় কারুণ্যের সম্ভাবনা আছে তা এ-কবিতায় প্রশংসায়োগ্য সাফল্যের সঙ্গেই পরিস্ফুট। কবির প্রাণ-চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে শাসনের বাইরে যাবার জন্যে উদ্গীর্ব হয়েছে কিন্তু কবির সজাগ মন তাঁর প্রাণ-চাঞ্চল্যের উদগ্ৰতাকে আকাশচুম্বী হতে দেয় নাই।

গোলাম কুদ্দুসের আর একটি অভিনব কবিতা ‘লাভা’। ক্ষুধার তীব্রতা এবং বাসনার মাদকতা এ কবিতাকে উষ্ণতায় ভরে দিয়েছে এবং বলিষ্ঠ সংযম একে শিল্পের সৌন্দর্য্য দিয়েছে। বিহ্বলতা এখানে বিবশ হয়ে উঠেনি:

‘স্বপ্নে আমার উচ্ছল জল তরঙ্গ দল যত
তাজমহলের শ্বেত প্রস্তরে জমে যায় অবিরত।
ভগ্ন পক্ষে গড়া আমাদের শুভ্র বালুর চর
শীত জর্জর। ওঠে চারিপাশে ম্লান পদাহত
নির্বীর্য্যের প্রশংসমান ক্লান্ত করুণ স্বর।’
(লাভা—রূপায়ণ)

অতএব গোলাম কুদ্দুস সম্পর্কে হতাশ হবার আর কোনই কারণ নাই। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তিনি নিজের পথের সন্ধান পাবেন। কারণ, বস্তুতই তাঁর মধ্যে শক্তির সম্ভাবনা সুপ্রচুর।

গোলাম কুদ্দুস সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবার পূর্বে তাঁকে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই: চতুর্দশপদী কবিতা লিখলেই তা সনেট হয় না এবং সহজই হ’ক আর দুর্ব্বোধ্যই হ’ক কেবল মাত্র নীতি বাক্য প্রয়োগের দ্বারা কাব্য-সুসমা সৃষ্টির প্রচেষ্টা হাস্যকর।

শওকত ওসমান—আধুনিকতার উপাদান শওকত ওসমানের মধ্যে প্রচুর। কিন্তু তা এখনও হালকা গতিতে বায়ুতে ভেসে বেড়ায়। শওকত ওসমান আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁর মেধা যে তীক্ষ্ণ সে সন্দেহে আমার কোন সন্দেহ নাই। তবুও তাঁর অনভূতি অভিজ্ঞতার স্বৈর্য্যে এখনও বদ্ধন মানে নাই। জীবন সন্দেহে তাঁর অবিশিষ্ট একটি বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি আছে, কিন্তু সে-দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ তাঁর কবিতায় আমরা পাইনি অথবা যখন পেয়েছি তখন তা বাড়াবাড়িরূপেই পেয়েছি। যা বস্তুতঃ খুবই আশ্চর্যের কথা:

‘নিশিথ মহানগরের এই সাগর তীরে—
কলি ও মজুর, ছুতোর, মেথর, চামার ইতর
ঠাই বেঁধে রয় এক নীড়ে।
দিনের উত্তপ্ত সূর্য্যতলে অনু-সংগ্রামের বীভৎস লীলা,
অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল ঈর্ষা ধর্ম্ম
পুনর্ব্বার বহিরূপে অলে এক মীড়ে।’
(কশ্মীর দেবায়—নওজোয়ান)

কবি হিসেবে শওকত ওসমান এখনও বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারেন নাই। কারণ আধুনিকতা সন্দেহে তাঁর ধারণা ঈষৎ বিকৃত। স্যোস্যালিষ্টরা কবি হতে পারেন, কিন্তু স্যোস্যালিজ্‌মেই কবিতা নেই।

বালকসুলভ উচ্ছ্বাস, সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একদেশদশি ধারণা, হাস্যকর অসহিষ্ণুতা শওকত ওসমানের কাব্য-প্রচেষ্টাকে প্রায়ই ব্যর্থ করেছে। যদিও তাঁর প্রতিভা সর্বত্রই পরিস্ফুট। যেদিন মনের চাঞ্চল্যকে শওকত ওসমান জয় করতে পারবেন, চিন্তের অস্থিরতাকে অন্ততঃ আংশিক ভাবে দমন করতে পারবেন, সেদিন এবং মাত্র সেদিনই তাঁর মধ্যে একটা নূতন সম্ভাবনা দেখা দিবে।

মন যখন তরুণ, চিত্তবৃত্তি যখন চঞ্চল বিপদ তখনই। এমন আশা করা অসম্ভব হয়ত নয় যে কোথায় তাঁর ব্যর্থতা শওকত ওসমান তা খুব শীঘ্রই উপলব্ধি করতে পারবেন এবং অতীতে তাঁর অধিকাংশ কাব্য-প্রচেষ্টাকে তিনি একটু স্নেহসিক্ত সংশয়ের দৃষ্টিতেই দেখবেন।

অথচ যখন কবি হিসেবে শওকত ওসমানের প্রথম আবির্ভাব আমরা তখন চমকে উঠেছিলাম। প্রথম রচনাই যাঁর এমন, উত্তরকালে কাব্যক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য নিঃসংশয়িত একথাই তখন আমাদের মনে হয়েছিল।

প্রায় বছর তিন আগে 'বুলবুল' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'দিনের কবিতা' আমার বিশেষ ভাল লেগেছিল। ভাব-ঐশ্বর্য্যে, প্রকাশের স্বচ্ছতায় এবং কল্পনার মাধুরীতে বাস্তবিকই এই কবিতাগুলি স্মরণীয়:

ফাল্গুনের শেষে আজ চাষীদের কর্ম কোলাহল;
 শুয়ে শুয়ে খামারের একধারে জীবনের দিকে দিগন্তরে
 কি যে লিখিতে চাই দিশা নাহি মেলে।
 অন্ধকার রাত্রি শেষে শুকতারা সম শুভ্র দীপ জলে
 আজ আর পৃথিবীকে দেখিবার কোন সাধ নাই।'
 (খামারের দিন-বুলবুল)

'আর কত সন্ধ্যা যাবে
 শতাব্দীর বন্দরে বন্দরে নৌঙর করে
 আর কত সন্ধ্যা যাবে
 তখন তুমি আমি নেই।'
 (অনাগত দিন-বুলবুল)

কবিরূপে শওকত ওসমান প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন, কি পারবেন না; কোনটাই এখন ঠিক করে বলা যায় না। এদিক দিয়ে তাঁর সম্ভাবনা এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু আশা করবার মত প্রতিশ্রুতিও তিনি এ পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই।

তবে সৌভাগ্যের কথা এই, গদ্য লেখক হিসেবে শওকত ওসমান ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন। কথাসিল্পীরূপে তাঁর সম্ভাবনা প্রচুর। বাংলা মুসলমান সাহিত্যের দৈন্য এখন কিছু কিছু পূরণ হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে যে জোয়ার আসতে পারে তার সম্ভাবনা আজকে আর ততটা নিস্পৃত নয়।"

সওগাতের ২৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় মহিলা সংখ্যারূপে। এই সংখ্যায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনে অধ্যাপক বেগম শামসুননাহার মাহমুদ লেখেন “রবীন্দ্রনাথ” শীর্ষক ক্ষুদ্র নিবন্ধ (২৪:১, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮)। নিবন্ধটি বেগম শামসুননাহার মাহমুদের স্বচ্ছ চিন্তার পরিচয়বহ। রবীন্দ্রপ্রতিভার কয়েকটি মূলসূত্র এখানে নির্দেশিত :

“প্রাচ্যের সাধনা ত্যাগসর্বস্ব আর পাশ্চাত্যের সাধনা ভোগসর্বস্ব। এই দু'য়ের সমন্বয় পূর্বের আইডিয়ালিজম্ এবং পশ্চিমের রিয়ালিজম্, এই দুটোর মিলন—এই-ই তাঁর জীবনের মূল কথা, তার সাহিত্যের মূলস্বর। কি শিক্ষায়, কি সভ্যতায় সর্বত্রই তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের মিলন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, সভ্যতার ক্ষেত্রে—এ দু'য়ের মিলন না হলে কিছুতেই আসতে পারে না সার্থকতা একথা তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন।”

প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শ যেমন করেছে তাঁকে আকর্ষণ, তেমনি তাঁর কবি-মানস অজানা নূতন অনির্দেশের পানে পাখা মেলেছে চিরদিন—‘নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে’ হয়েছে তাঁর প্রতিভার নিত্য জাগরণ।

প্রাচীনকালে কবিদের কাব্যরচনার উদ্দেশ্য থাকত রসসৃষ্টি। কিন্তু আধুনিক কাব্য শুধু রসসৃষ্টি নয়—সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমালোচনা। আধুনিক কালের কাব্য পাঠক খুঁজে পান নিজের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের চিত্র—নিজের জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান চেষ্টা। বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথও তাই দক্ষ জীবনসমালোচক। তিনি মানবতার কবি। শুধু কল্পলোকেই তিনি পরিভ্রমণ করেন নি; মানুষের জীবনের শতবিধ সমস্যা তাঁর চিন্তকে করেছিল আলোড়িত। কল্পনা আর সত্য, স্বপ্ন আর বাস্তব জড়াজড়ি করে বাসা বেঁধেছে তাঁর সাহিত্যে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৈচিত্র্যের তুলনা নেই। জীবনের বিচিত্র রসের প্রকাশ এর বিশেষত্ব। বিভিন্ন প্রকৃতির রসপিপাসু মন এই বিচিত্র সাহিত্যে আনন্দের খোরাক খুঁজে পাবেন। দার্শনিকের কানে এর আধ্যাত্মিকতার সুরটি বাজবে প্রধান হয়ে, কবী পাবেন এর মধ্যে খুঁজে কর্ণের প্রেরণা, প্রেমিকের কাছে এ’অনবদ্য প্রেমের ইতিহাস। এমন কি—ছোট শিশুটিও বাদ পড়েনি, তার মনের মণিকোঠার গোপন কথাটি তিনি টেনে বার করেছেন এবং সঞ্চয় করে রেখেছেন তাঁর সাহিত্যে।

দেশে স্বাধীনতার বাণী নূতন করে প্রচারিত হয়েছিল এ যুগে ঠাকুর বাড়ী থেকে। সেই আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে রবীন্দ্রনাথ নারীর নিশ্চেষ্টতাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

“তোমরা বলিয়া থাক ধরাপ্রাপ্ত ভাগে,
শুধু ভালবাস; জান না বাহিরে বিশ্বে গরজে সংসার।”
(রাজা ও রানী)
“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?”

এই কথাগুলিতে যে গভীর বেদনা সূচিত হয়েছে তার পরিচয় তাঁর সাহিত্যে বারে বারে আত্মপ্রকাশ করেছে। ‘চিত্রাঙ্গদা’য় দেখতে পাওয়া যায় নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা; কি সুন্দর ঝঞ্ঝু ও বলিষ্ঠ তঙ্গীতে তাঁর মানসকন্যা বলেছে :

“দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী;
 পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি নহি।
 অবহেলা করি পুথিয়া রাখিবে পিছে সেও আমি নহি।
 যদি পার্শ্ব রাখ মোরে সঙ্কটের পথে
 দুরূহ চিন্তার যদি অংশ দাও, আমার পাইবে
 তবে পরিচয়।”

রবীন্দ্রনাথ নেই। তিনি বলেছেন—

“কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
 তাহার পানে অত নজর কেন?
 পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
 সবার আমি এক বয়সী জেনো।” (ক্ষণিকা)

দীর্ঘ এক শতাব্দীর কাছাকাছি কোটি কোটি ছেলে এবং বুড়ো তাঁকে কাছে পেয়েছিল, তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করেছিল। ‘Great men live not in years, but in their deeds’ — শুধু বছর গুণেই মহাপুরুষদের বয়সের হিসেব করা চলে না, তাঁরা বেঁচে থাকেন তাঁদের কাজের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের অমূল্য জীবনের স্পন্দন আশিটি বছরের মধ্যে জেগে থাকলো—আরো জেগে থাকলো তাঁর সাহিত্যে। মানুষ হয়তো যুগে যুগে নতুনতর আদর্শের সন্ধান করবে, তাহ’লেও রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করবে না কোন দিন।”

আকলিমা খাতুন ‘আধুনিক মুসলিম সাহিত্য’ (২৪:১) প্রবন্ধে লেখেন :

“মুসলমান চিরদিন বুদ্ধির প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিলেও কালক্রমে সে বুদ্ধিমুজ্তিকে অবিশ্বাস করতে লাগল। তার ধর্মের ব্যাপারে সে আপাতত মধ্যযুগের খৃষ্টানপাদরীদের মতই অন্ধ হতে চায়। মধ্যযুগের পাদরীরা অবশ্য অনেক সময় ইচ্ছে করেই অন্ধ হত, কারণ তাদের হাতে গির্জা সংক্রান্ত বহু সম্পত্তি থাকত। আমাদের সৌভাগ্য এই যে মসজিদ বা অনুরূপ ধর্মকেন্দ্রের হাতে তেমন কোনো বৃহৎ সম্পত্তি যেয়ে পড়েনি। ফলে ধর্মের কুসংস্কার ছাড়ানো আমাদের দেশে ইউরোপের তুলনায় নিশ্চয় অনেক সোজা। যদি কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যের কোনো মূল্য থাকে সে আমাদের এই বুদ্ধিমুজ্তির ব্যাপারে। তিনি নির্ভয়ে মুক্ত বুদ্ধিকে আহ্বান করেছেন। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবু সঈদ আইয়ুব প্রমুখ লেখকদের মধ্যে এই আন্দোলনেরই বিকাশ দেখা যায়। তবে এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে পাশ্চাত্য দর্শনের কাছ থেকেই পাঠ নিয়েছেন।

মনে হয়, বুদ্ধিমুজ্তির ফলেই মুসলমানদের মধ্যে একদল তরুণ সাহিত্যিকের উদয় হয়েছে যারা পাশ্চাত্য জড় দর্শনকে পুরাপুরী স্বীকার করে নিতে বাধ্য। আমার ধারণা এঁরা সমাজকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে স্থিরসংকল্প, কিন্তু এঁরা সাহিত্য ও সমাজকে বর্তমান জগতের ইতিহাস ধারার সাথে যোগ করতে চান। সোজা কথায় সাম্যের ভিত্তিতে এঁরা সমাজকে গড়ে নিতে চান, ধর্মের মতামত নিয়ে ***এঁরা তাই তর্ক-বিতর্কে উৎসাহিত নন। ধর্মকে এঁরা সমাজ গঠনের উপায় বলে মনে করেন। যতদূর চোখে পড়েছে এবং যতদূর আমার ধারণা আবু জাফর শামসুদ্দিন, আবুল হোসেন, আবু রুশদ, শওকত ওসমান, আহসান হাবীব, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ সাহিত্যিকেরা এই পথের পন্থী। এঁদের গদ্য লেখা ভারি সতেজ, কিন্তু এঁদের কবিতা কেমন যেন ধোঁয়া

ধোঁয়া অবাস্তব ও অদ্ভুত লাগে। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই পুরানো কবিতা পড়তে যেয়েও আর ভালো লাগে না। আধুনিক কবিতা পড়তে যেয়ে কেবলি মনে হয়, কী যেন হওয়া উচিত ছিল, কী যেন হল না। সত্যি বলতে কি বাংলা কবিতা পড়ার সেই পূর্বকার উৎসাহ আমার চলে যাচ্ছে, পুরানো কবিতাও কেমন যেন জোলো মনে হয়, নতুন কবিতায়ও বাচালতা ছাড়া কিছু দেখতে পাইনে। হয়ত আমারই দূর্ভাগ্য। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, বর্তমানকালে বাঙালী মুসলমান মেয়েরা আধুনিক কবিতা লিখতে-পারবে না, অন্তত পারা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নয়। আধুনিক কবিতা লেখার মত বিদ্যা-লাভ যে-সব মেয়েদের ভাগ্যে ঘটে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নিরাশামূলক বা সমাজভঙ্গি বিশিষ্ট কবিতা লিখতে দেয় না। তবু যদি কেউ এ-দিক দিয়ে সফল হয় কোনোদিন সে শুধু সম্ভব হবে নিছক মননশক্তির জোরে কিংবা কিছুদিন পরে যখন তাদেরকে চাকুরী বা অনুরূপ কোনো উপার্জনের পথ খুঁজতে হবে।”

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কয়েকজন মহিলা বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকের পরিচয়-প্রসঙ্গে হোসনা বানু খানম লিখেছেন ‘বিজ্ঞান ও সাহিত্যে নারীর দান’ (২৪:১) শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধে তিনি বিজ্ঞানে কুরী-দম্পতি, বিশেষত মাদাম মেরী কুরী, এবং তাঁদের কন্যা ও জামাতা ইরেন কুরী ও ফ্রেডরিক জোলিও-র অবদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, এঁরা সবাই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দু’জন মহিলার অবদান আলোচিত হয়েছে প্রবন্ধের শেষাংশে। এঁরা হলেন স্বেইডেনের সেলমা ল্যাগার্লফ (১৯০৯) ও পার্ল সিডেনস্ট্রিকার বাক (১৯৩৮)।

এই সংখ্যায় (২৪:১) হামিদা খাতুন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাহিত্যের একটি প্রায় অনালোচিত শাখার প্রতি। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ‘আমাদের শিশু সাহিত্য’। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি নীচে উদ্ধৃত হল:

“অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় আমাদের সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সাহিত্যের বহু শাখায় আমরা এখনও পশ্চাতে পড়িয়া আছি। আমাদের শিশু-সাহিত্যের অবস্থা বিশেষ করিয়া শোচনীয়। বড় হোক, ছোট হোক, পরিণত মনের খোরাক আমাদের সাহিত্যে আছে। আমাদের কাব্য জগৎ-জোড়া সম্মান লাভ করিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের কবিতা বহু বিদেশী সাহিত্যে অনূদিত হইয়াছে। উপন্যাসও আমাদের অনেকটা উন্নত। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের খ্যাতিও বহু-দূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কথা-সাহিত্যও আজ আমাদের অবিকশিত নয়। অনেক ভাল ভাল গল্প বাংলা সাহিত্যে আজ কাল আমরা পড়িতেছি। জীবনী ও প্রবন্ধ রচনায়ও বাংলা সাহিত্যের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: আমাদের শিশু-সাহিত্য আজও গড়িয়া ওঠে নাই।

পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যে শিশুদের জন্য অনেক ভাল ভাল বই রচিত হইয়াছে। রবিনসন ক্রুসো, গালিভারস্ ট্রাবেল, ডন্-কুইক্সোট প্রভৃতির নাম আজ শুধু দেশ-বিদেশে পরিচিত নয়, এই সমস্ত বই অনূদিত হইয়াও সকল দেশের শিশুমন জয় করিয়াছে। আরব্য উপন্যাসের কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। শিশু-সাহিত্যে উহার তুলনা নাই। বহু ভাষায় এই বইটির অনুবাদ হইয়াছে। শিশু রসিক মহলে ইহার কদর দিন দিন বাড়িতেছে। একথা ঠিক যে স্বেইফট সারভেণ্টেসের মত প্রতিভার জন্য প্রতিদিন আশা করা যায় না। আমরা বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর উঁচু স্তরের রচনা পুঞ্জ পুঞ্জ পাইব এ অসম্ভব আশার কথাও বলিতেছি না। আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, ইহার চেয়েও আরও স্বল্প প্রতিভাদীপ্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশু সাহিত্য আজও আমাদের দেশে গড়িয়া উঠে

নাই। হিন্দু ও মুসলমান সকল সাহিত্যিকদের সম্পর্কেই এ কথা বলা যাইতে পারে। বাংলার শিশু সাহিত্যের দুরবস্থা অত্যন্ত বেদনা-দায়ক, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সাধারণভাবে একথা হিন্দু সাহিত্যিকদের বেলায় যেমন সত্য মুসলমানের বেলায় তাহা আরও বেশী সত্য। মুসলমান সাধারণভাবে আজ বাংলা সাহিত্যে অনগ্রসর। মুসলমানের কাব্য এবং প্রবন্ধ রচনা কিছু কিছুটা হইয়াছে সত্য কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য দিকে এখনও আমরা তেমন বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারি নাই। কথা-সাহিত্যেও আজ আমাদের আশার সঞ্চার হইয়াছে। একদল নূতন সাহিত্য-শিল্পীর লেখায় আজ আমাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের সব চাইতে বড় অভাব আজ আমরা আমাদের শিশু-সাহিত্যে লক্ষ্য করিতেছি। অনেক মুসলমান নামকরা সাহিত্যিক শিশু রচনায় হাত দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বিশেষ করিয়া অনুবাদের ভিতর নিজেদের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এ কথা বলা অন্যায় হইবে যে আমাদের অনুবাদ করিয়া কোন লাভ নাই। বলিতে কি, আজ আমাদের বিদেশী ভাষা হইতে সর্বপ্রকারে বেশী করিয়া শিশু-সাহিত্য অনুবাদেই মনোনিবেশ করিতে হইবে। তবে অনুবাদ যেমন চাই তেমনই দেশের মাটি ও নাড়ীর সাথে শিশু-সাহিত্যকে গভীরভাবে সংযুক্ত করিতে হইলে মৌলিক রচনায়ও হাত দিতে হইবে। এক কথায় আমাদের শিশু-সাহিত্যে সর্বপ্রকার চেষ্টায় আজ মনোনিবেশ করিতে হইবে। আশানুরূপ না হইলেও আমাদের চাইতে হিন্দু সাহিত্যিকরা এদিকে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন। তাহাদের তুলনায় আমাদের শিশু-সাহিত্য আজ নগণ্য।

শিশু-সাহিত্যকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া উচিত আজ আমরা তাহা দেই নাই বা দিতে পারি নাই। ইহাতে আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাও আমরা হিসাব করিয়া দেখি নাই। এদেশে অনেক শিশু পুষ্টি-কর খাদ্য ও উপযুক্ত মাতৃস্বন্যের অভাবে অকালে মারা যায়। কিন্তু এধরনের অকালমৃত্যু আজ আমাদের সাহিত্যেও দেখা দিয়াছে। উপযুক্ত শিশু-সাহিত্যের অভাবে আমাদের শিশুমন সাহিত্যের প্রেরণা হইতে বঞ্চিত হয়। শিশু-তরুর জন্য যেমন আলো হাওয়ার প্রয়োজন, তেমনই শৈশবে শিশু মনের জন্য উপযুক্ত খাদ্য চাই। এ খাদ্য না হইলে সাহিত্যিক মনের জন্য ও বিকাশ হয় না। মনে মনেই আমাদের শৈশবে সাহিত্যের অকাল মৃত্যু হয়।

ইহার ফলাফল আমাদের সাহিত্যেই আজ দেখিতে পাইতেছি। আমাদের সাহিত্য আজও বড় হইল না ইহার অনেক কারণ আছে। কিন্তু ইহার অন্যতম কারণ, ছোট হইতে আমরা শিশুদের মনোভূমিতে সাহিত্যের আবাদ করি নাই। আমাদের দেশের অনেক ছেলে ভবিষ্যতে বড় বড় কবি সাহিত্যিক ও শিল্পী হইতে পারিত কিন্তু তাহাদের মন প্রথম হইতেই সাহিত্যরস হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে বলিয়াই তাহা হয় নাই।

ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা অনেক সোনার ফসল হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদের শিশুসাহিত্য বড় নয়। এজন্য আমাদের মনোযোগ ও চেষ্টা অত্যন্ত কম। আমাদের শিশুরা আজও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। যে সব প্রতিভা শতদলের মত একদিন বিকশিত হইয়া বিচিত্র রসে, রঙে ও সৌরভে দেশ আমোদিত করিতে পারিত, তাহা যত্নের অভাবে অকালে ঝরিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। এজন্য অনেক কিছুর প্রয়োজন, উপযুক্ত শ্রী শিক্ষা প্রভৃতি অনেক কিছুই চাই। মাতৃস্বন্যের মত সাহিত্যের রসও শৈশবে পরিবেশন করার ভার লইতে হইবে। এসব আমরা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এজন্য আমাদের সাহিত্যের উন্নতি হয় নাই।

কথাটা আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। শিশুরা ছড়া গান ভালবাসে। সানন্দে তাহারা এসব গায়। ইহা যে কেবল তাহার মনে সাময়িক আনন্দ দান করে তাহাই নয়। এই ছড়া গান গাঁথা প্রভৃতি তাহার ভাবীকালের কবি-প্রতিভাকেও জাগ্রত করার কাজে অনেকখানি সাহায্য করে। ভাল ছড়া, গাঁথা প্রভৃতি যদি শিশুরা শিখিতে পারে তবে তাহার কবিমনও পুষ্ট হয়, ইহাতে সে ভাবীকালের বড় কবি হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করে। পরীর গল্প, পক্ষী-রাজ ঘোড়া, সফেদদেওএর কাহিনী, রাজপুত্র-রাজকন্যা, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প তাহার মনকে কল্পরাজ্যে লইয়া যায়। এসব গল্প পড়িয়া তাহার মন কল্পনাপ্রবণ হইতে শিখে। য্যাড্‌ভেঙ্কারের নেশায় তাহার শিশুরক্ত আনন্দে নাচিতে থাকে। এখানেই এগুলির প্রভাব বেশী হয় না। এসব গল্প কাহিনীর অনুকরণে শিশুরাও গল্প রচনা করিতে শিক্ষা করে। ভাবীকালের ঔপন্যাসিক, কথা-সাহিত্যিক এই ভাবেই জন্মলাভ করে।

কেবল সাহিত্য নয়, আমাদের শিল্প, আমাদের রাজনীতি এবং দুঃসাহসিকতার সহিত বড় বড় উদ্দেশ্য সাধনার সাথে শিশু সাহিত্যের যোগ রহিয়াছে। ছোটকাল হইতেই য্যাড্‌ভেঙ্কারের প্রেরণা সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার কাজে শিশু সাহিত্যের দাম অনেকখানি। শিল্প-বোধ শৈশবেই জাগ্রত করিতে হইবে; সাহসের কাজে, বীরত্বের কাজে প্রেরণা বাল্যকাল হইতে সকলের মনে সঞ্চারিত করিতে হইবে।

একথা সত্য নয় যে, একমাত্র শিশু-সাহিত্য ভিন্ন অন্য উপায়ে ইহা সম্ভব নয়। ভাল কাজের আদর্শ স্থাপন করিয়া শিশুদিগকে এসব শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু সব চাইতে এসব প্রেরণা সাহিত্যের অর্থাৎ শিশু সাহিত্যের সাহায্যে দেওয়া সম্ভব। ইহা যেমন সহজ, তেমনি ইহার ক্রিয়াও দীর্ঘকাল স্থায়ী।

আমাদের সাহিত্যের দৈন্য এবং জাতীয় জীবনে আমাদের পরাভব প্রভৃতি লইয়া দেশে চিন্তা ভাবনার অবধি নাই। এ খুব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সঙ্গে এ সময় শিশু-সাহিত্যের দিকেও আমাদের মনোনিবেশ করিতে হইবে। ভাল শিশু-সাহিত্য রচনা ও শিশুপাঠ্য পুস্তকের উন্নতি সাধনে মনোযোগ দিতে হইবে। যদি আমরা এদিক দিয়া সাফল্য অর্জন করিতে পারি, তবে আমাদের সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি সকল কিছুতেই তাহার সুন্দর ও সবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।”

এয়াকুব আলী চৌধুরীর পরলোকগমনে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী একটি দীর্ঘ আবেগ-ময় প্রবন্ধ লেখেন ‘মরহুম এয়াকুব আলী চৌধুরী’ নামে (মাঘ ১৩৪৭, পৌষ ১৩৪৮, বৈশাখ ১৩৪৯) প্রবন্ধে সমকালীন সাহিত্য ও সমাজ পরিবেশের পরিচয় আছে। দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে প্রবন্ধকার লেখেন:

“স্বদেশের পরাধীনতার লাঞ্ছনা চৌধুরী এয়াকুব আলী তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যের শেষ সাফল্য সন্দেহে তিনি সন্দেহান ছিলেন, যদিও তাঁদের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করতে তাঁকে রাজী দেখা যায়নি কোনোদিন। বরং বিপ্লবীরা অনেকক্ষেত্রে যে-আশ্চর্য আদর্শ-নিষ্ঠা এবং চরম ত্যাগের দাবীর সামনেও নির্ভীক আন্তরিকতা দেখিয়েছেন, তার প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁদের অবলম্বিত পথ একভাবে সোজা বুঝতে পেরেও তার লক্ষ্যগামিতা বা স্থায়ী উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি অনেকখানি অবিশ্বাসী ছিলেন। তাই গোড়া থেকে কাজ আরম্ভ করাই তিনি কর্তব্য ভেবেছিলেন। উদার, অসাম্প্রদায়িক, নির্মুক্ত ও নীতিনিষ্ঠ মনুষ্যত্ব দেশ বলীয়ান না হলে তার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আশা নেই কিম্বা সেই স্বাধীনতাকে স্থায়ী ক’রে

তাকে জনগণের মঙ্গলে নিয়োজিত করবার সম্ভাবনাও নেই, —এই ছিল তাঁর অতিবড়ো কঠিন প্রত্যয়। এরই বশবর্তী হয়ে তিনি শিক্ষকের পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছিলেন। পরাধীন রাষ্ট্রের পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আওতায় মুমুকু মানবতা মুছিত হয়ে পড়ে; কেননা মানুষের মনকে মেরে না রাখলে,—তাকে ক্ষুদ্র, স্বার্থপর এবং প্রতিবেশীদ্রোহী করতে না পারলে পরশাসন কোথাও শিকড় গাড়তে পারে না, এই বুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি পরদেশী শাসকের পক্ষে অত্যন্ত সহজলভ্য। এবং এজন্যে তার ব্যবস্থিত শিক্ষাও সাধারণতঃ একেবারে মারাত্মক। চৌধুরী এয়াকুব আলী চেয়েছিলেন এই প্রাণঘাতী শিক্ষার আনুষঙ্গিক মারক-তার ফাঁকে ফাঁকে নিজের অনাবিল অন্তরের মৃতসঞ্জিবনী সুধা ঢেলে জাতিকে—দেশকে বাঁচিয়ে তুলতে। তাঁর এই অত্যন্ত অর্থপূর্ণ সাধনার প্রথম ক্ষেত্ররূপে তিনি বেছে নিয়েছিলেন চট্টগ্রামকে। চাটগাঁর অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তার মাটির স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর রস মানুষকে অদ্ভুতভাবে সাহসী, কর্মক্ষম এবং নিঃপরাজয় ক'রে তোলে। হয়তো এই জনেই তিনি ভেবেছিলেন: এখানে নীতিনিষ্ঠা, উদারতা, স্বাদেশিকতা এবং রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি-কামনার বীজ তরুণ-হৃদয়ে বপন করতে পারলে তার ফল হবে অমোঘ।

কিন্তু তা হ'লেও কর্মী এয়াকুব আলীর সঙ্কল্প বা উদ্দিষ্টের প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ বা আনুগত্য কখনো শিথিল হয়নি। দৃষ্টিশক্তির ক্রমবর্ধনশীল ক্ষুণ্ণতা নিয়ে—বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ত্যাগ ক'রেও তিনি মানবের মানসিক উন্নোদনের ব্রত পালনে কখনো বিমুখ হননি। রাজনৈতিক জনজাগরণের আলোড়নে তিনি যোগ দিয়েছেন; অসংখ্য রাজনৈতিক সভায় তাঁর অদ্ভুত প্রাণশিহরণ বাণী বার বার উচ্চারিত হয়েছে। সে-বাণী এমন আশ্চর্য্য ওজস্বিতায় পরিপূর্ণ—এমন গভীর আন্তরিকতায় প্রদীপ্ত যে, যিনি স্বকর্ণে তা না শুনেছেন, তাঁর পক্ষে তার অসাধারণত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। তাঁর সব কর্মে—সমস্ত প্রচারে তিনি চেয়েছেন হীনতার পক্ষে নিমজ্জিত মনুষ্যত্বের সমুন্নয়ন। পরাধীনতায় যদি আমাদের ভাগ্য সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, যদি আমাদের আত্মিক ও মানসিক মৃত্যুর সম্ভাবনা ঘটে থাকে, তার প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই,—এই ছিল তাঁর বক্তব্যের সার মর্ম। পরদেশী শাসনের তীব্র সমালোচনা হয় তো তিনি করেছেন; কিন্তু তাতে বিদ্বেষ ছিল না; ছিল খেদ, ছিল বেদনা, ছিল আত্ম অন্তরের গভীর ঝঙ্কার, আর ছিল দেশবাসীর মুমূর্ষু মনুষ্যত্বের প্রতি একটা আকুল আহ্বান। যে-ত্যাগ, যে-নিষ্ঠা, যে-অকুতোভয় অতলস্পর্শী পৌরুষ ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিপুল বিভব, তাঁর কর্মী জীবনেও তার প্রকাশ হয়েছিল একেবারে অনবদ্য। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে যে-পুণ্যব্রত তিনি স্বীকার করেছিলেন, অন্যখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি একটুও। তাই রাজনৈতিক ছল্লোড়ের অধীর আবর্তের মধ্যেও তিনি থাকতে পেরেছিলেন ধীর স্থির অচঞ্চল সৌন্দর্য-শতদলের মতো স্নিগ্ধ মধুর অবদানে লোভনীয়। দৃষ্টের লীলাক্ষেত্রে রাজনীতিতে এসেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বে সমাসীন ছিলেন, বহু বিষমবিড়ম্বিত তরুণকে তাদের অনাগত কর্মসাক্ষ্যের প্রমূর্ত ইঙ্গিতরূপে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

বস্তুতঃ চৌধুরী এয়াকুব আলীর কর্মজীবনের নিজস্বতা এইখানে। ধ্বংসোন্মুখ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে চরম সঙ্কট ও দুর্গতির গ্রাস থেকে বন্ধুদের সহযোগে তিনি কি কঠিন প্রয়াসে বাঁচিয়ে এনেছিলেন, মানুষের মানসিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনের অবিচল আশা নিয়ে কী অসীম স্নেহ-যত্নে তার বিপন্ন অপ্ৰচুর গ্রন্থাগারটিকে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, তা আমরা জানি। এজন্যে ঘারে ঘারে তাঁকে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে ধুরতে হ'য়েছে কিন্তু সবখান থেকে দান তিনি পাননি। কোথাও পেয়েছেন পৃষ্ঠপোষণ, কোথাও প্রতারণা, কোথাও তিরস্কার, কোথাও সন্দেহ, কোথাও-বা বিদ্বিষ্ট প্রত্যাখ্যান। সবই তিনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেছেন। নির্বোধ কটুক্তি শুনে বা ভীকু সংশয়ের অভিব্যক্তি দেখে চৌধুরী এয়াকুব আলী যে কখনো রুগ্ন হননি, তা নয়; কিন্তু সব

সময়েই তাঁর রুগ্নতার উপরে তিতিক্ষাকে জয়ী হতে দেখেছি। বস্তুতঃ মানুষের ক্ষুদ্রতা দেখে তিনি দুঃখিত হলেও ক্রুদ্ধ ভ্রমসনায় তার পরিণতি ঘটেনি কোনোদিন। আহত হয়ে বরং তাঁকে নীরব হতে দেখেছি। বেদনার সে-মৌন প্রকাশ যেন বিশ্বপ্রভুর উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তরের এক পরম প্রার্থনা, যে-প্রার্থনা মরুদেশের সেই সুপরিচিত মানব-বন্ধুর আর্ত অন্তর ভেদ ক'রে একদা উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল : এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা করো! এই ধরণের এক-একটি মহামহুর্তে যখন আমরা চৌধুরী এয়াকুব আলীর সঙ্গী হয়েছি, মনে হয়েছে, যেন তুচ্ছ ধূলি-মাটির পৃথিবী ছেড়ে আমরা বেশ খানিক উচ্চতায় আরোহণ করলাম।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবার ক্ষেত্রেও তাঁর এই বৈশিষ্ট্য স্বপ্রকাশ হয়েছে। একথা আজ নির্ভয়ে বলতে পারি যে, ধর্ম-সাধক এবং সাধু-জীবনের প্রচারক হিসেবে যদি আমরা এখানে তাঁকে না-ও পেতাম, তথাপি মানব-মঙ্গলের মহাব্রত ছাড়া অন্য কোনো পন্থার পূজারী তাঁকে কোনোমতেই দেখতাম না। বস্তুতঃ জগৎকে মহত্বে মহান, গৌরবে গরিষ্ঠ এবং মনুষ্যত্বের বিপুলতায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলবার যে-আকাঙ্ক্ষা বার বার পরাজিত হয়েও তার শক্তির অদ্বুত অমৃতে ইতিহাসের বুক চিরে অন্ধান হয়ে আছে, প্রকৃতির স্নেহ-স্বধায় পরিপুষ্ট তার একটা মূর্ত প্রতীক ছিলেন আমাদের চৌধুরী এয়াকুব আলী। ব্যক্তি হিসেবে তাঁর নিকটবর্তী হয়ে মানুষ পরমাত্মার পক্ষপুষ্টের আশ্রয় পেতো, বন্ধু হিসেবে তাঁর প্রীতি অর্জন ক'রে এক অন্তহীন ক্ষমাসুন্দর স্নেহে অভিষিক্ত ও উন্নীত হতো, কর্মীরূপে তাঁর সাহচর্য লাভ ক'রে পুরস্কার প্রত্যাশাহীন এক অপূর্ব নিবেদিত চিন্তের মঙ্গল আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতো।

ভালোয় মন্দে-মেশা জগতের এক প্রান্তে প্রকৃতির বুক চিরে জেগে উঠেছিল একটা কল্যাণপাদপ; আলোয়-আঁধারে মেশা ধরিত্রীর অনিবার্ণ আশা হয়ে জলে উঠেছিল একটা মঙ্গল-গাণিক;—সে আমাদের এই চৌধুরী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী!”

সৈয়দ আলী আহসানের ‘রোহিনী’ (২৪ : ৮, আঘাট ১৩৪৯) ‘সওগাতের’ একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল প্রবন্ধ। প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিনী চরিত্র বিশ্লেষণে সৈয়দ আলী আহসান বিশিষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল :

“প্রেম ও রূপমোহে বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে প্রচুর। সৌন্দর্য্যও যে ইহাদের মধ্যে নাই তাহাও বলা চলে না, কেননা প্রেমের অবস্থাতেও এক প্রকারের মোহেরই প্রকাশ থাকে, অবশ্য সেই মোহ সময়ে প্রেমে উন্নীত হয়। উভয় পিপাসাই নারীকে কেন্দ্র করিয়া, অন্ততঃপক্ষে ঔপন্যাসিকের উপজীব্য যে প্রেম অথবা রূপমোহ তাহা নারীকে কেন্দ্র করিয়া বটেই। উভয় পিপাসাই যদি একই চরম প্রবৃত্তি না হইয়া, পৃথক পৃথক মানসিক প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়ায় তবে স্বপ্নের সূচনা হয়, সংশয়ও স্বতঃই প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে। ‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’র ট্রাজেডীর মূল ঝুঁজিতে হইবে এই দু’য়ের দ্বন্দ্বসংশয়ের মধ্যেই। গোবিন্দলালের অন্তঃকরণে রূপলালসা প্রবল ছিল, কিন্তু প্রেমকে সে চিরদিন গ্রাহ্য করিয়াছে। মোহগ্রস্ত হইবার পূর্বে যে গোবিন্দলালকে আমরা ভ্রমরের নিকটে দেখি, সে আত্মস্থ, সে উচ্ছৃঙ্খল নয় কিন্তু মোহ যখন আসিল তখন সে প্রলোভন-উন্মুখ, পূর্ণ-যৌবনের “উন্মিলিত সাগর তরঙ্গতুল্য প্রবল” মনোবৃত্তির প্রবাহে সে ভাসিবার উপক্রম করিয়াছে। রূপতৃষ্ণা তাহার ছিল, তাহা পরিতৃপ্ত কখনো হয় নাই ইহাও সত্য, কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, ভ্রমরের শান্ত, স্থির, অবিচল প্রীতির প্রসন্নতা তাহাকে পুণ্যের পথে লইয়া যাইতে পারিল না কেন? দোষ কি ভ্রমরের না গোবিন্দলালের, না গোবিন্দলাল শুধু অমোঘ-নিয়তির বশবর্তী হইয়া মনুষ্যধর্ম্ম পালন করিয়াছে? ভ্রমরেরও দোষ ছিল গোবিন্দলালও

অনেক অন্যায় করিয়াছে; নিয়তির দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না। রোহিণীকে লইয়াই যখন এই ট্রাজেডীর স্রষ্টি, রোহিণীর দায়িত্ব এখানে তাই স্বতঃই দৃশ্যমান। রোহিণী কিন্তু প্রথমে গোবিন্দলালকে ডুলাইবার চেষ্টা করে নাই, ঘটনা-পরম্পরায় পরস্পর পরস্পরের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে।

রোহিণী রূপসী ছিল। শুধুমাত্র রূপসী বলিলে অন্যায় হয়, “রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল, শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ”—সে বালবিধবা। তাহার ব্যর্থ রূপ, বঞ্চিত যৌবন, সঙ্গীহীন জীবন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সমস্তই আমাদের গভীর সহানুভূতির উদ্রেক করে। এ সহানুভূতি তাহার সহজপ্রাপ্য। হরিদ্রাগ্রামের রোহিণীকে আমরা দেখি ভাগ্যবিড়ম্বিতা যুবতী রূপে, সে তাহার অসামান্য রূপ, অতৃপ্ত যৌবন ও নানা সম্ভাবনাময় জীবনকে সমাজের যুপকাঠে বলি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। রোহিণীর যে চরিত্র-চিত্র আমরা উপন্যাসের প্রাথমিক ঘটনা-আবর্তে পাই, তাহাতে রোহিণীর বিফল যৌবনের মর্মব্যথা একান্ত দরদের সহিত চিত্রিত করিবার প্রয়াসই দেখি, বঙ্কিমচন্দ্র যেন এই পরম রূপলাবণ্যময়ী রমণীমূর্ত্তি স্রজন করিয়া নিজেই তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন: “আবার কুহুঃ কুহুঃ, কুহুঃ, রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্মল, অনন্তগগন—নিঃশব্দ অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রসূতিত আম্রমুকুল—কাঞ্চন গৌর, সুরে সুরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল স্নগন্ধ পরিপূর্ণ; কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুণ্ণনে শব্দিত, অথচ কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা।

দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে, ঝাকে ঝাকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কোথাও মোমাছি, কোথাও ভ্রমর, সেই কুহুরবের সহিত সুরবাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমে বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাহার অতি নিবিড় কৃষ্ণ কৃষ্ণিত কেশদাম চক্রে ধরিয়া তাহার চম্পকরাজি নিশ্চিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে, কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিত লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল। এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল কু—উ। রোহিণী কলসী জলে ভাসাইয়া কাঁদিতে বসিল।”

ব্যথিতচিত্তে কলসী জলে ভাসাইয়া রোহিণী কাঁদিতেছে। রোহিণীর সমস্ত ক্রটি বিস্মৃত হইয়া এইখানে তাহার জন্য করুণা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়। আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণের বস্তুও রহিয়াছে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় নাই ইহাই জীবনের ট্রাজেডী। তাহার এমন পূর্ণ যৌবন। নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কোতুহল লইয়া সে বিশ্বরূপ অবলোকন করিতে চায় কিন্তু বৈধব্য তাহার তৃপ্তির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। কত করুণ এই চিত্র: “রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্ম সে জল স্পর্শ করিতে পারিবে না; আশাও নাই।” বৈধব্যের কোনই নিয়ম-শাসন রোহিণী মানে নাই, ইহা সত্য, কিন্তু কার্য্যকারণ পরম্পরায় আমরা দেখিতে পাই যে অসং প্রবৃত্তি বা কুটিলতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। যে নারী হরলালকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, তাহার যেমন হউক একটা ধর্ম্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদা-বোধ আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। অর্থের প্রলোভন তাহাকে লুপ্ত করে নাই। হরলালের বিবাহিত পত্নীরূপে আপনার ব্যর্থ জীবনকে কথঞ্চিৎ সার্থক করিবার আশাতেই সে আসল উইল বদল করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিবার মত দুষ্কার্য্যে স্বীকৃতা হইয়াছিল, অর্থের প্রলোভনে সে ঐ কার্য্যে ব্রতী হয় নাই। রোহিণীর চরম প্রশংসা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই করিয়াছেন একটা মাত্র ছন্দে: “যে জাতি জীবন্তে অলস্ত চিতায়

আরোহণ করিত রোহিণীও সেই জাতীয়া আৰ্য্যকন্যা।” তাহাকে শাসন করিবার কেহ ছিল না, পথভ্রষ্ট হইলে ঠিক পথের সন্ধান দিবারও কেহ ছিল না, কিন্তু তাহার মনে চাঞ্চল্য আনিবার বস্তুর ন্যূনতা কখনও ঘটে নাই। এমতাবস্থায় একজন নারীর পক্ষে আত্মস্থ থাকা কি সম্ভব। রোহিণী যদি নীতিভ্রষ্ট হইয়াও থাকে তবে তাহা স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত হয় নাই।

যে পরিবেষ্টনীর মধ্যে গোবিন্দলালের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাতে তাহার মনে যৌবনস্বলভ বিহ্বলতা আসা বিচিত্র নহে। তাহার মানস-চক্ষে সেই দিন হইতে আঁকিয়া গিয়াছিল—“বাপীতীরবিরাজিত চন্দ্রালোক-প্রতিভাসিত চম্পকদাম-বিনিম্বিত” এক অপূর্ব্ব দুর্লভ “দেবমুষ্টি”। এই চিত্র দিন দিন নানা অনুকূল ঘটনার মধ্যে তাহার হৃদয়পটে গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত হইয়া একেবারে তাহার সর্ব্বকামনার ও সর্ব্ব-দুঃখের মূল হইয়া দাঁড়াইতেছিল। সে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসিক্তা হইল। ধৈর্য্যহীন, আত্মস্থংসকারী প্রেম কখনও ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, ইহার তাড়নায় মানুষের নীতি-বোধ বিনষ্ট হয়, ইহার তাড়নায় মানুষ নিজের ভাগ্য-বিধাতাকে অগ্রাহ্য করিতে শেখে, ইহারই তাড়নায় মানুষ নিজের পূর্ব্বিকে—দুর্ব্বল হইলেও—ন্যায় সঙ্গত বলিয়া ভাবিতে শেখে। রোহিণীও তাহাই করিয়াছিল। আত্মস্থখের কামনা তাহার হৃদয়কে অঁচছন্ন করিয়াছিল। সে ভাবিল : “আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এই পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোন দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবন থাকিতেও কেবল গুহক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল। যাহারা এ জীবনে সকল সুখে সুখী—মনে কর ঐ গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী, তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী—কোন পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? ভ্রমরের প্রতি তাহার ঈর্ষ্যা জন্মিল, ভ্রমরের সুখ তাহার সহ্য হইল না, ঈর্ষ্যার উত্তেজনায়ে সে কতকগুলি গিল্টির গহণা সংগ্রহ করিয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া আসিল যে, গোবিন্দলাল তাহাকে ঐ সমস্ত দিয়াছে। ঈর্ষ্যার মাত্রাধিক্যে ও সুখের অতিরঞ্জিত আশায়, আত্মস্থখান্বেষণে লোলুপ তাহার চিত্ত ভাবিয়াছিল, যে-সুখ তাহার রূপ ও যৌবনের প্রাপ্য, তাহা সে সহজে ছাড়িবে কেন? ভ্রমরের প্রতি সে ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভ্রমরও যে তাহাকে দেখিতে পারিত না, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। রোহিণীর ঈর্ষ্যা তাহার অতৃপ্ত রূপ যৌবনের, রক্তাক্ত অন্তরের বুড়ুকু হৃদয়েরই প্রকাশ; ভ্রমরের ঈর্ষ্যা সাধারণ নারীস্বলভ। ভ্রমরের সবই ছিল—গৃহ ছিল, সংসার ছিল, কান্তিকের তুল্য স্বামী ছিল, এক কথায় জীবনের পরিপূর্ণতার স্পর্শ সে পাইয়াছিল; রোহিণীর ছিল কেবল রিক্ততা, ছিল হা-হুতাস, ছিল নিরানন্দ। এত থাকিতেও রোহিণীর প্রতি ভ্রমরের ঈর্ষ্যা যদি লঘু না হইয়া থাকে, তবে ভ্রমর অন্যায় করিয়াছে বলিতেই হইবে; অপরিণীম রিক্ততা ও মহাবুড়ুকা হৃদয়ে চাপিয়া রোহিণী যদি ভ্রমরের আনন্দময় সংসারের দিকে ক্ষণিক লোলুপ কটাক্ষ করিয়াই থাকে তবে তাহা স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত হয় নাই। ভ্রমর রোহিণীর মৃত্যুকামনাও করিয়াছে :

“ভোমর। বলিল—ক্ষীরি, রোহিণী পোড়ামুখীর কাছে একবার যাইতে পারিবি?

ক্ষীরি বলিল—পারব না কেন? কি বলতে হবে?

ভোমরা বলিল—আমার নাম করিয়া বলিয়া আয় যে—তুমি মর। বারুণী পুকুরে সন্ধ্যাবেলায় কলসী গলায় দিয়ে।—বুঝেছিস?

ক্ষীরি বলিল—আচ্ছা।”

নিম্নস্তরের কামিনীমূলত এই কথা ভ্রমের মুখে নিতান্তই বেমানান হইয়াছে। আশাহীন দুঃখে রোহিণী মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়স্কর মনে করিল। ভ্রমর তাহাকে মরিতে বলিয়াছে গোবিন্দলালও পূর্বে বলিয়াছিলেন—‘রোহিণী মৃত্যুই তোমার বোধ হয় ভাল,’ সমস্ত দিকে চিন্তা করিয়া সে নিজেও তাহার এই ব্যর্থ-জীবন শেষ করিয়া দেওয়ারই সঙ্কল্প করিল। আর বিধা না করিয়া সে বারুণীতে ডুবিতে গেল কিন্তু মরিতে সে পারিল না। সে যখন বারুণীর ‘অন্ধকার জলতল আঁলা করিয়া’ গুইয়াছিল, গোবিন্দলাল তখন তাহাকে উঠাইলেন নতুন মরণে মরিতে। গোবিন্দলাল ‘ফুল্লরক্ত অধরযুগলে ফুল্লরক্ত অধরযুগল স্থাপিত করিয়া রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন,’ রোহিণী সঞ্জীবিতা হইল। গোবিন্দলাল তাহাকে ঔষধ পান করাইলেন, গোবিন্দলালের হস্তপ্রসূত মৃত সঞ্জীবনী সুরা পান করিয়া রোহিণী বাঁচিল।’ সেইদিন হইতে গোবিন্দলালের চিন্তা ও স্বপ্নে রোহিণীর জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট রহিল।

রোহিণীর এই আত্মবৎসকারী প্রেম অথবা grand passion---moral ও নয়, immoral ও নয় হইত বা non-moral। যে ভালবাসার স্পর্শ পাইবার জন্য তাহার হৃদয় বুভুক্ষু হইয়া উঠিয়াছিল, যে প্রণয়ের পাবক-শিখা তাহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছিল তাহা পাপ পুণ্য ন্যায় অন্যায়ের অতীত। গোবিন্দলালের প্রণয়-লিপ্সু এই যুবতী তৃষ্ণাতাড়িত হইয়া যে পথে ছুটিয়া গেল তাহা হইতে ফিরিবার উপায় তাহার আর ছিল না। নিদারুণ যন্ত্রণায় সে যতই ডাকুক না কেন—‘হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখীজনের একমাত্র সহায়, আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর; আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না’, তাহার এই কাতর ক্রন্দন আত্মপ্রবঞ্চনা বলিয়াই পরিগণিত হইবে। যে অগ্নি প্রবল বেগে জলিয়া উঠিয়াছে, ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা আর নির্বাপিত করা যায় না। অমোঘ-নিয়তির ইহা এক ভীষণ মধুর মৃত্তি! এই নিয়তির নাগপাশে মূঢ়চিত্ত ও জর্জরিত হইয়া সর্বশেষে রোহিণীর জীবন-নাট্যের বীভৎস পরিণতি ঘটিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমানস রূপমোহ বা ইন্ড্রিয়ালসার স্মৃতি বহিবিবিক্ষু পতঙ্গের যে নিদারুণ পরিণাম, দীর্ঘ নিশ্বাসের দ্বারা তাহাকেই অর্চনা করিয়াছে। ধর্মকথা, নীতি-উপদেশ ও আত্ম-শাসনের ক্রটি নাই, নিয়তির উপর জয়ী হইবার প্রাণান্ত প্রয়াসও রহিয়াছে, কিন্তু ভয়াবহ পরিণাম রোধ করিবার সামর্থ্য গোবিন্দলালেরও নাই রোহিণীরও নাই। ইহাদের প্রণয় নীতি-নিয়মে বিগহিত হইতে পারে কিন্তু তাহার স্বস্ত্যয়ন চলিতে পারে না।

গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে আদিরসসঞ্চারিত নহে, মানুষ হিসাবে ও নারী হিসাবে জীবনে সে একটু অধিকার চাহিয়াছিল মাত্র; সে গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়াছিল, গোবিন্দলালের নিকট তাহার আত্মসমর্পণ তাই অত্যন্ত সহজভাবে হইতে পারিয়াছিল। কৃষ্ণকান্তের উইলের ট্রাজেডীর অবকাশ ঘটিত না যদি রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালেরও সমপর্য্যায়ের আকর্ষণ থাকিত; কিন্তু রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের যে আকর্ষণ তাহা অসত্য ও অসার ছিল বলিয়াই অধঃপতনের হস্ত হইতে কেহই রক্ষা পায় নাই। গোবিন্দলালের চরিত্রে স্বৈর্য্য ছিল না, রূপসেবা সে করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু রূপসেবা করিবার সামর্থ্যও তাহার ছিল না। প্রসাদপুরে যে গোবিন্দলালকে আমরা দেখি তাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলিয়া কিছুই নাই, তাহার চরিত্র অতি দুর্বল, তাহার প্রাণ লালসাহত; যে নারী তাহারই ভরসায় ভাগ্য-বিধাতাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল সে সেই নারীর নারীত্বকে অপমান করিয়া তাহাকে ভোগের সহচরী করিয়াছে। বারুণী পুঙ্করিণী হইতে রোহিণীকে উঠাইয়া গোবিন্দলাল নিজে ডুবিয়াছে ও রোহিণীকেও গভীরতর পাথারে ডুবাইয়াছে। রোহিণীর চরিত্রের জন্যগত আত্মমর্য্যাদাবোধকে গোবিন্দলাল নিজে বিনষ্ট করিয়াছে। গোবিন্দলালকে সে প্রথমে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, কিন্তু যখন

এই দেবতার মধ্যে নারীমাংসলোলুপ অতিশয় দুষ্টচরিত্র লম্পটকে সে দেখিল তখন তাহার স্বপ্ন ভাঙিতে বিলম্ব হয় নাই। তাহার চরিত্রের কেন্দ্রাভিক শক্তি আজ কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে পরিণত হইল; তাহার ধর্ম-অধর্ম, মান-অপমান, প্রেম-অপ্রেম সমস্ত সংস্কারই বিলুপ্ত হইল; মৃত্যু যাহার জীবন হইতে প্রিয় ছিল, জাস্তব তৃপ্তির জন্য সে আজ নিতান্ত বারবানিতার মত বাঁচিয়া থাকিতে চায়। গোবিন্দলাল যে কত বড় অন্যায় করিয়াছে, রোহিণীর এই অধঃপতন দেখিয়া আমরা তাহা অতি সহজেই অনুমান করিতে পারি। গোবিন্দলাল রোহিণীকে কখনও অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে নাই, রোহিণীকে সে তাহার অলস ক্ষণের বিলাসের ক্রীড়াপুত্তলি করিয়াছিল মাত্র। রোহিণী গোবিন্দলালের গৃহাঙ্গনে আসিলেও গোবিন্দলালের মানসলোকের মৈত্রী তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। প্রীতি পূর্ণয়ের রাধী বন্ধন তাহাদের মধ্যে হয় নাই, তাহাদের মধ্যে স্মৃতি বিগহিত একটি হীন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল মাত্র। অতিক্রম্য প্রীতির প্রসন্নতায় তাহাদের সম্পর্ক উজ্জ্বল হয় নাই, অতি স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনার পঙ্কিলতায় তাহা মলিন হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলাল রোহিণীকে দৈহিক স্মৃতি ও সাতচ্ছন্দ্য দিয়াছিল, মনে করিয়াছিল তাহাই যথেষ্ট, কিন্তু গোবিন্দলালের প্রেমের স্পর্শ পাইবার জন্য রোহিণীর যে আকৃতি জন্মিয়াছিল তাহা আর পূর্ণ হয় নাই। রোহিণীর এই বীভৎস পতনের জন্য গোবিন্দলালই সম্পূর্ণভাবে দায়ী, রোহিণীকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া সে-ই ধীরে ধীরে পতনের সর্বনিম্নস্তরে নামাইয়াছে। যে রোহিণী একদিন তাহার চক্ষে ছিল 'তীব্র জ্যোতির্ময়ী, অনন্ত প্রভাশালিনী, প্রভাত শুভতারারূপিণী, রূপতরঙ্গিণী' আজ তাহাকে সামান্য গণি করিতেও গোবিন্দলালের কুণ্ঠা বোধ হয় নাই। ইহা হইতে চরম পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? রোহিণীর সহবাসে সে দিবারাত্রি শুধু ভ্রমরের ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে, যাহা হারাইয়াছে তাহার জন্য নিতাই অনুশোচনা করিয়াছে। গোবিন্দলালই রোহিণীকে স্বেচ্ছাচারিণী করিয়াছে, রোহিণী স্বতঃই পাপে নিমগ্ন হয় নাই। যে নারীকে সে নিজে পক্ষে নিমগ্ন করিয়াছিল, যাহাকে সে ভালবাসার কণামাত্রও দেয় নাই, তাহাকেই সে বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া অভিসম্পাত দিয়াছে। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যস্বহীনতার পরিচয় আর হইতে পারে না। অসহায় এক অবলা রমণীকে তাহার কাতর জীবন-ভিক্ষার উত্তরে অন্যায়সে হত্যা করিয়া বৈরাগীর বেশে সে বৃন্দাবনে পলাইয়াছে। নায়ক-স্থানীয় পুরুষ-চরিত্রের এত বড় অধঃপতন বন্ধিম-চন্দ্র নিজেও অন্যত্র বিবৃত করেন নাই। রোহিণী 'মহাপাপিষ্ঠা' নহে, মহাপাপিষ্ঠ গোবিন্দলাল।"

মোহাম্মদ নওশের আলীর 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা' (২৪:১০, ভাদ্র ১৩৪৯) শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা আছে। লেখকের বক্তব্য :

“এই আধুনিক সাহিত্যের মূলে আছে একটা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তির প্রধান কথা প্রগাঢ় সত্যনিষ্ঠা। এই সত্যনিষ্ঠার মধ্যে আছে কল্পনা, মোহ, সংস্কার ইত্যাদির প্রতি একান্ত অবিশ্বাস। প্রাচীন সাহিত্য মিথ্যায় ও ভণ্ডামীতে পরিপূর্ণ কিন্তু আধুনিক সাহিত্য সাময়িক তৃপ্তির জন্য কাঁচকে কাঞ্চন বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যুক্তি দ্বারা প্রামাণ্য তাই সত্য। এইখানেই প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের প্রধান বিভেদ। আধুনিক সাহিত্যে আছে একটা তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, গোজামিল এর পক্ষে অসহ্য। যা তর্কে টেকে না, যাহা সত্যের ছোওয়া সহ্য না তা আধুনিক সাহিত্য চায় না। যা সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা বলে চলছিল তা যে মানসিক দুর্বলতা ও অক্ষমতা তা আজ সে বুঝেছে। নীতির নামে ঝাপুরুষতা, স্নানরের নামে ন্যাকামী আর চলবে না। গণ্ডায় আঙা মিলালেই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হল তা আর বলা সম্ভব নয়। পুরাতন সাহিত্যের কল্পনার বাড়াবাড়ির দিন এখন চলে গিয়েছে। সাহিত্যের কাজ মানুষের মনকে নিয়ে আর বিজ্ঞানের কাজ পদার্থকে নিয়ে এরূপ সীমানির্দেশ এখনকার দিনে আর চলছে না।

মানুষের মনও এখন বৈজ্ঞানিক বিচারের বিষয় হয়েছে। যাকে চিরকাল অন্ধকারে রহস্যময় করে রাখা হত আজ তা প্রকাশ্য চর্চার বিষয়।

এর ফলে আজ এক প্রকারের নূতন নাস্তিকতা দেখা দিচ্ছে। ইহা একেবারে নূতন বলে আমরা সঙ্কুচিত হতে পারি কিন্তু ইহাকে ঠেকিয়ে রাখা কিংবা এর নিকট তর্কে পেরে উঠা সম্ভব নয়। এলিজাবেথের যুগেও এরূপ কাণ্ড ঘটে ছিল এবং ইউরোপের নবজীবন-আন্দোলন প্রাচীন ভাব ও চিন্তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। তখনও মার্লো প্রমুখ একদল নাস্তিকের দল দেখা দিয়েছিলেন।

এই আধুনিক সাহিত্যের আর একদিক প্রকাশ পেয়েছে, তা মানব-ধর্ম। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ একথা সাহিত্যে অনেক দিন যাবৎ চলে আসছে কিন্তু মানুষ বলতে কি বুঝায় এবং মানুষের কতটুকু বুঝায় এ নিয়ে নানা সময় নানা রকম ধারণা চলে আসছে। কিন্তু আজকালকার মানবতা মানুষের কিছুই বাদ দিতে চায় না। এই আধুনিকতায় এক প্রকার নৈরাশ্যময় মনোবৃত্তি দেখা যায়। অনেকে এই যুগকে জিজ্ঞাসার যুগ বলে থাকেন। এই যুগ নানা প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভাবন করেছে কিন্তু এর উত্তর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তাই এ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে।

শুধু গদ্য কবিতা দেখেই আমরা চমকিত হই কিন্তু ইউরোপে এ ছাড়া আরও অনেক কিছু হয়েছে। আজ হয়ত চমকিত হচ্ছি কিন্তু কালই ইহা চল হই যাবে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রথম বিপ্লব আনয়ন করেছিল।

কয়েকটি কারণে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ভাল ফুটে উঠছে-না। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভার নিকট আধুনিক লেখকগণ তাঁদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলছিলেন। কেহ বা প্রাণহীন ভারবিলাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন কেহ কেহ বিলাতি লেখকদের নিবিচার অনুকরণ করেছেন; খাঁটি প্রেরণা না থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যে অনধিকার চর্চা করছেন। এদের প্রকৃত অতাব প্রতিভার। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মত প্রতিভাবান নায়কের আবির্ভাব হলেই হয়ত এ সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠতে পারত। হয়ত শীঘ্রই এরূপ নায়ক দেখা দিবেন।”

সৈয়দ আলী আশরাফের ‘রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প’ (২৪:১২, কাতিক ১৩৪৯) একটি বিশ্লেষণাত্মক স্মৃতিস্মিত প্রবন্ধ। সূচনায় প্রবন্ধকার লিখেছেন :

“রবীন্দ্র-সাহিত্যে ছোট গল্পের স্থান কাব্যের পরেই। এমন কি ‘গল্পগুচ্ছ’ যখনই পড়ি তখনই মনে হয়, কবিতা না লিখিলেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখক হিসাবে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতেন। ফরাসী সাহিত্যে মোপসাঁর স্থান যেরূপ উচৈ অবস্থিত, রবীন্দ্রনাথও বাংলা সাহিত্যে সেইরূপ উন্নত স্থানে উন্নীত হইতেন। তাঁহার ছোট গল্প শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের সমাদরের সামগ্রী। অনেকে তাঁহার উপন্যাসকেও এই একই শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন, এবং তাঁহাকে অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাসিক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহা যেরূপ আশ্চর্য্যকর, তেমনই ইহাতে এও প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় আমাদের সমাজে এখনও অস্পষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার ক্রমবিকাশমান প্রতিভা সৌরদীপ্তির মতই এমন করিয়া বাঙালী জীবনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গতানুগতিক সমালোচনার উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে। সাহিত্য সম্বন্ধে সত্যিকার ধারণা যাহাদের সঙ্কীর্ণ

তঁহারই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তিতে বিভ্রান্ত হইয়া তাঁহার সমস্ত কীর্তিকেই সমান মূল্য ও মর্যাদা দিয়া থাকেন। উপন্যাসে তিনি বিশেষ আদর্শকেই প্রচার করিয়াছেন, জীবন ও মানুষ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ও আদর্শকেই রূপ দিয়াছেন, বাস্তবানুভূতি ও সূক্ষ্ম-তিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রকৃত পক্ষে উন্নত উপন্যাস হইয়া উঠে নাই। গল্পলেখক হিসাবে তাঁহার আসন উন্নত, কিন্তু উপন্যাসগুলি তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়।

‘গল্পগুচ্ছে’র গল্পসমষ্টি পূর্ণগঠিত। আঙ্গিকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ছোট গল্পের প্রকৃত রূপ আমরা এখানেই পাই। ইহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ ছোট গল্প দেখা দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ইহাকে সার্থক রূপ দিলেন। ছোট গল্প শুধু ছোট হইলেই চলিবে না, ভাব, গঠনপ্রণালী ও বিষয়ে উপন্যাস হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক। উপন্যাসে পূর্ণাবয়ব জীবনের পরিচয় থাকিবে, ছোট গল্পে থাকিবে তাহারই বিচ্যুত খণ্ডবিশেষের রূপায়ণ। শৈথিল্যহীন ঘটনাপারম্পর্য্যপূর্ণ হওয়াই ছোট গল্পের নিয়ম। এককথায় ছোট গল্পের মধ্যে ভাবের, কাজের ও ঘটনার একতা ও সমতা রক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প এই দিক দিয়া সার্থক। তাঁহার ছোট গল্পে অপ্ৰয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ নাই। প্রত্যেকটি ঘটনা একটি পূর্ণভাব বা প্রতীতির ঐক্য (Unity of impression) সৃষ্টি করিবার জন্য বা প্রকৃত ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বিবৃত হইয়াছে। সর্বত্রই পাঠকের মনে একটি বিশেষ প্রতীতি জন্মাইবার জন্য তাঁহার কাহিনী লিখিত হইয়াছে। ‘কাবুলিওয়ালার’ অন্তর্নিহিত পিতৃস্নেহের স্বরূপ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে, ‘কঙ্কালের’ ব্যর্থ সৌন্দর্য্যগোরবের হতাশ পরিণাম পরিস্ফুট করিবার জন্য তিনি গল্প লিখিয়াছেন। ইহা কোন আদর্শের প্রচার নয়, ইহাতে রহিয়াছে লেখকের হৃদয়ানুভূতির সহিত বাস্তবের সংমিশ্রণ। তিনি যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন,—ছোট গল্পের আদর্শই তাই।”...

প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পসমূহের শ্রেণীকরণের ও বিশ্লেষণের সুখণ্ডল প্রয়াস লক্ষণীয়।

গোলাম কুদ্দুসের ‘ডিটেক্টিভ উপন্যাস’ (২৫:১, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯) এটি ভিন্দুধর্মী প্রবন্ধ। ডিটেক্টিভ উপন্যাস উদ্ভবের সমাজ-পরিবেশ বিশ্লেষণ করেছেন গোলাম কুদ্দুস। প্রবন্ধে মার্কসবাদী কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর আছে:

“ডিটেক্টিভ গল্প-উপন্যাস ও খুনে গল্প উপন্যাসের তফাৎ অনেক। প্রথমটি রচনা করা অপেক্ষাকৃত শক্তিসাপেক্ষ। তা’ ছাড়া দু’য়ের মধ্যে তুলনায় ডিটেক্টিভ গল্প-উপন্যাস-টাই সূক্ষ্ম সৃষ্টি। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে খুনে গল্পের সমাদর বেশী। শুনতে পাই, ডিটেক্টিভ উপন্যাস যেখানে উচ্চ শৈলীতে উন্নীত সেখানে ডিটেক্টিভ উপন্যাস পাঠের আনন্দ সূক্ষ্ম দাবা খেলার আনন্দের মত। খুনে গল্পে একেবারে মোটারসের আমদানি। তবু রচনার সুবিধার জন্য ডিটেক্টিভ গল্প-উপন্যাস ও খুনে গল্প-উপন্যাস আপাতত আমি একই অর্থে ব্যবহার করব। তা’ ছাড়া আকৃতি প্রকৃতিতে তফাৎ থাকলেও এ দু’য়ের গোত্র অভিন্ন।

কিন্তু ডিটেক্টিভ উপন্যাসের উপর প্রবন্ধ লেখার মত সদুপণ নেই আমার। তবে অধিকার আছে রীতিমত। ধারণা এ-বস্তু দু’তিন খানার বেশী প’ড়ে ওঠার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিছু না জানলেই বলার অধিকার বেশী। সাহিত্য আন্দাজের জিনিষ কি না। মিল্টন এবং দান্তেকে নরকের বর্ণনা দেওয়ার জন্য জাহান্নামে যেয়ে বসবাস করে

আসতে হয়নি। সুতরাং এ নিবন্ধের ভিত্তি আন্দাজ। যদি কোনো চালাক ডিটেক্টিভ পাঠক ভুলচুক ডিটেক্টিভ করতে পারেন, হাতে-নাতে ধরিয়া দেবেন কৃতজ্ঞ হবো।

যাঁদের লাইব্রেরী-সংক্রান্ত কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন, খুনে এবং ডিটেক্টিভ উপন্যাস না রাখলে লাইব্রেরীর সদস্য মেলা দুষ্কর। যে কোনো দেশের চৌদ্দ আনা পাঠকই অবশ্য গল্প-উপন্যাসের পাঠক। কিন্তু এর মধ্যেই আবার ডিটেক্টিভ উপন্যাসের কদর বেশী। এ ব্যাপারে কারো সংশয় থাকলে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ লাইব্রেরীতে যেয়ে সন্দেহ ঘুচিয়ে আসতে পারেন। প্রচুর পরিমাণ সদস্য সংগ্রহের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকেও যে ডিটেক্টিভ উপন্যাসের বিপণী খুলতে হয়েছে বিশ্বাস হতে চায় না। তবু এ কথা সত্যি, দুর্গম গ্রন্থ এবং পুঁথি সাহিত্য সেখানে সময়ে তাকেই তোলা থাকে এবং আস্তে ধুলোবালিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ডিটেক্টিভ উপন্যাসগুলো কিন্তু হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে ময়লা-হয়; নতুন ক’রে ভালো চামড়ার বাঁধাই দরকার পড়ে। ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’তে কতখানি ডিটেক্টিভ উপন্যাসের আফিম আছে জানিনে। কিন্তু সাধারণ সদস্য সংখ্যা বাড়তে হলে কর্মকর্তাদের সজাগ হওয়া উচিত।

ডিটেক্টিভ উপন্যাসের প্রধান পাঠক মেয়েরা, কেরাণীবর্গ, ভারপ্রাপ্ত এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীগণ। কিশোর ছাত্রের কাছে ডিটেক্টিভ উপন্যাস প্রিয়, প্রিয়তর বোধ হয় অ্যাডভেঞ্চারের বই। আধুনিক কালে ডিটেক্টিভ উপন্যাসের আরো এক শ্রেণীর পাঠক জন্মেছেন, তাঁদের নাম ডিটেক্টর। ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছেন বাট্টাও রাসেন। ইংলণ্ডের গিল্ড সোশালিষ্ট সি, ডি, এইচ, কোলের ডিটেক্টিভ উপন্যাস নাকি জার্মানীর ন্যাশনাল সোশালিষ্ট হিটলারের অতি প্রিয় পাঠ্য।

ডিটেক্টিভ উপন্যাসের এত ব্যাপক সমাদর কেন? ডিটেক্টিভ উপন্যাসের সরল পাঠক বলবেন, ভালো লাগে তাই। একটু বুদ্ধিমানেরা বলবেন, একঘেয়ে জীবনে যে কোনো উদ্বেজক কাহিনী উপভোগ্য। কারো মতে, ডিটেক্টিভ উপন্যাস বুদ্ধি খোলা করে, ডিটেক্টিভের রহস্য-আবিষ্কার পদ্ধতি বুদ্ধি শানিত করে! আমি কয়েকজনের এমন মতও জানি, যার অর্থ, ডিটেক্টিভ উপন্যাসের রোমাঞ্চকর ঘটনা এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন-খারাপী ধীরে ধীরে ভীরা মানুষকে সাহসী ক’রে তোলে, সংসর্গের এমনই গুণ। এবং পৃথিবীর নিয়ম, ভীরা সাহসী হতে চায়, পঙ্ক পর্বত লঙ্ঘনের বাসনা রাখে।

এ সব মতামত বড় জোর অর্ধসত্য। ডিটেক্টিভ উপন্যাস কেন এ যুগে এমন গিগি-জয়ীর বেশে দেখা দিল, এ সব মতামতে তার উত্তর নেই। উত্তর খুঁজতে হলে ইতিহাসের কয়েকটা পাতা উল্টাতে হয়।

ডিটেক্টিভ উপন্যাস ইউরোপীয় সভ্যতার নিজস্ব উদগীরণ। উপন্যাস রচনায়ও ইউরোপকে সাধারণতঃ অধিনায়ক ধরা হয়। কিন্তু চীন দেশে নাকি আটশ’ নয়শ’ বছর আগে উপন্যাস লেখা হয়েছে। ডিটেক্টিভ উপন্যাসের যুগ্ম হিসাবে ইউরোপ অদ্বিতীয়। তবু সৃষ্টির আদি হতেই ইউরোপে কিন্তু ডিটেক্টিভ উপন্যাসের চাষ ছিল না। সাধারণ উপন্যাসের মত ডিটেক্টিভ উপন্যাসেরও জন্ম আধুনিক ইউরোপের জন্মসূত্রে গ্রথিত। এই ইউরোপের সুতিকাগৃহ রেনেসাঁ কিন্তু লীলাভূমি যন্ত্রবিপ্লবের পরবর্তী কাল।

মধ্যযুগের সভ্যতা গ্রাম্য। বড় বড় সামন্তদের বাস ছিল দেশের অভ্যন্তরে। সে কালের রাস্তাঘাট যানবাহনের অসুবিধা আমাদের কল্পনাতীত। গণ্ডীবদ্ধ বিচ্ছিন্ন গ্রাম্য সভ্যতায় ডিটেক্টিভ উপন্যাসের জন্ম হওয়া অসম্ভব। মধ্যযুগের ইউরোপে যা রচিত হত তার নাম

ভুতের কাহিনী। আমাদের দেশে এখনো ভুতের গল্পকাহিনী জনপ্রিয়, বিশেষতঃ মেয়েদের কাছে। অর্থাৎ মধ্যযুগের আবহাওয়া আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমাদের গ্রামে এখনো সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুকে পেঁচোয় পায় এবং তার গর্ভধারণীর স্কে ভর করে শ্যাওড়া বা বটবৃক্ষের অশরীরী ছায়ায়।

ডিটেক্টিভ উপন্যাসের ক্ষেত্র শহর এবং জনতা। ডিটেক্টিভ উপন্যাসের পৃথিবীতে রাস্তাঘাট, রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন, বিদ্যুতের রাজস্ব। স্থানের দূরত্ব এখানে সঙ্কীর্ণ। যে পৃথিবীতে যন্ত্রসম্রাটের সর্বময় কর্তৃত্ব সেখানেই ডিটেক্টিভ উপন্যাসের পাখনা গজায়।

গজাত না যদি সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটি কারণ উপস্থিত না থাকত। যন্ত্রের যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সেখানকার সমস্ত যন্ত্রপাতি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সাধারণ সম্পত্তি নয়। কয়েকজন লোকমাত্র দানবীয় কলকারখানাগুলোর মালিক। যন্ত্র যেহেতু বর্তমান যুগে জগতের কর্তা সেই হেতু যন্ত্র যাদের হাতে তারাই পৃথিবীর কর্তা। ফলাফল স্পষ্ট। কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তির মনোফার কাছে সমস্ত বিশৃঙ্খল বন্দী। এই বিশেষ কয়েকজন লোকের অভিপ্রায় মত গড়ে ওঠে নানা রকম শ্রেণীর লোক—ডাক্তার উকিল কুলি মজুর কেরাণী। এটা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়, কয়েকজন ধনকুবের যেখানে কর্তৃত্বের দণ্ড হাতে নেয় সেখানে অনেককেই গরীবের হালে থাকতে হয়। কারণ অনেক লোকের পরিশ্রমের ফলভোগ করেই কয়েকজন মানুষের বিভ্রান হওয়া সম্ভব। ব্যাপারটা আমাদের চোখের সামনেই দিনরাত ঘটছে! কিন্তু সামাজিক নিয়ম-কানুন নিরৈট পদার্থ নয় বলেই চোখ থাকতেও অনেকের চোখে পড়ে না।

যে পৃথিবীতে সকলের অবস্থা সমান নয়, যেখানে মাত্র কয়েকজন লোক অন্যের পরিশ্রমের এফটা মোটা অংশ কেটে নিয়ে ধনপতি হয়, সেখানে নানা প্রকার সামাজিক ব্যাধির উৎপাত ঘটতে বাধ্য। এটা স্বাভাবিক। দারিদ্র্য এবং অসাম্য মানুষকে অসুস্থ করে। ধনকুবেরদের মনে প্রভুভাব এবং দরিদ্রজনের মনে আসে দাস্যভাব। অভাবের জ্বালায় খুন-জখম-চুরী-ডাকাতি আরম্ভ হয়। আরম্ভ হয় ডিটেক্টিভ উপন্যাস।

কারণ খুনখারাপী চুরী-জোচ্চুরী এবং এই শ্রেণীর সামাজিক অসুস্থতাই ডিটেক্টিভ উপন্যাসের উপাদান। এই সমাজে সন্দেহজনক বা রহস্যবৃত্ত খুন-জখম ঘটতে বাধ্য। এই রহস্যোন্মূচনের জন্য নিয়োজিত হয়ে থাকে ডিটেক্টিভ! শুনেছি বটে, অনেক ডিটেক্টিভ উপন্যাসে রক্তারক্তি কাণ্ড বা চৌর্য কাহিনীর চিহ্নও নেই। কিন্তু খুন ও চুরীর সন্দেহ ছাড়া অন্তত সে সব উপন্যাস যে লেখাই হত না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এমন প্রশ্নও মনে আসতে পারে, দারিদ্র্যকেই কেন সমস্ত চুরী ডাকাতি এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির হেতু ধরব, যখন দেখতে পাচ্ছি ডিটেক্টিভ উপন্যাসের অনেক পাপকাহিনীর মূলেই অনাহারের ভয় এবং বড় মানুষের পয়সাকড়ি কেড়ে নেওয়ার পরিবর্তে অন্য প্রকার মানসিক প্রবৃত্তির শক্তিই প্রবল? নেকলেস চুরীর যে সব গল্প শোনা যায় সে সব গল্পের অনেক জায়গাতেই ত' দেখা যায় নেকলেস চোর হয়ত একজন বড়লোকের বাচ্চা কিম্বা মালদার মালডিন। ডিটেক্টিভ গল্পে ত' দারিদ্র্যের চেয়ে প্রেমের ব্যাপারেই রক্তারক্তি কাণ্ড বেশী হয়। এখনও ত' দেখা যায় ডিটেক্টিভ উপন্যাসের কুৎসিত ঘটনার যারা নায়ক তাদের কদর্য কার্যকলাপের মধ্যে সাংসারিক স্বার্থের লেশমাত্র নেই, তাদের চরিত্রটাই এমন হয়ে গেছে যে বদমায়েশী না করলে তারা চুপচাপ থাকতেই পারে না।

প্রথম কথা, দারিদ্র্যই সব রকমের চুরী ডাকাতি এবং সামাজিক ব্যাধির জন্য দায়ী নয়, তাহলে আর আমেরিকা হতে এত লোমহর্ষক চুরীর খবর আসত না। আসলে দায়ী

অসাম্য। আমরা বেশীর ভাগ সময়ই প্রতিবাসীর দিকে নজর রেখে নিজের প্রয়োজন এবং চাহিদার কথা ঠিক করি। আর এ সব ক্ষেত্রে প্রতিবাসী সেইজন যে আমাদের চেয়ে বিত্তবান।

প্রেমের ব্যাপারেও অসুস্থতা আসে অসাম্যের জন্যই। অনেকের সন্দেহ, নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতায় প্রেমের জন্মই অসম্ভব, তার আবার সুস্থ প্রেম আর অসুস্থ প্রেম। অন্তত নারী এবং পুরুষের জীবিকা অর্জনের সমান সুযোগ ও সুবিধা থাকলে প্রেমের গতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ হতে বাধ্য। নারী অধিকারের বস্তু নয় স্বীকৃত হলে প্রেম নিয়ে খুন-খারাপী আপনাআপনি খেমে যাবে এবং তখন দেশের যৌনবিধি নূতন আইনে লেখা হবে।

লোক যারা নিতান্তই বদমায়েশ তাদেরও উৎপত্তির ইতিহাস অসাম্যে। মনস্তাত্ত্বিকদের ধারণা—হিংসা, ক্রোধ, প্রতিশোধ কামনা, এবং অত্যাচারে আসক্তি ‘কমপ্লেক্স’-গত ব্যাপার, বেশীর ভাগেরই নাকি ‘সেক্স রিপ্রেসন’ থেকে জন্ম। পক্ষান্তরে, সমাজতাত্ত্বিকদের ধারণা, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনেক মূল প্রবৃত্তির পরিবর্তন হয়। ‘ইনফিরিওরেটি কমপ্লেক্স’, ‘সুপিরিওরেটি কমপ্লেক্স’, নানা প্রকার ‘রিপ্রেসন’ এবং ‘নিউরোসিস’ সাম্য-সমাজে অত্যন্ত সহজেই রূপ বদলাবে। কারণ বহু ‘কমপ্লেক্সের’ জন্ম প্রভুদাস মনোবৃত্তিতে, ধনতন্ত্র সমাজে নিজেকে উন্নীত করার যুদ্ধং দেহী চেষ্টাতে, ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতাহীনতায়, জীবনধারণের অস্থায়ী সংস্থান, এবং সমাজের একটা বিরাট অঙ্গ বিকৃত দুর্বল ক’রে রাখতে। শহরের বস্তি-জীবন নিয়ে বড় মানুষেরা না ভেবে অন্যায়সে থাকতে পারেন বটে, কিন্তু বস্তির বিধাত্ত আবহাওয়াতেই যক্ষার মত রোগের বিস্তার ঘটে এবং বাতাসে উড়ে এসে একদিন বড় মানুষের নাকেও ঢুকে পড়ে। মানসিক কমপ্লেক্স ব্যাপারেও একথা খাটে। দারিদ্র্য সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট ক’রে যে ব্যাধির সৃষ্টি করে তার কাছে কেউ নিস্তার পায় না, যে ধনকুবের, সেও নয়।

সুতরাং ডিটেক্টিভ উপন্যাসে ঘটনার যে রূপই প্রকাশ পাক না কেন, সকলের মূলে আছে অসুস্থ সামাজিক গঠনভঙ্গি। এই অসুস্থ গঠনভঙ্গির জন্য দায়ী ধনতাত্ত্বিক সমাজ-ব্যবস্থা। ডিটেক্টিভ উপন্যাসের মাল সরবরাহ হয় এই সমাজ থেকে।

কোনো কালে যদি এই সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়—তখন কি ডিটেক্টিভ উপন্যাস লেখা হবে না? যদি কোনোদিন সাম্যবাদী সমাজের উদয় হয় তখন কি ধনতাত্ত্বিক সমাজের সঙ্গে সঙ্গে ডিটেক্টিভ উপন্যাসের আয়ুও ফুরাবে? বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ভূতের গল্প যেমন আজ কেবল কৌতুহলের বস্তু, তেমনি সাম্যবাদী সমাজে ডিটেক্টিভ হবে অবাস্তব। ভূত না থাকলে ভূতের গল্প লিখবে কে? চুরিডাকাতি সামাজিক আধিব্যাধি না থাকলে ডিটেক্টিভ উপন্যাস বানাবে কে? সাম্যতন্ত্রে চোর-ডাকাত থাকতে পারে না, নানাপ্রকার অদ্ভুত ‘কমপ্লেক্স’ও ক’মে যাবে। ডিটেক্টিভকে কে তখন মাইনে দিয়ে মিছেমিছি পুষতে যাবে।

আমাদের চোখের সামনে আজ অন্তত একটি দেশ রয়েছে যেখানে সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে। যতদূর জানি এবং যতটুকু শুনেছি, কোনো ডিটেক্টিভ উপন্যাস লেখা হয় না সোভিয়েট ইউনিয়নে। শুধু তাই নয়, সাম্যতন্ত্র ঘোষিত হবার পর এই পঁচিশ বছরের মধ্যেও সেখানে একখানা ডিটেক্টিভ উপন্যাস বেরোয় নি। কথা উঠতে পারে, সোভিয়েট ইউনিয়নেও ত অনেক ডিটেক্টিভ আছে, কম্যুনিষ্ট পার্টি’কে যারা সব রকমের

বিরুদ্ধ কাজ ও সমালোচনার সংবাদ এনে দেয় এবং পার্টির কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করে। ***সোভিয়েট ইউনিয়নে ডিটেক্টিভ থাকার অর্থ, দেশের অভ্যন্তরে এখনো বিরোধ আছে নানা প্রকারের, সম্পূর্ণ সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখনো সেখানে। তা' ছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়নে আত্মপ্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের বিরাগভাজন, এখন ত' ধনতন্ত্রের প্রধান পাণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধেই লিপ্ত। সোভিয়েট ইউনিয়নে ডিটেক্টিভের প্রয়োজন শেষ হ'তে পারে না এই অবস্থায়। আমার বক্তব্য, সামন্ততন্ত্র থেকে যেমন সমস্ত পৃথিবী প্রায় ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, তেমন ভাবেই সমস্ত পৃথিবী ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পার্থ পরিবর্তন করলে ডিটেক্টিভ উপন্যাস নামক বস্তুটি বিলুপ্ত হবে। এর প্রথম প্রকাশ দেখা দিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নে। তাই যদি না হবে, নাৎসী জার্মানীতে ডিটেক্টিভ উপন্যাস লেখা চলছে কি ক'রে? নাৎসী পার্টি ত' তার পুলিশের এবং ডিটেক্টিভের কীতিকলাপ চাকতে কম ব্যস্ত নয়। আসল কথা, যেখানে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজ-ব্যবস্থা অসাম্যের ও সব রকম সামাজিক ব্যাধির সমাধান করেছে সেখানে জার্মানীতে সবচেয়ে কুংসিত বিরোধ ও অসাম্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে। সেজন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে ডিটেক্টিভ উপন্যাস লেখা আপনা-আপনি থেমে গেছে। কিন্তু জার্মানীর মহাপ্রভু স্বয়ং ডিটেক্টিভ উপন্যাসের একনিষ্ঠ পাঠক।

যে কারণের জন্য ডিটেক্টিভ উপন্যাসের উদ্ভব ঠিক সেই কারণেই এর জনপ্রিয়তা। মেয়েরা, কেরানীরা, অবসরপুষ্ট শ্রেণীর লোকেরা যে ডিটেক্টিভ উপন্যাসের পাঠক তার কারণ তাদের একবেয়ে জীবন এবং বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনের প্রতিকূল অবস্থা। অবসরপুষ্ট শ্রেণীর লোক যে ডিটেক্টিভ উপন্যাসের ভক্ত তার প্রধান কারণটা স্পষ্ট। অবসরপুষ্ট শ্রেণী প্রাণপণে কায়ম রাখতে চায় চলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে। ডিটেক্টিভ উপন্যাসেও সেই কথাই খুব জোর গলায় বলা হয়। ডিটেক্টিভ উপন্যাসে সব সময় পুলিশ ও ডিটেক্টিভের জিং, চোর ডাকাত বদমায়েশের সব সময় হার। কে না জানে চুরী ডাকাতি রক্তপাত সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে আঘাত করে? ইতিহাসে নজির আছে, এ সব জিনিষের প্রাচুর্য্য অনেক সময় চলিত সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রথম হেতু আকারেই দেখা দিয়েছে। যারা অবসরপুষ্ট শ্রেণীর লোক তারা সেইজন্য চুরী ডাকাতিতে রীতিমত ভয় করে। অথচ ধনতন্ত্র ব্যবস্থায় চুরী ডাকাতি ঘটবেই। ধনিক শ্রেণীর স্নহৃদসম প্রিয় ডিটেক্টিভ উপন্যাসে পাপী চোর বদমায়েশ সব সময় হেরে যায়, এবং সেই ধনিক শ্রেণীর নিয়োজিত ডিটেক্টিভ ও পুলিশের হয় জয়জয়কার। যারা ডিটেক্টিভ উপন্যাসের নিয়মিত পাঠক তারা আমার চেয়েও ভালো জানেন, যখন ডিটেক্টিভের বদমায়েশের হাতে বারবার পরাস্ত হতে থাকে তখন তাদের বুক কেমন ধপ্ধপ্ ক'রে ওঠে; অবশেষে ডিটেক্টিভের জয় হ'লে নিশ্বাস প্রশ্বাস সহজ স্বাভাবিক হয়। অবসরপুষ্ট শ্রেণীর লোক জানে, ডিটেক্টিভ, পুলিশ এবং গভর্নমেন্ট প্রত্যেকেই তার ধনমান ও সম্মান রক্ষণের অস্ত্র, তার বড় আপন জন। ডিটেক্টিভ উপন্যাসে বরাবরই যখন ডিটেক্টিভ অর্থাৎ গভর্নমেন্টের জয়লাভ হয় তখন অবসরপুষ্ট শ্রেণীর লোক গোয়েন্দা কাহিনী যে সানন্দেই পাঠ করবে তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে।

অনেক সময় এই শ্রেণী-সংঘর্ষের রূপ জাতি-সংঘর্ষে পরিণত হয়। এ ব্যাপার আন্তর্জাতিক যুদ্ধের আকারে প্রত্যহই ঘটছে। ডিটেক্টিভ উপন্যাসে এই বিশেষ ধারার প্রবাহ দেখে বোঝা যায় এ বস্তুটিও নিঃসন্দেহেই শ্রেণী-বিশেষের সাহিত্য। ইংরেজ লেখকের কৃপায় হাজার হাজার চোর গুণ্ডা বদমায়েশ কোকেন ব্যবসায়ীর আড্ডা চীন দেশে। আমেরিকার লেখক অধিকাংশ ডিটেক্টিভ উপন্যাসের পাপী আমদানী করেন নিগ্রোদের মধ্য থেকে। দীনেজ্রকুমারের অনূদিত 'চীনের ড্রাগন' প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

একটা কথা বলা দরকার। যদিও ডিটেক্টিভ উপন্যাসে প্রায়ই পুলিশের আড়ম্বর, আতঙ্কিততা এবং নির্বুদ্ধিতা দেখানো হয় এবং ডিটেক্টিভের অসাধারণ ধীশক্তির নমুনা দেওয়া হয়, তবু আসলে দু'জনে একই গোত্রের, একই গভর্নমেন্টের বা বড় মানুষের। একজন একটু চালাক, একজন একটু বোকা। লরেল আর হাডি।

ডিটেক্টিভ উপন্যাসের জন্যকাহিনীর কথা ভুলে গেলেও, দু'টো কারণে কোন বিবেক-বান পাঠকের পক্ষে ডিটেক্টিভ উপন্যাস পড়া অসহ্য, অন্তত আমি পড়তে পারিনে। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ শিল্প এবং সাহিত্যের কারবার মানুষের হৃদয় নিয়ে। হৃদয়ের সঙ্গে বাইরের জগতের ও অন্য হৃদয়ের যোগাযোগ এবং সংঘর্ষই প্রত্যেক সৃষ্টির পটভূমিকা। ডিটেক্টিভ উপন্যাসে মানুষের হৃদয় একেবারে অনুপস্থিত না থাকলেও মানুষের অন্তস্থলে আলোছায়ার প্রকাশ সেখানে বড় কথা নয়। ডিটেক্টিভ উপন্যাসের বিষয়বস্তুতেই বাইরের চাপ এত বেশী যে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত অসম্ভব, ডিটেক্টিভ উপন্যাসের উদ্দেশ্যও তা নয়। তা'ছাড়া আর এক কারণে ডিটেক্টিভ উপন্যাস সাহিত্যের পদবাচ্য হতে পারে না। আমি মনে করি, সাহিত্যের একটা বিশেষ স্মারক চিহ্ন এই যে, এ জিনিষ বারবার পড়লেও এর সৌন্দর্য বা আকর্ষণের হ্রাস হয় না। বরং পুনর্পাঠে সাহিত্যের সৌন্দর্য-শতদলের দলগুলো ক্রমাগত ফুটে ওঠে। ডিটেক্টিভ উপন্যাসের ব্যাপার ঠিক উল্টো। একবার পড়ার পর সে ডিটেক্টিভ উপন্যাস কেউ আবার পড়তে পারেন বলে শুনিনি। অবশ্য সমস্ত ঘটনা ভুলে গেলে কিছুদিন পর সে বই পড়া যায়। কিন্তু সে ত'ধরতে গেলে নতুন বই। ডিটেক্টিভ উপন্যাস একবার ছাড়া দু'বার পড়া যায় না, তার কারণ, একটা রহস্যোদ্ঘাটনের কাহিনী বা বিশ্লেষণই এসব পুস্তকের প্রাণবস্ত। রহস্য একবার পরিষ্কার হয়ে গেলে সে বই আর একবার হাতে নেওয়া অসম্ভব।”

কবি আবদুল কাদিরকে লেখা কবি জসীমউদ্দীনের একটি দীর্ঘপত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১৩৫০ সংখ্যা 'সওগাতে' (২৫:১১) 'গণ-সাহিত্য' শিরোনামে। প্রবন্ধের শেষাংশে জসীমউদ্দীন লেখেন:

“ইংরেজ এ দেশে আমাদের মধ্যে হিন্দুমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলেন। কারণ, তাঁদের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের সমর্থন খুঁজে পেলেন। মুসলমান-মধ্যবিত্তরা ইংরাজের কাছে কোন উৎসাহই পেল না। কারণ, স্বাধীনতার স্বপ্ন তাদের মন থেকে সেদিনও ভাঙেনি। পীর বাদশা মিঞার পূর্ব পুরুষেরা পঞ্চাশ বৎসর আগেও ইংরেজ তাড়ানর ফন্দী-ফিকির খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এর ফলে মুসলমানের যে কৃষ্টির কয়েকটি কেন্দ্র ফুটে উঠেছিল ঢাকা, চট্টগ্রাম, আদিনা, হুগলি প্রভৃতি স্থানে, ইংরেজ এসব জায়গার সমস্ত importance নষ্ট করে দিল। কলিকাতায় তাঁরা নতুন নগর পত্তন করলেন, হিন্দু-ব্রাহ্মণ কায়স্থ-বৈদ্যের দল এখানে এসে আস্তানা তুলল। যে দলটি নগরে এসে বাসা বাঁধল, নগরের জোলুস তাদের চোখ ঝলসে দিল। ইংরেজের নতুন সভ্যতা এঁরা চোখ বুঁজে গ্রহণ করলেন। যেমন তুমি দেখবে আমাদের নতুন মুসলিম ছাত্রের দল। এরা এসেছে মাটির ঘর থেকে। কিন্তু শহরে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য মাটির সব রকম চিহ্ন এরা গা হ'তে মুছে ফেলতে কেমন ব্যস্ত! নতুন যে মধ্যবিত্ত-হিন্দুদলটি সহরে এসে আস্তানা তুলল, সহরে তাদের নিজস্ব কোন tradition-এর বনিয়াদ ছিল না। সেইজন্য ইংরাজের নগরে এসে তারা ইউরোপীয় ভাবধারার পানপাত্রটি পরিপূর্ণ মনে শুধু গ্রহণই করল না, নিজের দেশের গ্রাম্য-জীবনের সেই প্রাচীন ভাবধারার বনিয়াদকে লাথি মেরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

রামমোহন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন। আরবী-ফারসী শিক্ষার প্রতিও তাঁর দরদ ছিল। কিন্তু এদেশের রীতি-নীতি ধর্ম ও কৃষ্টিকে হেয় করে রামমোহন

লাট-সাহেবকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার থেকেই বুঝতে পারবে, নিজের দেশের ভাবধারার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কত হীন ছিল। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের কলমে রামমোহনের যতই প্রশংসা থাকে না কেন, রামমোহন মুসলমানের সবচাইতে বড় ক্ষতি করেছেন। পারসীর পরিবর্তে যে এদেশের রাজভাষা ইংরাজী হ'ল, তার জন্য আমাদের সর্বনাশ হ'ল। যদি মুসলমান-মধ্যবিত্ত সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া না হ'ত, তাদের পুরাতন নগরের সভ্যতা ও ভাবধারা যদি নষ্ট করে না দেওয়া হ'ত, তা হ'লে এমন করে আমরা ছোট হয়ে যেতে পারতাম না। বাঙলা সাহিত্যের উৎসাহ দেবার ভার যতদিন মুসলমান রাজাদের হাতে ছিল, ততদিন তা জনসাধারণের সাহিত্য ছিল। কারণ, আমাদের ধর্ম জনসাধারণকে নিয়ে। ইংরেজ আসার পরে বাঙলা দেশ হ'তে মুসলমানের প্রভাব নষ্ট হয়ে গেল। বাঙলা-সাহিত্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভদ্রলোকের সাহিত্য হয়ে দাঁড়াল।

আশ্চর্য্য হ'তে হয়, ইউরোপীয় যে কয়জন মনীষী বাঙলা গদ্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, তাঁরা দেশের লোকের মুখের ভাষাকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের ঢাকার ভাষায় প্রথম গদ্য বই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ এসে এই ভাষাকে জনসাধারণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভাষায় পরিণত করলেন। বাঙলা-সাহিত্য শুধুমাত্র দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের পকেটেই আবদ্ধ রইল। দেশের জনসাধারণ আর এর অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারল না। আজ যত করেই আমরা বঙ্কিম-হেম-নবীন, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের জন্য গৌরব বোধ করিনে কেন, একথা ভাবতে সত্যিই বড় কষ্ট, আজ বঙ্গভাষার বংশীধ্বনিতে যমুনা উজান বয় না, শ্যামলী-ধবলী গৃহে চলে না। বাঙলার নভেল উপন্যাসগুলি শুধু কলিকাতাবাসী কয়েকজন মধ্যবিত্ত লোকের কথায় ভরা। দেশের জনসাধারণ তার ভেতরে নিজেদের খুঁজে পায় না। তুমি হয়ত বলবে, আমি পরোক্ষে নিজের সাহিত্যের প্রশংসা করছি। কিন্তু একথা সত্য জেনো ভাই, ইউরোপের বড় বড় লেখক ওঁদের সমাজ নিয়ে—সংসার নিয়ে অনেক বড় বড় উপন্যাস লিখেছেন। আমাদের দেশের একজন লেখকও তাঁদের প্রতিভার কাছে দাঁড়াতে পারেন না। কিন্তু তবু আমরা মধ্যবিত্তরা আমাদের দেশের লেখকদের লেখা পড়ে বেশী আনন্দ পাই। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ পর্ব পড়ে আমরা যে আনন্দ পাই, শরৎচন্দ্রের আদর্শ উপন্যাসগুরু ডি.এন্সের নভেল পড়ে কি ততটা আনন্দ পাই? কেউ কেউ হয়ত বলবেন, পাই। কিন্তু সেকথা যে সত্য নয়, তার কারণ, বিদেশী কোন নভেলের অনুবাদই এপর্যন্ত আমাদের নাম করা দেশী কোন উপন্যাসের মত আদৃত হয়নি। আজ শহরের সাহিত্যিকেরা তাঁদের মধ্যবিত্ত-সমাজ নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করছেন, তা শহরের মধ্যবিত্তদের যেমন ভাল লাগে, গ্রামের মানুষের কাছে তেমন ভাল লাগছে না। গ্রামের মানুষ যখন শহরের মানুষের সমান শিক্ষিত হবে, তখনও ভাল লাগবে না। সাহিত্য যেমন বিশেষ, তেমনি তা ঘরেরও। বিশ্বসাহিত্যই বল, আর সাম্প্রদায়িক-সাহিত্যই বল, সব সাহিত্যই তৈরী হয় ঘরের প্রদীপ জ্বালানর জন্য। যে সাহিত্য ঘরে প্রদীপ জ্বালল না, সে-সাহিত্য বিশ্বেও আলোকপাত করতে পারে না। দেশের জনসাধারণের জন্যই ত সাহিত্য তৈরী হয়। অবশ্য আমি creative সাহিত্যের কথাই বলছি। কেউ সে-সাহিত্য বহুলোকের জন্যে তৈরী করে, কেউ তৈরী করে দেশের মুষ্টিমেয় কয়জন লোকের জন্যে। কোন্ সাহিত্য সব চাইতে বড়, এ নিয়ে আমি আজ নতুন করে তর্ক তুলতে চাইনে। আমার যতদূর মনে পড়ে Art-এর সংজ্ঞা লিখতে যেয়ে রাস্কিন একবার বলেছিলেন, Greatest pleasure for the longest number of men for the longest time. Longest time-এর কথা উল্লেখ করে রাস্কিন মহাকালকেই সাহিত্যের সব চাইতে বড় সমালোচক বলেছেন। একথা খুবই সত্যি। মহাকাল যে সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, তোমাদের সমালোচকেরা তার যতই স্তুতি কব্বাক, তার আয়ু 'দুবার শীঘ্র যেমন নীহারের [কণা]। মহাকাল কিন্তু দু-রকম সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

কালিদাসের classical সাহিত্য যেমন মহাকালের [বুনে] বেঁচে রয়েছে, আরব্যরজনীর গণ-সাহিত্যকেও সে তেমনি সমানে আদর দিয়েছে। বাইবেলের কতকগুলো অংশ জাতকের গল্পগুচ্ছ, ভার্জিলের মহাকাব্যের অংশ বিশেষ— এগুলোকে তুমি গণ-সাহিত্য ছাড়া আর কি নাম দেবে। এরা কি মানব মনে কালিদাস-দাস্তুর চাইতে কম প্রভাব বিস্তার করেছে? এদের মধ্যে কি greatest pleasure তুমি পাবে না? বাঙলা দেশের মুর্শীদাবাদ-গান বিচ্ছেদ-গান ও বাউল গানগুলোর মধ্যে এমন অনেক গান পাওয়া যায়, যেগুলো রবীন্দ্রনাথের বহু নামকরা গানের সঙ্গে তুলনা হ'তে পারে।”

‘আমাদের সাহিত্য সেবা’ প্রবন্ধে (২৫:১২, আশ্বিন ১৩৫০) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর সমন্বয়কারী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সৈয়দ এমদাদ আলী, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মওলানা আকরম খাঁর ১৩২৫ সালে প্রকাশিত অভিমতসমূহ উদ্ধৃত করে বাংলা ভাষাচর্চায় বাঙালী মুসলমানের কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। পাকিস্তান প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ‘মুসলমানী’ বাংলার স্বাভাবিক চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যে অত্যাশঙ্কিত পরিলক্ষিত হয়েছে তা যে অর্থহীন ও বিভ্রান্তিকর এ-ই হচ্ছে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর বক্তব্য।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ‘চিত্রাঙ্গদা’ (২৬:২, পৌষ ১৩৫০) একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ। প্রবন্ধে ডক্টর শহীদুল্লাহ রবীন্দ্র-কবিমানসের এক বিশেষ দিক বিশ্লেষণ করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন:

“রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য। কেবল নাট্যকাব্য বললে যথেষ্ট হবে না, এটি একটি রূপক নাট্যকাব্য। অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার রূপকে কবি বিশ্বের শাশ্বত নরনারীর সম্পর্ক সুন্দর ও মধুর ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। কবি নিজেই গ্রন্থ সূচনায় রূপকের ব্যাখ্যায় বলেছেন ‘সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে, সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে, তা হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশের ভাগ বসাবার অভিযোগে সতীন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এযেন তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্র শক্তি থাকে, তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানেই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ যুগল জীবনের জয়াযাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলি-প্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চরিত্র-শক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নিঃস্বপ্ন প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

কোন কোন উৎকট নীতিবাদী সমালোচক অশ্লীলতা আবিষ্কার করেছেন এবং সেই-জন্য কবিকে তিরস্কার করতে কুণ্ঠিত হননি। এঁদের হাতে গ্রীক ভাস্করের অপূর্ব সৌন্দর্য্যবতী ভেনাস মূর্তির কি দশা হত, এই প্রশ্ন মনে উঠে। যৌন সমস্যার মধ্যে দেহের কথা না এসে থাকতেই পারে না। কিন্তু কবি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শালীনতার সীমারেখা রক্ষা করেছেন। প্রথম মিলনের বর্ণনায় কবি অতি সাবধানে বিলাস লীলার উপর একখানি ঘন কালো যবনিকা টেনে দিয়েছেন—

‘দিলাম বাড়িয়ে, দুই বাহু।—চন্দ্র অন্ত গেল বনান্তরে, / অন্ধকারে ঝাপিল মেদিনী। স্বর্গ মর্ত/দেশকাল’ দুঃখস্বরূপ জীবন মরণ/অচেতন হ’য়ে গেল অগম্য পুলকে।’

অন্যস্থানে সেখানে চিত্রাঙ্গদা বলেছেন—

‘বাহুবল্লে/এস, বন্দী করি দৌহে দৌহা। প্রণয়ের/সুধাময় চির পরাজয়ে।’

তার উত্তরে অর্জুন বলেছেন—

‘ওই শোনো/প্রিয়তমে, বনাস্তের দূর লোকালয়ে/আরতির শান্তি শঙ্খ উঠিল বাজিয়া।’

এখানে চমৎকার ভাবে কবি শৃঙ্গার-রসকে শান্তি রসে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এখানে যেন কবি আমাদের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন—

‘আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্ম মানবের/শান্তি সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল। /নিবাও বাসনা-বহি
নয়নের নীরে,/চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই।’

গত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে বর্তমান সভ্য জগতে যে নারী সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে, কবি এই রূপক নাট্যকাব্যে তার এক চমৎকার সমাধানের ইঙ্গিত করেছেন। আধুনিক নারী অবলা কোমলা নয়। সে কেবল টেনিস, ক্রিকেট, রেস ও মল্লযুদ্ধে পুরুষকে পরাজিত করে সন্তুষ্ট হয় না, রণক্ষেত্রেও সে পুরুষের মাথা হতে যশোমাল্য কেড়ে নিতে চায়। গৃহিণীর এক্ষেপে জীবন, মাতৃস্বের গুরুভার তার পক্ষে অসহ্য। দোষ কেবল নারীর একার নয়, পুরুষ সমান দোষে দোষী। সে সংসারী হ’তে চায়না। সেটাকে সে বিষম ঝগড়া মনে করে, তাই সে মধুকর বৃত্তি অবলম্বন করেছে। ফলে দাঁড়িয়েছে আত্মহত্যার চেয়েও গুরুতর জাতিহত্যা। সভ্যদেশের আইনে Personal suicide দণ্ডনীয় কিন্তু National suicide উপেক্ষণীয় হয়েছে। চিত্রাঙ্গদা নাট্যের পরিসমাপ্তিতে কবি চিত্রাঙ্গদার মুখে বলিয়েছেন—

‘গর্ভে/আমি ধরেছি যে-সন্তান তোমার, যদি/পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে/দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে এক-দিন/পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে, /তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম! /আজ/ওধু নিবেদি’ চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা/রাজেন্দ্রনন্দিনী।’

উত্তরে অর্জুন বললেন—‘প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।’

এখানে নাটকের যবনিকা পতন হয়েছে। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের এই সংলাপ কোন স্থূল সমালোচকের কাছে হয়ত নিতান্ত Common place inartistic prosaic মামুলী কলা রহিত গদ্য মাত্র বলে মনে হ’তে পারে। কিন্তু এয়ে কবির নব-নারীর যুগল জীবনের পথে বহুমূল্য উপদেশ, এটি আমাদের মনে রাখতে হবে। যদি এ কথাগুলো না বলা হ’ত, তবে নাটকের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। লর্ড টেনিসন্ তাঁর Princess কাব্যে নারী-জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে বলেছেন—

—“The woman’s cause is man’s : they rise and sink
Together, dwarf’d and Godlike, bond and free.”

*

*

“If she be small, slight-natured, miserable
How shall men grow ? but work no more alone !

*

*

For woman is not undeveloped man,
But diverse ; could we make her as the man
Sweet love were slain : his dearest bond is this,
Not like to like, but like in difference.

Yet in the long years liker must they grow ;
 The man be more of woman, she of man
 He gain in sweetness and in moral hight
 Nor lose the wrestling thews that throws world.
 She mental breadth, not fail in child ward care
 Nor lose the childlike in the larger mind ;
 Till at the last she set herself to man.
 Like perfect music unto noble words ;

*

*

Then comes the statelier Eden back to men,
 Then reign the world's great bridals, chaste and calm ;
 Then springs the crowning race of human kind."

এর সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা নাটকে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—‘আমি চিত্রাঙ্গদা।/দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।/পূজা করি’ রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি/নহি, অবহেলা করি পুষ্টি রাখিবে/পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্ব রাখি/মোরে সঙ্কটের পথে, দূরহ চিত্তার/যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো/কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,/যদি স্বখে দুঃখে মোরে করো সহচরী,/আমার পাইবে তবে পরিচয়।’

চিত্রাঙ্গদায় কবি নারীকে দ্বিমুখিত্তে প্রকটিত করেছেন। বীর্যবতী নারী, রূপবতী নারী গৃহিণী নারী। নারী জীবনের ব্যর্থতার কথা বলতে যেয়ে ১৫।১৬ বৎসর পূর্বকার আমার প্যারিস-জীবনের কথা মনে হল। সেখানকার তরুণীরা যখন গুনত ভারতবর্ষে অনেকেরই ভাগ্যে অনায়াসে স্বামী লাভ ঘটে, তখন তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হত, তারা ভারতভূমিকে স্বর্গভূমি বলে মনে করছে। নারী পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে না তার পৌরুষ দিয়ে। অন্য পথে পৌরুষবিহীন পুরুষ নারীকে জয় করতে পারে না। বর্তমান সভ্য জগতে নারীরা যেমন হয়ে উঠেছে Masculine পুরুষগুণ সম্পন্ন, পুরুষও তেমনি হয়ে উঠেছে effeminate নারী-গুণ সম্পন্ন। চৌম্বক ধর্ম positive, negative-কে আকর্ষণ করে, negative negativeকে positive positiveকে বিকর্ষণ করে। নারী-পুরুষের মধ্যেও ঘটেছে তাই। এই তথ্যটি কবি চিত্রাঙ্গদায় কি মন্ত্রগ্রাহীরূপে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। বীর্যবতী চিত্রাঙ্গদা পুরুষ বেশে পুরুষভাবে মৃগয়া করতে বনে গিয়ে সাক্ষাৎ পেলেন এক অপরিচিত পুরুষের। ‘রুধিয়া সঙ্কীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান/ভূমিতলে, চীরধারী মলিন পুরুষ।’

পৌরুষবর্জিত এই চীরধারী পুরুষ নারীত্বের নিকট নিতান্ত অগ্রহেয়। তাই চিত্রাঙ্গদা তাঁকে অবজ্ঞার স্বরে পথ ছেড়ে সরে যেতে বললেন। কিন্তু সেই পুরুষ নড়লে না, এমন কি ফিরিয়েও তাকালে না। এই পরাবাতের যোগ্যহীন পুরুষকে চিত্রাঙ্গদা পা দিয়ে ছোঁয়ারও অযোগ্য মনে করে ক্রোধভরে ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে তাড়না করলেন। কিন্তু যখন সেই পুরুষটি এই অপমানে তাঁর সরল স্তনীর বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে তীরবেগে চিত্রাঙ্গদার সামনে মুক্তিমান পৌরুষরূপে দাঁড়িয়ে উঠল—‘ভ্রমসুপ্ত অগ্নি যথা/ধৃতাভূতি পেয়ে শিখারূপে উঠে উর্ধ্ব চক্ষের নিমিষে।’

তাকে দেখে চিত্রাঙ্গদার মনের ভাব যে কি হল, সে নিজেই পরে মদনের কাছে তা অকপট ভাবে বলেছে ‘শিখে’ পুরুষের বিদ্যা, প’রে পুরুষের/বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন/ভুলে ছিনু, যাহা সেই মুখে চেয়ে, সেই/আপনাতে-আপনি-অটলমুষ্টি হেরি,/সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী/আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু/সম্মুখে পুরুষ মোর।’

অন্যপক্ষে পরদিন প্রাতে যখন চিত্রাঙ্গদা গেলেন অর্জুনের নিকটে নারী বেশে কিন্তু সর্বাঙ্গে জড়িত পুরুষভাব, তখন অর্জুন তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন এই বলে—

‘ব্রহ্মচারীব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য/নহি, বরাদ্দনে।’

তখন চিত্রাঙ্গদার মনে হ’ল—‘এতদিন পরে,/বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন/না যদি জিনিতে পারি, বৃথা বিদ্যা যত।/অবলার কোমল মৃণাল বাহুদুটি/এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।/ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণ-তনুলতা/পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে/মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার/তেজ।’

আমরা দেখলাম পুরুষগুণসম্পন্না নারী পুরুষের মন টানতে পারে না। চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যানের কারণ অর্জুনের ব্রহ্মচর্য্য নয় চিত্রাঙ্গদারই পুরুষবীর্য্য। এরপর আমরা দেখি রূপবতী নারী। একই নারী একদিন রূপহীন এবং অন্যদিন রূপবতী হতে পারে এই অসম্ভবের সম্ভবনা ঘটিয়েছেন কবি মদন ও বসন্তের বরদানে। এখানে পৌরাণিক উপাখ্যান আশ্রয়ের সঙ্গতি বুঝতে পারি। পুরাণে সম্ভব অসম্ভব সকলেরই ঠাঁই আছে। এজন্য অতি প্রাকৃতের অবতারণায় চিত্রাঙ্গদার কিছুমাত্র শিল্পহানি করেনি। বীর্য্যবতী ও রূপবতী দুই বিভিন্ন নারীকে পুরুষের সামনে উপস্থিত করে পুরুষচিত্তে নারীর পৌরুষ ও রূপের আকর্ষণের তারতম্য এমন জাজ্জ্বল্যমানরূপে দেখান যেত না। অর্জুন একদিন যাকে ব্রহ্মচর্য্যের অজুহাতে নিতান্ত হেলাভরে বিদায় দিয়েছিলেন তাঁকেই যখন অপূর্ব্ব রূপসী রূপে সামনে দেখলেন, তখন ব্রহ্মচর্য্য সমেত নিজেকে অনায়াসে তাঁর চরণে সমর্পণ করলেন। তিনি বললেন—

‘খ্যাতি মিথ্যা,/বীর্য্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে/সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা/পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি বিশ্বের ঐশ্বর্য্য/তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি/মহা অবসান, সকল কর্ণের তুমি/বিশ্রামরূপিণী। কেন জানি অকস্মাৎ/তোমাতে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি/কি আনন্দ কিরণেতে প্রথম প্রত্যাঘে/অন্ধকার মহার্ণবে স্রষ্টাশতদল/দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মোচিত হয়ে/এক মুহূর্ত্তের মাঝে।’

কবি ‘উর্বশী’ কবিতায় এই সৌন্দর্য্যের প্রভাব ঘোষণা করেছেন—

‘যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী/হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্বশি! /মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পনে তপস্যার দল/তোমারই কটাক্ষ যাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল,/তোমার মদির গন্ধে অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,/মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ করি ফিরি লুপ্ত চিতে,/উদ্দাম সঙ্গীতে।/নুপুর গুঞ্জরী’ যাও আকুল অঞ্চলা/বিদ্যুৎ চঞ্চলা।’

কবি ‘গুপ্তপ্রেম’ কবিতায় রূপহীনতার অভিলাষ সুন্দর দেখিয়েছেন—

‘তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গাত দিলে/রূপ না দিলে যদি বিধি হে! /পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া/পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?’

রূপের পূর্ণ সম্ভোগ সংসারের বাইরে। এজন্য বৈষ্ণব কবির পরকীয় তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। এইজন্যই শ্রীমতী রাধিকা স্বকীয় হয়েও পরকীয়। তাই কবি সৌন্দর্য্যের প্রতীক উর্বশীকে সম্বোধন করে বলেছেন—

‘নহ মাতা নহ কন্যা, নহ বধু সুন্দরী রূপসি/হে নন্দন বাসিনী উর্বশী!’

চিত্রাঙ্গদা নাটকেও আমরা দেখি—

‘চিত্রাঙ্গদা ॥ এ প্রেমে গৃহ আছে ?

অর্জুন ॥ গৃহ নাই ?

চিত্রাঙ্গদা ॥ নাই।

গৃহে নিয়ে যাবে ? বোলো না গৃহের কথা।’

রবীন্দ্রনাথ ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে বলেছেন :

‘সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মত ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে, তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমে বিমর্ষ ও বিকৃত হইয়া আসে। কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী হয় না।’

এই নাটকেও আমরা দেখতে পাই সংসারের বাইরে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেমলীলার মধ্যে শ্রান্তি ও অবসাদ ক্রমে এসে পড়েছে। অর্জুন কেবল রূপ উপভোগে আর পরিতুষ্ট হতে পারছেন না। তাঁর মন গুহ্মে কাঁদছে সংসারে ফিরে যাবার জন্যে। অর্জুন আবার জিজ্ঞাসা করছেন—‘কোনো গৃহ নাই তব, প্রিয়ে, যে-ভবনে/কাঁদিয়ে বিরহে তব প্রিয়পরিজন?’

চিত্রাঙ্গদা বলেছে—‘প্রশ্ন কেন ? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে।’

সংসারবন্ধনবিহীন নামগোত্রহীন নারীর প্রতি ভালবাসা, সে যতই রূপসী হোক, চিরদিন টিকতে পারে না। অর্জুন বলেছেন—‘তাহারে যে ভালবাসে/অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে/আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন/দাও তা’রে, স্বখে দুঃখে স্মৃতিতে দুঃদিনে।’

উত্তরে চিত্রাঙ্গদা বলেছেন—‘এখনও যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরি/মাঝে ? হায় হায়, এখন বুঝি পুষ্প / স্বপ্নপরমায়ু দেবতার আশীর্ব্বাদে।’

রূপের আকর্ষণকে স্থায়ী করতে হলে গুণ চাই। অর্জুন দয়িতার মধ্যে কেবল রূপই দেখেছেন, গুণ দেখেননি। তাই যখন জনশ্রুতিতে রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গুণের কথা শুনলেন, তখন সেই অপরিচিতার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। সত্যিই এখন অর্জুনের রূপে বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। তিনি ‘রমণীর কমনীয় দুই বাহু’ পরে/স্বাধীন সে অসঙ্কোচ বল, ধিক, যাক্/তার কাছে রুনুঝু কঙ্কন কিঙ্কণী অগ্নি বরারোহে, বহুদিন কর্ণহীন/এ পরাণ মোর। উঠিছে অশান্ত হয়ে/দীর্ঘ শীত-স্বপ্নোখিত ভুজঙ্গের মতো। /এসো এসো দৌঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে/পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে/দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মত। বাহিরিয়া/যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিজ/পুষ্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনমোর/অরণ্যের অঙ্গগর্ভ হতে।’

এই কর্ণ-জীবনের আহ্বানে চিত্রাঙ্গদা জিজ্ঞাসা করলেন—

‘যামিনীর নর্দসহচরী,/যদি হয় দিবসের কর্ণসহচরী,/সত্যত প্রস্তুত থাকে বামহস্তসম/দক্ষিণ হস্তের অনুচর, সেকি ভালো/লাগিবে বীরের প্রাণে?’

এই প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বললেন—‘সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে/মনোহর কায়্যা মায়াধরি, তার পরে/সত্য দেখা দেয়, ভূষণ-বিহীনরূপে/আলো করি’ অন্তর বাহির। সেই সত্য/কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে। /আমায় যে-সত্য তাই লও। শ্রান্তিহীন/সে-মিলন চিরদিবসের।’

পরিশেষে আমরা দেখি চিত্রাঙ্গদাকে গুণবতী গৃহিণী রূপে। পূর্বে বসন্ত যে তাঁকে বলেছিলেন—

‘ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ, তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে / আপনি ঝরিয়া প’ড়ে যাবে, তাপক্লিষ্ট/লঘু লাভণ্যের দল; আপন গৌরবে/তখন বাহির হবে; হেরিয়া তোমারে/নুতন সৌভাগ্য বলি’ মানিবে ফাল্গুনী।’

তা অক্ষরে অক্ষরে ফলল। তাঁর অন্তরের পরিচয় পেয়ে অর্জুন বলে উঠলেন—‘প্রিয়ে আজ ধন্য আমি।’ এখানেই এই নাট্য-কাব্যের পাঠসমাপ্তি।’

‘আনন্দমঠ কি স্বদেশী গ্রন্থ?’—পুলকেশ দে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ (চৈত্র ১৩৫০ ও বৈশাখ ১৩৫১)। তথ্য সমাবেশে, বিশ্লেষণে ও সিদ্ধান্ত নির্দেশে একজন সতর্ক গবেষকের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। প্রবন্ধটির প্রধানাংশ উদ্ধৃত হল:

“ঐতিহাসিক পটভূমিকা। ছিয়াত্তরে মনুস্তর ও সমসাময়িক সন্ন্যাসীবিদ্রোহকে জড়িয়ে বঙ্কিমের আনন্দমঠ। স্বয়ং বঙ্কিম এই ঐতিহাসিক পটভূমিকা সূক্ষ্ম করবার জন্য উপন্যাস ও ক্রোড়পত্রে তার আভাষ দিয়েছেন। উপন্যাসে আছে মনুস্তরের বর্ণনা; আর ইংরাজী ক্রোড়পত্রে আছে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের ইতিকথা। সে ইতিকথা সন্ন্যাসীদের রচনা নয়, ইংরেজের। কেননা,

“বাংলায় তাদের অভিযান হেষ্টিংসের শাসন কালের দ্বিতীয় বছর থেকেই বন্ধ হয় এবং তারা অন্য কোন প্রদেশে আর কোন হাঙ্গামা করেছিল কিনা ইতিহাসে সে তথ্য পাওয়া যায় না। ...আজকালও নানা রকম ভবঘুরে দল উপদল দেখা যায়; ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ কর্মচারীরা ছাড়া এদের সম্বন্ধে কেউ বিশেষ কিছু জানেন না; এঁরাই এদের সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু এদের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের কোন সাদৃশ্যই নেই।” (Vincent Smith, p. 516)

ওয়ারেন হেষ্টিংসের বাংলায় শাসনকাল ১৭৭২-এর এপ্রিল থেকে ১৭৭৪; তাহ’লে বাংলায় সন্ন্যাসীদের অভিযান ১৭৭৩ থেকেই শেষ হয়েছে। Vincent Smith যেখানে বলছেন: history does not mention, সেখানে তিনি কোন ইতিহাস এবং কাদের রচিত ইতিহাস উল্লেখ করছেন জানি নে; তবে মনে হয়, তাঁর বিশ্বাসযোগ্য কোন ইতিহাস তাঁর গোচরে আসেনি। সেজন্য কোন একটা সরকারী সূত্রের অনুসন্ধানে তাঁর মন একেবারে criminal tribes and organisations-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সুতরাং তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্মচারীর ঝুলি বৃথাই খুঁজে মরেছেন। এদের যে কি জাত তা তিনি জানেন না, তবে হেষ্টিংসের উল্লেখ ক’রে তিনি জানিয়েছেন এরা were recruited by kidnapped children, who must have come from all classes. (ibid)

এখানে অবশ্য বঙ্কিমের উপন্যাস বিস্তারের অবসর আছে; কেননা, বঙ্কিম আনন্দমঠ লিখতে গিয়ে সামান্য ঐতিহাসিক বিচ্যুতির উপেক্ষায় লিখেছেন; ‘উপন্যাস—উপন্যাস, ইতিহাস নহে।’

তাহ'লেও বন্ধিম কিন্তু ইতিহাসকে বর্জন করেন নি। হেষ্টিংস ১৭৭৩ এর ৯ই মার্চ যে চিঠিখানি Josias Du Pre-কে লিখেছিলেন ডিনসেন্ট স্মিথ তাঁর ইতিহাসে এবং বন্ধিম তার ক্রোড়পত্রে সে চিঠিখানি উদ্ধৃত ক'রেছেন। তাতে সন্ন্যাসীদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় :

‘এদের ইতিহাস অদ্ভুত। কাবুল থেকে চীন পর্য্যন্ত তিব্বত পাহাড়ের দক্ষিণে বিস্তৃত ভূখণ্ড এদের দখলে আছে অথবা এখানে তারা বসবাস করে। এরা বেশীর ভাগই নগ্ন। তাদের না আছে সহর, বাড়ী বা পরিবার ; অনবরত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। আর যেদেশ দিয়ে যখন যায় তখন সেখানকার স্বস্থ-বলিষ্ঠ ছেলেরপিলে দেখলেই অপহরণ করে তাদের দলে টেনে নেয়। এই ভাবে তারা ভারতবর্ষের সব চাইতে বলিষ্ঠ ও সব চাইতে কর্মতৎপর হ'য়ে দাঁড়ায়। এদের অনেকেই বণিক। এরা সবাই তীর্থযাত্রী এবং সব শ্রেণীর জেণ্টুরাই (হিন্দুরাই) এদের শ্রদ্ধা ক'রত। এরই জন্য এদের গতিবিধি সংগ্রহ করার উপায় ছিল না ; অথবা এদের বিরুদ্ধে কোন সাহায্যই গ্রাহ্যকর পাওয়া যেত না। এই উদ্দেশ্যে খুব কড়া আদেশ প্রচার ক'রেও সুবিধে হয়নি। এমন কি, মাঝে মাঝে দেশের মাঝখানে এমন ভাবে তারা আবির্ভূত হ'ত যে, যেন তারা এইমাত্র আকাশ থেকে পড়ল। তারা কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী ও পরমোৎসাহী। এরাই সন্ন্যাসী, হিন্দুস্থানের জিপ্সি!’

এখানে কিন্তু ঐতিহাসিকের অনেক কিছু অনুসন্ধান করার আছে। তিব্বতের দক্ষিণে কাবুল থেকে চীন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার তারা যে শুধু অধিবাসী ছিল তাই নয়, এই দেশ ছিল তাদের দখলে। নিতান্ত সামান্য কথা এ নয়। অন্তত ঐতিহাসিকের পক্ষে এদের criminal tribe ব'লে উড়িয়ে দেয়া অসম্ভব, অনৈতিহাসিক অন্যায্যও বটে। ইংরেজ রাজত্বের আগে এদেশে অরাজকতা ছিল একথা প্রমাণের জন্য এই বিক্ষিপ্ত ইতিহাসের অপব্যবহার আরও অন্যায্য। এরা নগ্ন ছিল ; তবে কি এরা নাগা ? হেষ্টিংসের আর একখানি চিঠিতে বলা হ'য়েছে যে, এরা ‘wandering Fakeers, who annually infest the province, about this time of the year in pilgrimages to Jaggernaut, going in bodies of 1,000 and sometime even 10,000 men.’ (বন্ধিমের ক্রোড়পত্র)

অথচ এদের না আছে সহর, না আছে ঘর-বাড়ী, না আছে পরিবার ; যেন নিছক ঘুরে বেড়াবার জন্যই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায় ; আর ছেলে ধরে বেড়ায়। ভারতবর্ষের মধ্যে এরাই বলিষ্ঠতম ও সর্বাধিক কর্মতৎপর। এদের অনেকেই বণিক। কিন্তু সকলেই তীর্থযাত্রী। এবং সর্বপ্রকার হিন্দুর শ্রদ্ধার পাত্র। কঠোর আদেশ সত্ত্বেও এদের চলাফেরার কোন তথ্য পাওয়া যেত না বা এদের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর হিন্দুদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হ'ত এরা এমন জায়গায় এল কি ক'রে ; আকাশ থেকে পড়ল বুঝি ? বেশ কষ্টসহিষ্ণু এরা, বেশ সাহসী আর এমন চটপটে যে প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। এখন ঐতিহাসিক বলুন, এরা পাহাড়ে না, বুনো, বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সন্ন্যাসবাদী, না, কাবুল থেকে চীন পর্য্যন্ত একটা সঙ্ঘবদ্ধ ও স্বেচ্ছাসিদ্ধ বিস্মৃত জাতি ? এ কাজ ঐতিহাসিকের।

উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নয়। ঐতিহাসিক বিচ্যুতির পক্ষ সমর্থনে বন্ধিম একথা ব'লেছেন বটে কিন্তু খুশীমত ইতিহাস ব্যবহারেরও এক দায় আছে ; সে দায়টা হ'চ্ছে এই যে, তাতে ক'রে অনেক সময় ‘বল্লামনা বল্লাম না’ করেও আধাসত্য বলা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় প্যারার শেষে মনুস্তর প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশটাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল।'

বঙ্কিমের ক্রোড়পত্রে হেষ্টিংসের পত্রে আছে:

'বোর্ড অব রেভিনিউ একথা জানা সত্ত্বেও নেহাৎ তেমন না হ'লে রাজস্ব মকুবের কোন অজুহাত মানবেন না ব'লে স্থির করেছিলেন; তাঁরা আশা করেছিলেন যে, এইভাবে তাঁরা সরকারের ওপর চাপ বা ক্ষতি সাধলে নেবেন।'

'সন্যাসীরা এই প্রদেশের উত্তর-পূর্বাংশে স্থায়ী বাসস্থান গড়েছে। আমার ইচ্ছা যে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে আর যে সব জমিদার তাদেরকে রক্ষা এবং সাহায্য করেছে সেই সব জমিদারদের কঠোর শাস্তি দিয়ে আমি তাদের বিরুদ্ধে আরও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাই।'

প্রথম চিঠিখানির তারিখ ৩রা মার্চ ১৭৭৫: দ্বিতীয়খানির ২০শে মার্চ ১৭৭১ এবং দ্বিতীয়টিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পিটুনী পুলিশ ও পাইকারী জরিমানার কথা মনে আসে। কিন্তু রেজা খাঁ ক্লাইভের সৃষ্টি বা আবিষ্কার। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গার যুদ্ধ জয়ের পর ক্লাইভ সামরিক পরিচালনা ছেড়ে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যায় মনোযোগ দেবার অবসর পেলেন। তাই,

'বাংলার নূতন নবাবকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত ক'রে উপাধিবিশিষ্ট পেন্সনভোগীকে পরিণত করা হ'ল। ***ক্লাইভ অবশ্য বৈত শাসনের আবরণটা রাখতে এবং নবাবের নামে শাসন পরিচালনাই বজায় রাখতে চাইলেন; নবাবের ক্ষমতা দু'জন নবাব বা ডিপুটির হাতে দেয়া হল; মহম্মদ রেজা খাঁ থাকলেন বাংলায় এবং মহারাজ সিতাব রায় থাকলেন বিহারে।'

স্থির হ'ল বাংলার রাজস্ব থেকে শা আলম ছাব্বিশ লক্ষ টাকা পাবেন।

'এর বদলে সত্ৰাট রাজস্বের দাবী ছাড়বেন এবং নিয়মানুভাবে কোম্পানীকে ২৪ পরগণার, বর্ধমান জেলা, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও উত্তর সরকারের দখল দেবেন।'

ভিনগেণ্ট স্মিথ আরও বলেন,

'Lord Mahon observes that Clive obtained from the fallen Emperor a Dewanee or public deed conferring on the English Company the sole right of administration throughout the provinces of Bengal, Orissa and Bahar.'

আজকের ১৯৪৩-এর মনুস্তরের দিনে রেজা-খাঁ কাহিনী স্পষ্টতর ক'রতে হ'লে নাজিমুদ্দিন হার্বার্ট-কাহিনীটা ব'লতে হয়। সেই মনুস্তরের দিনে রেজা খাঁ শিখণ্ডী হ'য়ে আছেন, এ মনুস্তরের দিনেও পালিমেন্ট-গৃহে স্বনামধন্য মিঃ আমেরির সাফাই ও কেন্দ্রীয় গভর্ণ-মেন্টের দায়িত্ববোধের মুপকাঠে কে বা কারা শিখণ্ডী হবেন সেকথাও ঐতিহাসিক বলুন। মনুস্তরের সঙ্কটের দিনে রেজা খাঁর মতই সরফরাজ পাওয়া যায়; তাদের পিছনে থাকেন ক্লাইভ বা হার্বার্ট। সুতরাং যেখানে double government চলছে সেখানে শুধু রেজা

খাঁকে সরফরাজির দায়ে বলি দিলে হবে কেন? যুদ্ধের ফলে যে অসামরিক অব্যবস্থা দেখা দেয়, তা সেদিনও যেমন গণ্য হয়নি আজও হ'চ্ছে না। বন্ধিমচন্দ্র যে তথ্যের ভিত্তি ক'রে একমাত্র রেজা খাঁকেই সরফরাজির দায়ে ফেলেছেন তা হ'চ্ছে এই:

‘ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দুভিক্ষের প্রতিকার করেনি বলে তাদের দায়ী করা যায় না। তারা তখন দেশের শাসক ছিল না; দেশের রাজস্ব ব্যাপার সবটাই রেজা খাঁর তাঁবে ছিল। রেজা খাঁ জনসাধারণের দুঃখকষ্টে মাথা ঘামাননি। তিনি সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় করেছিলেন এবং তার ওপর ১৭৭১ এর জন্য শতকরা দশ ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।’

তাই বন্ধিমচন্দ্র লিখেছেন, (মহম্মদ রেজা খাঁ) ‘একে বারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল।’

মীরজাফরের আমল থেকে রেজা খাঁর আমল পর্যন্ত যাঁদের ইতিহাস পড়া আছে তাঁরা জানেন, কোম্পানীকে কে কত দিয়ে খুশী করতে পারে তারই ওপর ক্লাইভের গর্দভ মনোনীত হ'ত। রেজা খাঁর আমলে নেহাৎ মনুষ্যের ঘনিয়ে এল, তাই রেজা খাঁর আমলে কোম্পানীর কর্তারা কুস্তীরূপে বিসর্জন করেছেন। আজই কি তার মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয়েছে! অতি আধুনিক কালে বাংলাদেশে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকের পদত্যাগ হার্বার্ট কিভাবে এবং কোন্ বণিক সঙ্ঘের প্ররোচনায় আদায় ক'রে নিয়েছেন তা সবাই জানে। সেই বিচারবুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি নিয়েই হেষ্টিংসের নীচের কথাগুলো গ্রহণ ক'রতে হবে:

‘এদেশের ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যে দুভিক্ষ হ'য়েছিল এবং সারা বছর ধরে চলেছিল তার ভয়াবহ পরিণাম আমরা নিয়মিত আপনাদের ও জনসাধারণকে জানিয়েছি; তাতে লোকের মনে অনুকম্পা ও আপনাদের অধীনদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সঞ্চারের জন্য সব রকম তথ্য ও ভাষার সব রকম কারিকুরিই আছে; দুর্ভাগ্যবশতঃ কর্মচারীরা শুধু সমসাময়িকদের দুর্ভোগ চোখ চেয়েই দেখেছে।’

হেষ্টিংস বলছেন, কিন্তু এতে রাজস্বের কোন ক্ষতি হয়নি,

‘কেন না, দেশের কমপক্ষে একতৃতীয়াংশ লোকক্ষয় এবং পরিণতিস্বরূপ আবাদ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের রাজস্ব আদায় ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের পরিমাণকেও ছাপিয়ে গেছে।’

এ রকম একটা বিপর্যয়ের পরিণতিস্বরূপ আশঙ্কা করা গেছল রাজস্বের পরিমাণ ঐ অনুপাতে কম হবে। তা হয়নি। পরিমাণটা ঠিক বজায় আছে। কিন্তু এ কি ক'রে সম্ভব? না,

To ascertain all the means by which this was effected will not be easy.

পুলিশী-ইতিহাস চিরকালই এরকম থাকতে বাধ্য; শ্যামাপ্রসাদ-কুন্তল-বিজয়লক্ষ্মীর রোদন অরণ্যেই প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরবে; ইতিহাসে আমেরি-লিনলিথগো-স্মরাবদীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ থাকতে এবং উপন্যাস যদি আইনের হাত থেকে বাঁচতে হয়, তবে আগামীকালের বন্ধিমকে ঐ ইতিহাসের ভিত্তিতেই উপন্যাস লিখতে হবে। কিন্তু যেসব শিখণ্ডীদের পুরোভাগে দাঁড় করিয়ে আসল কারিগরেরা কাজ সারেন, তাঁদের চরিত্র মহাত্ম্য ও পরিণতি যেন একেবারে বাঁধা-ধরা। মীরজাফর, রেজা খাঁ বা আজকের অনামা শিখণ্ডীদের পরিচয় একই। তাই,

‘মহম্মদ রেজা খাঁ ও মহারাজ সিতাব রায় নামেই নবাবের ডিপুটি ছিলেন ; প্রকৃত পক্ষে তাঁরাই ছিলেন যথাক্রমে বাংলা ও বিহারের গভর্ণর। নন্দকুমার প্রভৃতির অভিযোগ-ক্রমে তাঁদেরকে তহবিল তহররূপের জন্য বিচারের উদ্দেশ্যে পাঠাবার জন্য ডিরেক্টররা জেদ ধরলেন। হেষ্টিংস বেশ কৌশলে তাঁদের প্রেস্তার করলেন।’

Both the accused officers were honourably acquitted.

কিন্তু ছিয়াত্তরে মনুষ্য হ’য়েছিল কেন? বঙ্কিমের উপন্যাসে তার কারণ দেয়া আছে :

‘১৭৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১২৭৫ সালে চাল কিছু মহাঘা হইল—লোকের ক্রেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহা করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন।***অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কান্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না।’ (প্রথম পরিচ্ছেদ)

স্মিথ বলেন,

‘আগেভাগেই বর্ষা শেষ হ’য়ে যাওয়াতে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে দুভিক্ষ হয়েছে। যা কিছু সামান্য ধান হয়েছিল তা শুকিয়ে গেল আর ডিসেম্বরে যে ফসল ঘরে ওঠার কথা, তার উৎপাদনে পড়ল বাধা। পথাভাব ও সে সময়কার অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থায় একবার অনাবৃষ্টির ফলেই অভূতপূর্ব দুভিক্ষ দেখা দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ঢাকা এবং দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের বিশেষ কিছুই হয়নি। গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণে বাংলা ও বিহারের অবশিষ্টাংশ নির্জন, নিস্তব্ধ ও পরিত্যক্ত।***মে ও সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সব চাইতে বেশী কষ্ট হ’য়েছিল। জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হয়। বেসরকারী মহল থেকে সামান্য যা কিছু সাহায্য পাওয়া গেছিল তা এই অসামান্য দুর্গতি নিরসনে কিছুই কর্তে পারেনি। মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট জানিয়েছেন যে, জীবিতেরা মৃতদেহ খাচ্ছে আর রাস্তাঘাট মৃতদেহে আকীর্ণ।’

তখন দুভিক্ষ নিবারণের বাধা ছিল উপযুক্ত পথের, আজ দুভিক্ষ নিবারণের বাধা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। তখন নাকি ঢাকা ও দক্ষিণ-পূর্বাংশ বিপন্ন ছিল; এবার নিখিল বাংলা। স্মিথ বেসরকারী সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন; কারণ, তখন প্রকৃত শাসকেরা ছিলেন বেসরকারী। আমেরির মুখে কিন্তু এখনই শুধু সরকারী সাহায্যের কথা এবং ঘটনাকে সামান্য ক’রে দেখার বর্ণনা শোনা যাচ্ছে।

সুতরাং এই ধরনের ইতিহাস বা সরকারী দলিলের ওপর নির্ভর ক’রে কাহিনী বর্ণনা মোটেই বিপন্ন নয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্র দুভিক্ষের এমন পর্য্যায় পর্য্যন্ত বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে মানুষ মানুষের দেহ খেতে রাজী। কিন্তু তাঁর রুচিবোধ তাঁকে এবিষয়ে বেশীদূর এগোতে দেয়নি। নরমাংস খাওয়ার দৃশ্য বাস্তব জীবনে যত মারাত্মক সত্যই হোক—বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে তা নিতে রাজী হন নি। সেদিক থেকে দুভিক্ষের ক্রমগতির বর্ণনা আজও অতুলনীয় হ’য়ে আছে।

‘লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়?—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল-ঘোয়াল

বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘর-বাড়ী বেচিল, জোত-জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপরে মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী, কে কিনে? খরিদদার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা, কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।’

‘রোগ সময় পাইল,—জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয় বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকে দেখে না, মরিলে কেহ ফেলে না। অতি-রমণীয় বপু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।’ (প্রথম পরিচ্ছেদ)।

এ আজও সত্য। বাংলায় এ যেন চিরন্তন প্রত্যক্ষ সত্য। তখন পথাভাবের অজুহাত ছিল, আজ বিমানের দিনে ইংরেজরা নূতন অজুহাত পেয়েছে এবং এ সত্যকে over-dramatisation বলছে। রাষ্ট্রশক্তি যাদের হাতে তাদের লজ্জা থাকতে নেই, কেননা ভয়ের কোন কারণ নেই, পরাধীনতার স্বখে এসত্যই আমরা উপলব্ধি করিতেছি।

কিন্তু কিছু বাধা আছে। বঙ্কিম যে বর্ণনা দিয়েছেন তার ক্ষেত্র ইংরাজ-কুশাসন ও অব্যবস্থার নয়। আমাদের এই প্রত্যক্ষ সত্য উপলব্ধি ও বঙ্কিমের অনুপ্রেরণার মধ্যে আদর্শগত বৈষম্য ও তারতম্য আছে। আনন্দমঠে বঙ্কিমের সেই লক্ষ্যটি ধরতে না পারলে সমগ্র আনন্দমঠটাই ভুল গড়া হবে।

বঙ্কিমের লক্ষ্য ॥ ভূমিকা পার হ’য়ে যাঁরা শুধু উপন্যাস পড়েছেন তাঁদের অপ্রস্তুত মন চতুর্থ খণ্ড বা শেষখণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ বা শেষ পরিচ্ছেদে নিশ্চয়ই কাতর হ’য়ে পড়েছে। পাঠকও সত্যানন্দের মত বিস্মিত ও হতচিন্ত হ’য়ে পড়েন। যুদ্ধ জয়ের মুহূর্তে সত্যানন্দের প্রতি প্রত্যাখ্যানের আদেশ চিকিৎসক বা মহাপুরুষের অভিপ্রায় সন্দেহ সত্যই সন্দেহ জাগে।

‘আমি যে মুহূর্তে যুদ্ধ জয় করিয়া সনাতনধর্ম নিকণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?’

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে এই যুদ্ধের জয় কাহিনী আছে :

‘যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সংঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তান সেনাসংঘর্ষে (Pincer movement) সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল।’

‘ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।’

আহত জীবানন্দ এক ‘অপূর্বদৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাভূটধারী মহাপুরুষের’ চিকিৎসায় আরোগ্য হবার পর জিগ্গেস ক’রে জানলেন, ‘যুদ্ধে তারই জয় হ’য়েছে। ‘সন্তান সেনার জয়ের উৎসবের গোল’ শুনে জীবানন্দ সেদিকে যেতে চাইলে শাস্তি ব’লেছিল, ‘মা’র কার্যোদ্ধার হইয়াছে। এদেশ সন্তানের হইয়াছে।’ (সপ্তম পরিচ্ছেদ)

ঠিক এমনই মুহূর্তে সত্যানন্দের কাছে প্রত্যাখানের আদেশ এল। নিঃস্বার্থ কর্মযোগী সন্তান সত্যানন্দ পর্যন্ত এ আদেশে সন্দ্বিগ্ন হ'লেন।

‘যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে।’

সত্যানন্দের আশা ছিল, মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস হলে হিন্দুরাজ্য হবে। কিন্তু যিনি এসেছিলেন তিনি ব'ললেন, ‘না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।’

সত্যানন্দ কেঁদে ফেললেন। মহাপুরুষ ইংরেজ রাজত্বের সমর্থনে ব'ললেন: ‘তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না।’—

বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ইংরেজের জলদস্যুতার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলেন, নইলে এ অন্তত গুচিতিবোধের আর কোন হেতু পাওয়া যায় না। কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনায়ক-দের গোড়ার ইতিহাস পবিত্র-অপবিত্রের মাপকাঠি দিয়ে বিচার চলে না। রাষ্ট্র-নীতিতে বঙ্কিমের এই পাপজ্ঞান বাস্তবজীবনে মিথ্যা। এই বঙ্কিমচন্দ্র ব'লতে পেরেছেন, ‘অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না।’

দেশ উদ্ধারের পর ও কী কথা? সম্ভবত, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে দেশ উদ্ধার অর্থে দেশ রক্ষা বোঝাতে চাইছেন। রণজয় হয়েছে ‘দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ ক'রে’। তাই পাপ। এ পাপ এমন যে রণজয় হ'লেও দেশ উদ্ধার করা যায় না। আসল কথা তা নয়, আসল কথা—‘ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের, সম্ভাবনা নাই।’ সনাতনধর্ম কি?

‘তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম নহে’, ‘...প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক—কর্মান্বক নহে।’ ‘...অন্তবিস্ময়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতনধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিস্ময়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তবিস্ময়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।’ ‘...এখন এদেশে বহির্বিস্ময়ক জ্ঞান নাই—শিক্ষায়, এমন লোক নাই।’ ‘...ইংরেজ বহির্বিস্ময়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক শিক্ষায় বড় সুপটু! সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।’ ‘তখন সনাতনধর্ম প্রচারের বিঘ্ন থাকিবে না।’ ‘...ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে। নিষ্কণ্টকে ধর্মোচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।’

তা হ'লে বঙ্কিমের লক্ষ্য হ'ল সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধার; আপাতত ইংরেজকে রাজা করা। অথবা সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারটা ছল মাত্র; ইংরেজ রাজত্ব সমর্থনই প্রধান লক্ষ্য। অন্তত, পাঠকের মনে এইটেই স্থায়ী দাগ কাটে সুতরাং উদ্দেশ্যের দিক থেকে সনাতনধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পাঠকের মনে ব্যর্থ হ'য়ে ইংরেজ রাজ্য সমর্থনটাই সার্থক হ'য়ে ওঠে। তবে এ সন্তান-বিদ্রোহ কেন?*

‘মহাপুরুষ বলিলেন, ইংরেজ এখন বণিক—অর্থ সংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্য শাসনের ভার লইতে বাধ্য

* বিদ্রোহ কথাটা অনির্বাচিত নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়। চলতি রাষ্ট্রের প্রজা যদি রাষ্ট্রকে অমান্য করে, রাষ্ট্রকে হস্তান্তর করতে চায়, তবেই তার নাম বিদ্রোহ দেয়া চলে। বাইরে থেকে যারা আক্রমণ চালায় তারা বিদ্রোহ—হ'তে পারে না। ভিন্সেন্ট স্মিথও এদের অভিযানকে incursion ব'লেছেন, হেষ্টিংস ব'লেছেন depredations.

হইবে; কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিযুক্ত হইবে বলিয়াই সম্মানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।’

সত্যানন্দর মন কিন্তু মানতে চায় না। কর্মযোগী কর্মে আসক্ত হ’য়ে পড়েছেন। তিনি আর জ্ঞান চান না। ব্রত পালন করতে চান। মহাপুরুষ বলেন,

‘ব্রত সফল হইয়াছে—মা’র মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।’

একেবারে স্বস্তিবাচন পর্য্যন্ত। সত্যানন্দ জানতেন না যে, এই-ই ব্রত; মা’র মঙ্গল ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠায়। তাই কাহিনীর সূচনায় প্রশ্নোত্তর হ’য়েছিল, ‘আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?’ ‘তোমার পণ কি?’ ‘পণ আমার জীবন-সর্বস্ব।’ ‘জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে!’ ‘আর কি আছে? আর কি দিব?’ ‘তখন উত্তর হইল, ভক্তি!’

সত্যানন্দ কি জানতেন সে ভক্তি ইংরেজ ভক্তি? কিন্তু কাহিনীর স্রষ্টিকর্তা বঙ্কিমচন্দ্র তা’ জানতেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল স্থির, সুনির্দিষ্ট কাহিনীর বিজ্ঞাপনে তিনি পাঠককে এই ব’লে সতর্ক ক’রে দিয়েছেন যে,

‘সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরাজেরা বাংলাদেশে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।’

শুধু তাই নয়, ‘টীকাস্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা’ও তিনি উদ্ধৃত ক’রেছেন:

‘The leading idea of the plot is this—should the national mind feel justified in harbouring violent thought against the British Government? Or to present the question in another form, is the establishment of English supremacy providential in any sense? Or to put it in a still more final and conclusive form, with what purpose and with what immediate end in view did providence send the British to this country? The immediate object is thus briefly described in the preface—to put an end to Moslem tyranny and anarchy in Bengal, and the mission thus strikingly pictured in the last chapter :—The physician said, “Satyanand be not crest-fallen, Whatever is is for the best, Etc. Etc.”’

এই হচ্ছে বঙ্কিমের লক্ষ্য ও আদর্শ Whatever is, is for the best হেগেলের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। হেগেল ঔপন্যাসিক নন; দার্শনিক। বঙ্কিম ফিলজপি ও দর্শনে একটা দেশজ পার্থক্য টেনেছেন। সেই ফিলজপির ক্ষেত্রেও হেগেলের স্থান সুনির্দিষ্ট। সেদিক দিয়ে দেখলেও সমাজ বিপ্লব সম্পর্কে বঙ্কিমের কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। নতুবা তিনি এমন উক্তি ক’রতে পারতেন না যে, সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। হেগেলের পক্ষে এমন অবৈজ্ঞানিক ও অবৈপ্লবিক উক্তি করা সম্ভব ছিল না। কেননা, তিনি সমাজের দ্বন্দ্বপ্রগতি ধরতে পেরেছিলেন। বঙ্কিম সমাজ-বিপ্লব ব’লতে কি বুঝেছিলেন তা পরের কথায়ই প্রকট: ‘বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।’ এমন অনৈতিহাসিক উক্তি ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষা ছাড়া কারো পক্ষেই বলা সম্ভব

নয়। বন্ধিমবাবু ইতিহাস পড়েন নি, একথা কে বলবে? সুতরাং ইতিহাস-পাঠ নয়, সমাজের গতি পরিণতি সবাই ধরতে পারে না; বন্ধিমবাবুও ইতিহাসকে বিচিহ্ন কাহিনী বলে জেনেছেন, আর জেনেছেন ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনী দিয়ে; তাই সমগ্র ইতিহাসই তাঁর কাছে ব্যক্তিক; সামাজিক নয়। এই ব্যক্তি দিয়ে যারা ইতিহাস পড়েন তাঁরা ইতিহাসকে এই চোখেই দেখেন যে এক এক সময় এক একজন অসাধারণ ব্যক্তি জন্মান তাঁরা ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বিচিহ্ন, তাঁরাই বিচিত্র ইতিহাসের কাহিনীরূপে অবতীর্ণ হন। এঁদের পক্ষে তাই কোন সমাজবিপ্লব অসম্ভব। এঁদের বোঝাবুঝির মাপকাঠি আপন সংস্কারনুসৃত ভালমন্দ জ্ঞান। ফলে ইতিহাস নয়, উচিত অনুচিতের দণ্ড ঘুরিয়ে তাঁরা অতি সহজে একটা এমন কঠিন উপসংহারে পৌঁছান যে, 'ইংরেজেরা বাংলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছে।' রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে মোগল সাম্রাজ্য ছিন্তা বিচিহ্ন; কিন্তু সে কোন্ শক্তির বা কোন্ অসামঞ্জস্যের উদ্ভবের ফলে হয়েছে, বন্ধিমচন্দ্র সেই সামাজিক প্রশ্ন তলিয়ে দেখেন নি। আর আনন্দমঠের প্রতিপাদ্য যদি এই হয় যে, ইংরেজেরা বাংলাদেশ অরাজকতা থেকে উদ্ধার করেছে তাহলে অরাজকতা হচ্ছে আনন্দমঠোন্নিখিত সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। অথচ সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ করেনি অভিযান করেছে; এরা স্বদেশী, বিদেশী শক হুন বা পাঠান মোগল নয়। এরা মায়ের সন্তান। সেই সন্তানদের জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরম। ইংরেজরা যদি বাংলাদেশকে অরাজকতা থেকে উদ্ধার করে থাকে, তবে তারা বাংলাদেশকে সন্তানদের হাত থেকেই উদ্ধার করেছে। সন্তানরা মুসলমানরাজ্য ধ্বংস করেছে; শুধু হিন্দুরাজ্য স্থাপনের অপেক্ষা। সন্তানদের প্রতি জনসাধারণেরও অগাধ শ্রদ্ধা। তথাপি মাতৃমন্ড্রে দীক্ষিত জনগণশুদ্ধে স্বদেশী সন্তানদের রাজ্য হবে না।

কেন হবে না?—না, হয়নি। যা হয়নি তার অনুপযুক্ততার একমাত্র হেতু তা হয়নি; সুতরাং, What is, is for the best. ঠিক এই মারাত্মক উক্তি করেই দ্বন্দ্বপ্রগতির প্রবর্তক স্বয়ং হেগেল তাঁর সমগ্র দর্শনকেই অস্বীকার করেছিলেন এবং তাই আজ বিশ্বসমাজকে ইতিহাস পাঠের চাবিটি হাতে তুলে দিয়েও তিনি প্রগতিবিরোধী বলে কুখ্যাত হয়ে আছেন।

'Therefore, however much Hegel, especially in his Logic, emphasised that this eternal truth is nothing but the logical, i. e., the historical process itself, he never the less finds himself compelled to make an end to this process, just because he has to bring his system to a termination at some point or other... In this way, however, the whole dogmatic content of the Hegelian system is declared to be Absolute Truth, in contradiction to his dialectical method, which dissolves all dogmatism... And so we find at the conclusion of the philosophy of law that the absolute idea is to be realised in that monarchy based on estates which Frederick William III so persistently but vainly promised to his subjects, i.e. in a limited, moderate, indirect rule of the possessing classes suited to the petty-bourgeois German conditions of that time.'

“এঙ্গেলস্ লিখিত লুডুইগ ফায়ারবাকের ২১-২২ পৃষ্ঠা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতির কারণ এর মোট কথাটা বন্ধিমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শেষের সর্বনাশে হেগেলের যেমন ছিল তৃতীয় উইলিয়াম, বন্ধিমের তেমনি ছিল ইংরেজ শাসন; এই হচ্ছে তাঁদের Point of departure. সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বন্ধিম-বক্তব্যের ভেইক্ল মাত্র। সুতরাং আত্মঘাতী বিদ্রোহী সন্তানদের অনুপ্রেরণাকে যারা স্বদেশীব্রত এবং আনন্দমঠকে যারা স্বদেশীগ্রন্থ বলে নাচানাচি করেছেন তাঁরা বন্ধিমের মূল তত্ত্বকেই অস্বীকার করেছেন; অথবা তাতে করে তাঁরা এ কথাই বলেছেন যে, সমাজ-বিপ্লব কোন ক্ষেত্রেই আত্মপীড়ন নয়—আত্মোপলব্ধি;

বিদ্রোহ আত্মঘাত নয়—আত্মপ্রতিষ্ঠা। নতুবা বঙ্কিম যে ব্রতের নিন্দা ক'রেছেন, সে ব্রতকেই শ্রেয়ঃ বলার পর বঙ্কিম ও আনন্দমঠের মর্যাদারক্ষার তার নেয়া মানে আত্ম-বঞ্চনা মাত্র। বঙ্কিমের আনন্দমঠ স্বদেশী গ্রন্থ কিনা এ প্রশ্নে অনেকেই শিউরে উঠবেন, বলবেন এ প্রশ্নে বঙ্কিমের মর্যাদাহানি হয়। কিন্তু গ্রন্থকার সুস্পষ্টভাষায় তাঁর উদ্দেশ্য জানিয়ে দেবার পরও যদি কেউ কোন কল্পিত বিপরীত আদর্শ তাতে আরোপ ক'রতে চায় তবে তাতে গ্রন্থকারের মর্যাদারক্ষা কি ভাবে হয় জানি না। আমরা জানি, আনন্দমঠে সমাজ-বিপ্লব, বিদ্রোহ নিন্দিত হ'য়েছে এবং ইংরেজ শাসনের সমর্থনে সুনিপুণ ওকালতি করা হ'য়েছে। তবু যঁারা বলেন, বঙ্কিম যেহেতু ইংরেজের বিরুদ্ধে খোলাখুলি ব'লতে পারেন নি সেই হেতু মুসলমানরাজ্যের নিন্দা ক'রেছেন, তাঁরা যুক্তি ও তথ্যের বাইরে গেছেন। আনন্দমঠের অরাজকতা সন্ন্যাসীবিদ্রোহেই পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে এবং উপ-সংহারে তারই নিন্দাবাদ আছে।”

পুলকেশ দে সরকারের পরবর্তী প্রবন্ধ ‘আনন্দমঠ থেকে পথের দাবী’ (২৬:৮, ২৬:৯)। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের পটভূমিতে কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ, সম্ভ্রাসবাদী আন্দোলন যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছে তা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে প্রবন্ধকার ব্যাখ্যা করেছেন। পথের দাবী প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণও প্রণিধানযোগ্য।

‘জীবন-সংগ্রামে সাহিত্য’ প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ (২৬:১১, আশ্বিন ১৩৫১)। প্রবন্ধকারের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ:

“আজ বিশ্বব্যাপী লোভীর লুন্ড বিষাক্ত রসনা যেভাবে সমগ্র মানব-সাধারণের সমাজকে লেহন করে চলেছে তার জন্য বিশ্বের সমস্ত মানুষ সংকটাতুর। এই বিষাক্ত রসনা মানব-সভ্যতার সাহিত্য, শিল্প ধ্বংস করতেও দ্বিধা করে না।

এই নির্লজ্জ লোভী মানুষের সমাজকে স্বার্থের মুষ্টিতে আবদ্ধ করবার জন্য সৈনিকদের যেমন অর্থের দ্বারা কিনে নিতে চায়, তেমনি সাহিত্য ও শিল্পের উপাসককেও জন-সাধারণকে ধোঁকা দেবার জন্য কিনে নেবার বর্বর চেষ্টা করে থাকে। বিশ্বকবি সঙ্কে নোঙচির যে পত্রালাপ সে পত্রালাপ কি কবি নোঙচির সঙ্গে? বিশ্বকবি যে নোঙচির পত্রের জবাব দিয়েছিলেন তাকি কবি নোঙচিকে?

যে বর্বরতা বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়াম, পাঠাগার, শিল্পভবন, অসহায় মানবের বাসস্থান প্রভৃতি অবাধে ও নিঃসংকোচে ধ্বংস করে চলেছে তাই দেখে আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

‘হত আহতের গণি সংখ্যা
তালে তালে মজ্জিত হবে জয় ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহালে পৈ।চিক রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাক্সের বাণে রোষি দিবে নিঃশ্বাস।’

এই যে অবস্থার ভেতর আজ আমরা পড়েছি, এরজন্য কি আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের কোনও কর্তব্য নেই?

আমাদের দেশের শিল্পীরা ও সাহিত্যিকরা এমন কি বুদ্ধিজীবী সাধারণ যারা, তাঁরা রাজনীতির কোন ফল শুনলেই চোখ কপালে তুলে বসেন। কিন্তু মানুষ কি রাজনীতি ছাড়া সমাজে বাস কতে পারে? সমাজ-জীবনে তার দৈনিক বোঝাপড়া চলেছে তো এই রাজনীতির সঙ্গে। কিন্তু সাহিত্যিকের রাজনীতি ও কস্মী-সাধারণের রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাহিত্যিক মানব মুক্তিকামী, কস্মীও তাই, কিন্তু পছন্দ আলাদা। শরৎচন্দ্র বলেছেন—

‘সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোন দিনই ভেবে পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—ওদেরই বেদনা দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি নিবিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার এদের নিয়ে।’

এই যে মামটির মানুষের সমাজের বুকের অক্ষুট বেদনার কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন, এই তো সাহিত্যেরও, শিল্পেরও মূল-তত্ত্বের নির্দেশ। একে এড়িয়ে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের সাধনা ড্রইংরুম-বিলাসীর অলস অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। আবহমানকাল থেকে শিল্প-সাধনা এই পথেই প্রবাহিত হয়ে মানব-জাতির জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে এসেছে। শরৎচন্দ্র আর একস্থানে বলেছেন,

‘আমি সাহিত্যিক, সাহিত্য নিয়েই থাকব, রাজনীতিতে যোগ দোব না, তাহলে উকিল ব্যারিষ্টারেরাও তো বলতে পারেন—আমরা আইন, ব্যাসায়ী, মাগ্লা-মোকদ্দমা নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দোব না; ছেলেরা বলবে—আমরা ছাত্র, পড়াশুনা নিয়েই থাকবো, রাজনীতির মধ্যে যাবো না, তাহলে রাজনীতিটা করবে কে শুনি?’

সাহিত্যিক শিল্পীদের এই যে পলায়নী-প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে, তারই বিরুদ্ধে মানব-দরদী শরৎচন্দ্র ইঙ্গিত দিয়েছেন। শিল্পী ও সাহিত্যিকরা অনাগত সমাজের বার্তাবাহী দূত। তাঁদের পলায়নী-বৃত্তিতে জাতিরই ধ্বংসের আভাস ফুটে ওঠে। তাই সত্যকারের সাহিত্যিক শিল্পী যারা, তাঁরা মানুষ থেকে, মানুষের সমাজ থেকে পাড়িয়ে না গিয়ে, এদের সঙ্গে মিশে সাহিত্য ও শিল্পের ভিতর দিয়ে জাতিকে উদ্ধলোকে তুলে ধরেন।

আজকের সংকটমূহূর্তের উপযোগী করে নাটক, নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্র, মণ্ডিতশিল্প, উপন্যাস ও কাব্য, কথকথা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে জাতিকে উদ্ধুদ্ধ করবার ব্রত সাহিত্যিক-শিল্পী-বিজ্ঞানীকে গ্রহণ করতেই হবে। এই ব্রত গ্রহণ না করে যদি সাহিত্য, শিল্পের সেবায় আমরা এখনো মশগুল থাকি, তবে সে সেবা বার্থতায় পর্যাবসিত হতে বাধ্য। আমাদের ঘরের বিশ্ব কবি এই কথা বুঝেছিলেন বলে তিনি আমাদের শেষ ডাক দিয়ে বলেছিলেন :

‘নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে,
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।’

‘মুসলমান নাট্য সাহিত্যের সম্ভাবনা’ প্রবন্ধে (২৭:৬, বৈশাখ ১৩৫২) কাজী মোতাহার হোসেন কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। তাঁর মূল বক্তব্য :

“আজকাল ঐতিহাসিক নাটকের চেয়ে বোধ হয় সামাজিক নাটকেরই চল হয়েছে বেশী। তাই আমাদের নবীন সাহিত্যিকগণ মুসলমান সমাজ-চিত্র নিয়ে নাটক লিখতে আরম্ভ করে সময়োপযোগী কাজই করেছেন। বিশেষ করে আজকালকার কর্তব্যব্যস্ত জীবনে বৃহৎ পঞ্চাঙ্ক নাটকের চেয়ে ক্ষুদ্র একাঙ্ক নাটকই মানায় ভাল। একথাগুলোও নবীন তরুণ নাট্যকারেরা বুঝতে পেরেছেন বলেই আমার মনে হয়।

হিন্দু সাহিত্যিকেরা গল্প-উপন্যাস-নাটক-কাব্যের ভিতর দিয়ে জীবনের মর্মকথা প্রকাশ করেছেন। মুসলমান সাহিত্যিকরা এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই গম্ভীর। তাই স্বভাবতঃই এ দেশে জাতীয়তা আর হিন্দু-জাতীয়তা প্রায় সমার্থক হয়ে পড়েছিল। এতকাল পরে এখন মুসলমানের চেতনা জনাচ্ছে, তাই এত কোলাহল। কিন্তু শুধু কোলাহলে ফল নাই। সৃষ্টি করতে হবে—সৃষ্টির অনাসৃষ্টি ঠেকাতে হবে। সৃষ্টিতে ফরমাইন্স চলে না—কালের প্রয়োজনে স্বভাবতঃই তার আবির্ভাব হবে।

আর এক কথা, সাহিত্যিক আবির্ভাব দৃষ্টিকে প্ররোচিত করে—সংস্কারকে পরিচছন্ন করে, বিধাগ্রস্ত ভীক মনকে অসঙ্কোচ প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ করে।—এইখানে সাহিত্যিক অলক্ষ্যে লোক শিক্ষকের কাজ করে। কিন্তু শিক্ষাদান বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং প্রায়শ সঙ্কটপূর্ণও বটে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়সাহিত্য

‘সওগাতে’ বাংলাদেশের বাইরের অন্যান্য দেশ ও ভাষার সাহিত্য যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। তবে এ সব প্রবন্ধ প্রধানতঃ উর্দু ফারসী ও আরবী ভাষার কবি ও তাঁদের কবিতা সম্পর্কিত। অল্প কয়েকটি প্রবন্ধে জার্মান রুশ ইংরেজী ও জাপানী সাহিত্য-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধসমূহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলোর তালিকা নীচে দেয়া হল :

১. মধ্যযুগের আরব-সাহিত্য, ফজলুর রহিম চৌধুরী, মাঘ ১৩২৫
২. ওমর খাইয়ামের যুগ, মুহম্মদ মন্সুরউদ্দিন, পৌষ ১৩৩৩
৩. কবি ওমর খৈয়াম, শাহাদাৎ হোসেন, মাঘ ১৩৩৩
৪. কবি ইক্বাল, মোস্তা নাসিরুল হক, ফাল্গুন ১৩৩৩
৫. ওমর-গুরু আবু আলি সিনা, শ্রী সুরেশচন্দ্র নন্দী, আষাঢ় ১৩৩৪

[কল্লোল থেকে পুনর্মুদ্রিত]

৬. পারস্য-কবি মুয়িজ্জী ও আনোয়ারী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, শ্রাবণ ১৩৩৪
৭. আরব-কবি আবুল আতাহিয়া, এ. জেড. নূর আহমদ, তাদ্র ১৩৩৪
৮. কবি হালী, মুহম্মদ মন্সুরউদ্দীন, পৌষ ১৩৩৪

৯. মহাকবি ফরিদউদ্দীন আত্তারের শেষ জীবন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, শ্রাবণ ১৩৩৫
১০. মহাকবি ফের্দৌসী, সৈয়দ আফতাব হোসেন, কাতিক ১৩৩৫
১১. উর্দু সাহিত্যে হালী, মুজিবুর রহমান, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫
১২. মহাকবি আত্তারের যুগ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মাঘ ১৩৩৫
১৩. মহাকবি হাস্‌সান-বিন-সাবেত, মোহাম্মদ কাসেম, মাঘ ১৩৩৫
১৪. ঔপন্যাসিক নুট হাম্‌সন, এম. নাসীর আলি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬
১৫. আরব-কবি ইমর-উল-কায়েস, এ. জেড. নূর আহমদ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬
১৬. স্বভাব কবি ইমরুল কায়েস, মোহাম্মদ কাসেম, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬
১৭. জাপানী কবিতা, আনোয়ার হোসেন, পৌষ ১৩৩৯
১৮. রুশ-সাহিত্য ও চলচ্চিত্র, খালেকদাদ চৌধুরী, মাঘ ১৩৩৯
১৯. ওমর খাইয়াম ও সেক্সপীয়ার, আসাদউল্লাহ, ফাল্গুন ১৩৩৯
২০. ব্রিটিশমানের চোখে প্রাচ্য, জহিরুল হক, বৈশাখ ১৩৪৪
২১. জাপানী সাহিত্য, আনোয়ার হোসেন, ভাদ্র ১৩৪৬
২২. মহাকবি মালিক মোহাম্মদ জায়সী, মজহারুদ্দীন ভূঁইয়া, আশ্বিন ১৩৪৭
২৩. মরিস্ মেটারলিক, মাহবুবুর রহমান খাঁ, ভাদ্র ১৩৪৯
২৪. 'দাগে'র কাব্যালোচনা, মুস্তাফিজুর রহমান, চৈত্র ১৩৪৯
২৫. প্রাচীন রাশিয়ান সাহিত্য, জহিরুল হক, কাতিক ১৩৫০
২৬. গোকী, চৌধুরী নজরুল ইসলাম, পৌষ ১৩৫০
২৭. আধুনিক উর্দু কবিতা, মুনীর চৌধুরী, চৈত্র ১৩৫০
২৮. একালের চিন্তাধারা, মীজানুর রহমান, অগ্রহায়ণ ১৩৫১
২৯. প্রেমচাঁদের সাহিত্য, জহিরুল হক, কাতিক ১৩৫১
৩০. ওমর খৈয়াম ও তাঁহার রুবাইয়াত, এ.এফ.এম. আবদুল জলীল, পৌষ ১৩৫৩
৩১. ওমর খৈয়ামের ধর্ম, এ. এফ. এম. আবদুল জলীল, মাঘ ১৩৫৩
৩২. ইক্বাল-প্রসংগ, ফররুখ আহমদ, মাঘ ১৩৫৩
৩৩. মহাকবি নিজামী ও ন্যাভয়, [কবিত্বয়ের জন্য বার্ষিকী উপলক্ষে নিকোলাই তিখোন্‌কর্তৃক লিখিত] অনুবাদ : আমিন উদ্দীন আহমদ, চৈত্র ১৩৫৪
৩৪. আরবী কাব্য, মোহাম্মদ কাসেম, শ্রাবণ ১৩৫৫

এ প্রবন্ধগুলোর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রবন্ধের শিরোনামে প্রাবন্ধিক যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আলোচনায় তা সর্বদা রক্ষা করেননি। অনেকক্ষেত্রেই প্রবন্ধ পরিচিতিমূলক মাত্র।

ফজলুর রহিম চৌধুরীর 'মধ্যযুগের আরব-সাহিত্য' (২:৩, মাঘ ১৩২৫) মূলতঃ কয়েকজন কবির পরিচয়। তবে তাঁর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

“এই যুগেও আমরা দেখিতে পাই ‘কসিদা’ আঁধার যুগের ন্যায় কবিগণের হৃদয়ে এক মোহন প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কবিগণ মুসলমানদের গৌরবমণ্ডিত বিজয় কীর্তির যশোগান না করিয়া তখনো পুরাতনকে আলিঙ্গন বিমুক্ত করে নাই। তখনো

কবি পুরাতন স্মৃতির ধ্বংসাবশেষের উপরে বসিয়া তাঁহার প্রেমসীর উদ্দেশ্যে অশ্রুপাতে বক্ষ ভাসাইতেছেন, তাহার উষ্ণ মরুভূমিতে চলিতে চলিতে পঙ্খু হইয়া গিয়াছে এবং অনিদ্রায় ক্লান্ত, শ্রান্ত কবি তখন মরণাপন্ন।

মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজিত রাজ্য ও সাম্রাজ্য সমূহের স্বর্ণ, রৌপ্য ও অজস্র ধনরাজি তাহাদের নিজস্ব জনপদসমূহে আনীত হইতে লাগিল এবং খলিফাদের শাসনরাজ্য শিথিল হওয়ায় এই ধনরাজির মোহন-স্পর্শে তাহাদের কন্ঠ কঠোর হৃদয় বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। নগরগুলি বিলাসের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইল এবং গ্রীস ও পারস্যের হাবভাব ও তরল প্রবৃত্তিসমূহ কর্তব্য কর্মপ্রিয়তার স্থান অধিকার করিতে লাগিল। বিলাসিতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত নাগরিক কবিগণের মধ্যে যাহারা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে আব্বী-রাবীয়া-সুত উমর সর্বশ্রেষ্ঠ।

উমর ৭১৯ খৃঃ অব্দে মক্কা নগরীতে এক ধনী বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ তিনি স্ত্রীলোকদিগের প্রশংসাবাদে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত সংশ্রব ও ঘনিষ্ঠতা তাঁহার কবিতাকে জীবনী শক্তি প্রদান করিত। উমর রচিত কবিতাবলী এতই কুরুচীপূর্ণ ছিল যে, মোসলেমগণ সতত তাঁহাকে খোদার শত্রু বলিয়া মনে করিত। মুবায়্যাত কৃত 'কামীলে' উক্ত হইয়াছে এই কবিতাগুলির রচনা নৈপুণ্য কোরআন্ ও হাদীসে অভিজ্ঞ হযরত মহম্মদ-এর জেষ্ঠ্যতাত-তনয় আবদুল্লাহ বিন-আব্বাছের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এমন কি তিনি কয়েকটি কবিতা উমরের নিকটে গুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। কোরাইশগণের মধ্যে কোন ভাল কবি জন্মগ্রহণ করে নাই, কবিতা ব্যতীত তাহারা অন্যান্য বিষয়ে আরবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; কিন্তু আব্বী-রাবীয়া-সুত উমর তাহাদের এই দুর্নাম অপসারিত করিয়া তাহাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, স্রোতস্থিনীর প্রবাহের ন্যায় তাঁহার কবিতার অবাধ গতি পলকে মানবের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া ফেলিত। আঘানী হইতে তাঁহার কবিতার একাংশ নীচে উদ্ধৃত করিলাম:—

‘দিওনা কোনই দোষ হে বন্ধু প্রধান।
নীরবে হাওদা পার্শ্ব কর অবস্থান;
জয়নার প্রেমপাশে বন্দী আমি আজ,
লইও না কোন দোষ দিওনাক লাজ।
কেমনে ভুলিব তারে যেই দিন হয়,
খায়ের পাহাড়’পরি হেরিলাম তায়।
অন্য কোন নারী তবে যত যশোগান
মুছিবেনা হৃদি হতে সেই রূপ-ধ্যান।
অকৃত্রিম ভালবাসা তার তরে শুধু,
সেই যে প্রেমের প্রাণ, কুসুমের মধু।
সহিব তাহার তরে যত অপমান,
তাই বলি নীরবেতে কর অবস্থান।’

নাগরিক অন্যান্য কবিগণের মধ্যে আল্-আহ-ওয়াছ, আল্-আরজী এবং জামীলের নাম উল্লেখ যোগ্য। আল্-আরজী উমাইয়া খলিফা বংশ সন্তৃত ছিলেন। ইহাদের রচিত প্রেমোচ্ছাস পরিপূর্ণ কবিতাবলী আজও বে-রাউটের পথে পথে এবং তাইগ্রীস নদীর উপকূল-ভাগে গীত হইতেছে। জামীল লিখিত একটি প্রেম কবিতার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

‘যৌবন আবার যদি আসিত আমার
 বোছা এঃ-সহবাস পাইতাম আর,
 কি যে সেই সঙ্গসুখ! প্রতিবেশীগণ
 ঈর্ষার নয়নে মোর হেরিত আনন।
 পাইব কি ফিরে পুনঃ প্রেমসী আমার।
 প্রেমপূর্ণ মেঘপ্রায় সলিল সম্ভার,
 প্রেমজাল বদ্ধ ছিনু কৈশোর ইহতে,
 এখনো বিরহ তার জাগিতেছে চিতে,
 অধরে নাহিক মোর লালিমার লেশ,
 তার সনে কথা কিন্তু হলনাক শেষ;
 কিরূপে সে আমা হতে ফিরাবে বদন?
 লতিব তাহার তরে অক্ষয় জীবন।’

এই যুগেও আমরা দুচারিজন স্ত্রী কবির সন্ধান পাই। তাঁহারা শোক-কবিতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই কবিদের মধ্যে লায়লা-আল-আকালিয়া বিশেষ বিখ্যাত। তাঁহার প্রেমাস্পদের সঙ্গে তিনি বিবাহিতা না হইয়া পিতা কর্তৃক এক নিষ্ঠুর-স্বামীর হস্তে সমর্পিত হন, এই অত্যাচারী স্বামীর হস্তে তাঁহার লাঞ্চার আভাষ তাঁহার কবিতার মধ্যে পরিস্ফুট।

প্রাদেশিক কবিগণের মধ্যে আল-আকতাল, আল-ফারাজদক্ এবং জারীর সবিশেষ বিখ্যাতি। এই কবিদ্বয় মেসোপটেমিয়া নিবাসী এবং তিনজনই ব্যঙ্গ-কবিতার সিদ্ধহস্ত ছিলেন।”

প্রবন্ধের শেষাংশে ‘মধ্যযুগের আরবী গদ্য সাহিত্য’ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন প্রাবন্ধিক :

“মধ্যযুগের গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে সঠিক কোনো বিবরণ দেওয়া যায় না, কারণ অধিকাংশ পুস্তকই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে এই যুগে যে ঐতিহাসিক সাহিত্যেয় আদর ছিল এবং হাদীস ও কোর্-আনের চর্চা হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুইয়া-সুত আবাদ পৌরাণিক কাহিনীগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মোনাঝি-সুত হাব পুরাতন তথ্যাবলীর গবেষণায় নিজকে সতত নিযুক্ত রাখিতেন। এসলামের প্রথম যুগের অনেক ইতিহাস এই সময়ে বিরচিত হইয়াছিল। উক্বা-সুত মুছা প্রণীত ‘সাখাজী’ বিশেষ বিখ্যাত। ইবনে এসহাক হজরত মহম্মদের জীবনী লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। এই যুগের হাদীস সম্বন্ধে কেবলমাত্র আসাদ্-বিন-মুছা কৃত ‘কিতাব-উল-জোহদ’ আমাদের হস্ত গত হইয়াছে। হাদীস সংগ্রহে মহম্মদ-বিন-মুসলীম-বিন-সীহাব-আল-জুহরী বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; তিনি অবশেষে খলিফাদের অধীনে বিচারকের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।”

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের প্রবন্ধ ‘ওমর খাইয়ামের যুগ’ (৪:৭, পৃষ্ঠা ১৩৩৩) ব্রাউনের পারস্য সাহিত্য ও অন্যান্য গ্রন্থকারের পারস্যদেশ, সাহিত্য ও ওমর সংক্রান্ত গ্রন্থাদি অবলম্বনে রচিত তথ্যমূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধে মনসুরউদ্দীন ওমরের সমকাল ও পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মনসুরউদ্দীনের ভাষায় :

“ওমর খাইয়ামকে ঋাটীরূপে জানিতে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই সংক্ষেপে আমরা বলিয়াছি। তিনি যখন রুবাইয়াৎ রচনা করেন, তখন এবং তাহার পূর্বে পারস্য-সাহিত্যের কি

অবস্থা ছিল তাহা বলিয়াছি। তাঁহার যুগের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা ও ব্যক্তি-গণের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। এককথায় ওমরকে সত্যিকার আলোতে ধরিতে প্রয়াস পাইয়াছি। যুগের সাথে পরিচিত হইলে রুবাইয়াৎ ও ওমরকে ধরা সোজা হইবে।”

শাহাদাৎ হোসেনের ‘কবি ওমর খৈয়াম’ (৪ : ৮, মাঘ ১৩৩৩) ছোট প্রবন্ধে হলেও সুলিখিত। আংগে-এর ভাষায় ভূমিকা রচনার পর প্রবন্ধে কবি ওমর সম্পর্কে শাহাদাৎ হোসেন লিখেছেন :

“যে-যুগে ওমর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পারস্যের গৌরবের যুগ। ইসলামিক দর্শন ও সাহিত্যের অনুশীলন তখন সমগ্র পারস্য-খণ্ডে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছিল। তাহার সভ্যতা ও জ্ঞান-গরিমার সম্মুখে বিশাল প্রাচী তথা সমগ্র সভ্য জগৎ শির নত করিয়াছিল। সেই সভ্যতা ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত মাতৃ-ভূমির বৃকে, স্নেহের নীড়ে ওমরের শৈশব ও কৈশোর-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। পরবর্তী জীবনেও যে তিনি জন্মভূমির দুর্দিনের সাক্ষী হইয়াছিলেন, কিম্বা এই জ্ঞান ও সভ্যতার কোন ব্যতিক্রম ঘটতে দেখিয়াছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণ অব্যাবধি পাওয়া যায় নাই; সুতরাং একথা একরূপ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, জাতীয় জ্ঞান ও সভ্যতার পূর্ণ প্রভাবের মধ্যেই ওমরের কবি-জীবনের মঙ্গল সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই একই প্রভাবের মধ্যেই তাঁহার আনন্দময় পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণরূপে জাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার বিদ্রোহী কবি-প্রকৃতি গতানুগতিক জাতীয় পন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। তিনি সৌন্দর্য্যকে সত্য ও চিরন্তন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং একমাত্র প্রেমের মধ্যেই তাহার মূর্ত্ত বিকাশ দেখিয়াছিলেন। অবশ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি এই অত্যধিক আসক্তির জন্য আমরা ওমরকে বিদ্রোহী নামে অভিহিত করি না, করিতে পারি না; কারণ পরবর্তী যুগের সুফীরা একাধিক বিষয়ে তাঁহার মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাঁহার সৌন্দর্য্যাসক্তি যখন নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর চলিয়া যায়, কেবল তখনই আমরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া অনুযোগ করি।

কিন্তু বিদ্রোহী হইলেও ওমর নাস্তিক ছিলেন না। তিনি খোদাতালার উপর একান্ত বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল ছিলেন। মাত্র বাহ্য-বিশ্বাস ও লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :

যেদিন শিল্পী মৃতি-পুতলী গড়েছিল দেহ মোর,
বিধানের লিপি এঁকেছিল ভালে মনে কি পড়েনা তোর ?

ইহা কি নাস্তিকের বাণী? সৃষ্টির অস্তিত্বে আস্থাহীন কবির প্রাণবাণী যদি এই হয়, তবে আস্তিক কবির বাণী কি? যাহারা ওমরকে নাস্তিক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাকে সিরাজের বিশ্ববরণ্য কবি হাফেজের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাদের মতের পোষকতা করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ইঁহারা উভয়েই তসাউকবাদী হইলেও একজন প্রধানতঃ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া এবং অন্যজন নিরবচ্ছিন্ন তসাউফের মধ্য দিয়া অন্তর্নিহিত সত্যের বিকাশ দেখাইয়াছেন—নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন; যাহার যেটা প্রধান অবলম্বন, সেইটির মধ্য দিয়াই তিনি কল্পনার অপূর্ব্ব আলোকচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা একজনকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করা একান্ত অন্যায় ও একদেবদর্শিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হাফেজ ছিলেন একনিষ্ঠ সুফীধর্মী। সীমার গণ্ডী অতিক্রম কিম্বা চিরাচরিত বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই, আর হইলেও সে-প্রয়োজনের মুখে সুফী ধর্মের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রবল অন্তরায় স্বরূপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইত; কিন্তু সৌন্দর্যের উপাসক, আব্বাহারা ওমরের কবিত্বের উৎস-মুখে কোন দিনই সংঘের বাঁধ ছিল না। তাহা উচ্ছ্বসিত প্রবাহে দুকূল ছাপাইয়া বহিয়া গিয়াছে। সে প্রবাহ-মুখে তসাত্তফ মরিল কি বাঁচিল, তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর তাঁহার ছিল না। তসাত্তফবাদী হইলেও তাঁহার কল্পনার আলোক-নির্ঝর সৌন্দর্য্য পরিণতির দিকে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া গিয়াছে; যেহেতু সৌন্দর্য্যের মধ্যেই তাঁহার কল্পনার সত্যরূপ নিহিত ছিল, এবং প্রেম ছিল সেই সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার। তাই প্রেম ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রাণের সত্যকে মূর্ত্ত করিতে গিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহের কলঙ্ক ডালি মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছে।

কিন্তু ইহার জন্য কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার অন্তরে ক্ষোভের উদ্বেক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ তিনি জানিতেন, কবিত্বের উৎসধারামুখে তিনি তাঁহার অন্তরের চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করিতেছেন এবং সে-প্রকাশের ন্যায়সম্মত অধিকার তাঁহার আছে। তিনি ইহাও মনে করিতেন—তাঁহারই প্রাণের সত্য অনন্ত প্রকৃতির রূপে, রসে, গন্ধে গানে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য্যের তীব্র মর্দিরায় উন্মত্ত ওমর, তাই দেশ কাল জাতি ও লৌকিক আচার অনুষ্ঠানকে উপেক্ষা করিয়া সাকি ও শরাবের গানে বিভোর হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার কিনুরকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল,—

শ্যাম তূণে-ঢাকা এই কলসনা তটিনীর তীরে,
ওরে কবি, নিয়ে আয় হুরী আর শরাবের জাম,
নরকের দুঃস্বপন মিলায়েছে বিচিত্রার নীরে,
ওরে মুগ্ধ, এইখানে গড়ে' তোন্ নব স্বর্গধাম।

কিন্তু এইখানেই এ-সঙ্গীতের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। এ-আরম্ভের পরিণতি সেইখানে, যেখানে তিনি গাহিয়াছেন :

ওলো সাকি! চেউ যদি প্রতিকূলে বয়,
মোদের এ তরী যদি কুলহারা হয়,
নাহি মিলে ঠাই যদি, ক্লাস্ত কাতর;
নিয়তি ভাঙিতে চায় মিলন-বাসর;
দুঃখ কি ওলো সখি,—ভরা পেয়ালায়।
হারাকুল ফিরে পাব সত্য-ছায়ায়।

এবং ইহাই কবি ওমর খৈয়ামের প্রাণবাণী। ইহাই তাঁহার অন্তর্নিহিত সত্য সৌন্দর্য্যের আনন্দময় বিকাশ। এই খানেই তাঁহার সৌন্দর্য্যবাদের চরম পরিণতি। যুগে যুগে বিশ্বের সৌন্দর্য্যবাদী কবিগণের প্রাণের সাধনা এই মহান পরিণতির পানে ছুটিয়া গিয়াছে এবং ইহারই নিস্তরঙ্গ অন্তহীনতার মাঝে অনন্ত যুগের সমাধি-লাভে সকল রহস্যের অবসান ঘটাইয়াছে।”

প্রবন্ধ শেষে সওগাত সম্পাদক টীকা দিয়েছেন : “এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত কবিতাগুলি লেখকের নিজের অনুবাদ।”

মোস্তা নাসিরুল হকের ‘কবি ইকবাল’ (৪:৯, ফাল্গুন ১৩৩৩) প্রবন্ধে উদ্ধৃত ইকবালের কবিতাংশগুলোর অনুবাদ করেন কবি শাহাদাত হোসেন। (ঐ. পৃ. ৬২১ পা. টী. দ্রষ্টব্য)। ইকবালের জীবন-পরিচিতি প্রদানের পর প্রবন্ধের প্রধানাংশে মোস্তা নাসিরুল হক ইকবালের কবিপ্রতিভা আলোচনা করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হল :

“ইকবালের পাঠ্যাবস্থা ব্যতিরেকে তাঁহার কবি প্রতিভার ক্রমবিকাশের যুগ তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ; দ্বিতীয় স্তর ১৯০৫ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় স্তর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত। দাগের সহিত ইকবালের সম্পর্ক অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি পত্রের আদান প্রদান দ্বারা মিজ্জা দাগের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন নাই। তিনি মীজ্জা গালিবের প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহারই আদর্শের অনুসরণ করিতেন।

ইকবালের কল্পনা অতি গভীর ও গূঢ়ভাবে ব্যঞ্জক। অনূন দুইবার পাঠ না করিলে তাঁহার ভাব ও ভাষা হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হইয়া উঠে। তাঁহার কবিতা সমূহে তিনি দর্শনের তত্ত্ব আলোচনা করেন নাই। তিনি দর্শনের নীতি ও পরিণতির প্রতি যুগা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আমি দর্শনের শিক্ষক নই ; তবে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা আমার ভূয়োদর্শনের ফল স্বরূপ। আমি আদৌ যুক্তিবাদের দিক দিয়া চলি নাই।

ইকবালের ‘হিমালয় শৈলমালা’ শীর্ষক প্রথম কবিতা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে উত্তর ভারতের ‘মাখজান’ নামক প্রসিদ্ধ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।***

‘হিমালয় শৈলমালা’ শীর্ষক কবিতায় তিনি সেই উত্তুঙ্গ গিরি শ্রেণীকে আহ্বান করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা আধুনিক ভাবের দ্বারা উত্তুঙ্গ ; এই কবিতা অতিমর্মস্পর্শী এবং তাঁহার অসামান্য স্বদেশ-বাৎসল্যের পরিচায়ক। ‘অনাথের ক্রন্দন’ শীর্ষক আরও একটি কবিতা তিনি লাহোরের আঞ্জমানের বার্ষিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। ইহাতে দুঃস্থ মোসলমান সমাজের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ইকবালের কাব্য-জীবনের প্রথম যুগে “হিমালা” (হিমালয়), “গুল-ই-রজ্জিন” (রজ্জিন ফুল), “পারেন্দে-কি-ফরিয়াদ” (খেচরের অভিযোগ), “শামা ও পারোয়ানা” (প্রদীপ ও পতঙ্গ), “এক আরজু” (একটি নিবেদন), “তারানা-ই-হিন্দি” (ভারতীয়ের সঙ্গীত), “চান্দ” (চন্দ্র) এবং “কিনারি রাভী” (ইরাবতী-তীরে) প্রভৃতি কতিপয় উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি কেবল সুরা ও তথাকথিত প্রেমের বিষয় আলোচনা করেন নাই ; এই সমস্ত কবিতার সহিত তিনি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের সংযোগ দেখাইয়াছেন।

তাঁহার এই সমস্ত কবিতা ভাষার সরলতায়, সরসতায় ও মাধুর্য্যে এবং কাব্যোচিত কল্পনার সৌন্দর্য্যে সুপ্রসিদ্ধ হালির কবিতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে কতকগুলি অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

‘ওলো দীপশিখা ! পতঙ্গ কেন এত ভাল তোরে বাসে,
মণ্ডল কোন্ নেশার খেয়ালে জীবন ভারিতে আসে।
তোমার দীপ্ত রশ্মি-রেখায় পথ-হারা গ্রহ প্রায়,
উতলা মাতাল ছুটে চলে যায়, পিছু ফিরে নাহি চায়।

কি গুচ গভীর প্রেমের তত্ত্ব শিখিয়েছ তারে তুমি
মৃত্যুর মাঝে লভে সে শান্তি শিখা-মুখে তব চুমি।
কোন অনন্ত জীবন রেখেছ লুকায়ে দহন বুক
যাহে সাধনার করে অবসান উগ্র চরম সুখে।

(শামা ও পরওয়ানা)

‘আমার এ রীতি নহে ফুল-কুমারী।
বল্লরী হ’তে ছেঁড়া রূপ-দুলারী।
বাহিরের রূপে যার মন মজেছে,
সে তোরে ছিনায়ে সখি ভুল করেছে।
এ বাহু পীড়ন মোর কভু না জানে,
প্রাণহীন মালাকর নহি বাগানে।
তত্ত্ব জানিনা কিছু বুঝিনা সে কি
বুল বুল আঁখি নিয়ে তোরে লো দেখি।’

(গুল-ই-রফিন)

ইকবালের কাব্যজীবনের দ্বিতীয় যুগ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ে তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি কাব্য রচনার ইচ্ছা একেবারে বর্জন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রিয় স্নহুৎ আর্গল্ড সাহেবের উৎসাহ বচনে অনুপ্রাণিত হইয়া পুনরায় কাব্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। মাখজান পত্রিকার সম্পাদক আবদুল কাদের সাহেব ঘটনাচক্রে সেই সময় ইংলণ্ডে উপস্থিত ছিলেন। ইক্বাল তাঁহার নিকট নিজের সংকল্প প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার এ সংকল্প অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। অচিরেই তিনি পারস্য ভাষার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এই ভাষাকেই স্নফীধর্ম্ম সম্বন্ধে স্থায়ী কল্পনা ও তাব প্রকাশের নিমিত্ত মনোনিীত করিয়া লন। তাহার ফলে তাঁহার দ্বিতীয় যুগের কাব্য-সমূহ, আরও উন্নত ধরণের হইয়াছে। এই যুগের কাব্যে তাঁহার কার্য্য ও কল্পনায় যথেষ্ট সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

“মুহব্বত” (প্রেম), “হকিকতই হুসন্” (সৌন্দর্য্যের সত্যতা), “পাইয়াম” (বার্তা), “ভিসাল” (মিলনের মাধুর্য্য), “কোশীশ-ই-না তামাম” (অপূর্ণ উদ্যম), “পাইয়াম” ইশুক (প্রেমের বার্তা) ও “গাজলীয়ৎ” প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁহার কাব্য জীবনের দ্বিতীয় যুগে রচিত হইয়াছিল। কাব্যের নামগুলি হইতেই আলোচ্য বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। এ সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন—

‘গতিচ্ছন্দে জাগে নিত্য বিশ্বের জীবন
এই সত্য—সত্য চিরন্তন।
বিশ্রাম সম্ভব নহে ধরণীর বুক
মরণ বুঝায় তাহে নিব্বিকার সুখে।’

(চান্দ আওর সাইরারা)

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত স্যার ইকবালের সাহিত্যিকজীবনের তৃতীয় যুগ। এই যুগই তাঁহার জীবনে চরম সার্থকতা আনয়ন করিয়াছে। এই সময়ে পারস্য

ভাষায় দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি জনসমাজে অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে বেগমীর ও পরিমার্জিত ভাষা ও কল্পনা লইয়া তিনি ভারত প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকদ্বয়ে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার উর্দু ভাষায় লিখিত উচ্চ ধরণের খণ্ড কাব্যগুলিও এই যুগে রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যগুলির অধিকাংশই তাহাদের নামের সার্থকতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই যুগের রচিত কাব্যের মধ্যে “মজহাব” (ধর্ম), “কুফর ও ইসলাম” (ইসলাম ও পৌত্তলিকতা), “মুসলিম আওর তালিমি জাদিদ” (মোসলমান ও আধুনিক শিক্ষা), “খিজারী রাহ” (পথ প্রদশক), “তুলু-ই-ইসলাম” (ইসলামের অভ্যুত্থান), সেক্সপীয়র, “শীকোয়া ও জাওয়াবি শীকোয়া” (দোষারোপ ও তাহার প্রতিবাদ) “জাওয়ান-ই-ইসলাম” (ইসলামের তরুণবৃন্দ), “আশিরি” (দাসত্ব) প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু “শীকোয়া ও জাওয়াবি শীকোয়া” এবং “খিজারী রাহ” নামক গ্রন্থই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথম পুস্তক দুখানিতে তিনি মোসলমানের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে খোদাতালার নিকট অভিযোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই অভিযোগের প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তৃতীয়টিতে কবি নিজের ও খিজারের কাব্যে বাদানুবাদের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থত্রয় বস্তুতঃ তিনি মোসলমানের দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকারের উপায় এবং স্বীয় জীবনের বার্তা এবং প্রেম ও শাসন ... বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার ‘আসরারি খুদি’ ও ‘রামুজি বিখুদি’ (এই দুইখানি কাব্যে তিনি একই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন) এবং ‘পাইয়াম-ই-মাশরিক্’ এই গ্রন্থ তিনখানি পূর্বকথিত কাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে ‘আত্ম রহস্য’ নামক প্রথম কাব্যখানি ডাঃ নিকলসন কর্তৃক ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিকে দেশকাল নির্বিশেষে বিশ্বকাব্য অথবা বিশ্বসঙ্গীত নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।...

ইউরোপীয়গণের আধ্যাত্মিক শক্তিহীন জড়বাদিষের জন্য ইকবাল বড়ই বিলাপ করেন। মনুষ্য যে যন্ত্র অপেক্ষা উন্নত, এ ধারণা বাণিজ্যসর্বস্ব ইউরোপীয় জাতি আজ ভুলিয়া বসিয়াছে।

আত্মার প্রকৃতি অবগত হওয়া মানবের প্রথম কর্তব্য। নিজের আত্মার নিকট অপরিচিত থাকা অতি লজ্জাকর; কিন্তু ‘অনিবিষ্ট সাধনার দ্বারা আত্মা সহজে বশীভূত হয় না’; এই বাণীর দ্বারা ইকবাল সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

অবিশ্বাসের দ্বারা কেবল জ্ঞান অজ্ঞিত হয়, কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা জগতে সকল কার্যই সাধিত হইতে পারে। অবিশ্বাসই কর্মক্ষেত্রে প্রধান সম্বল নহে। কবি তাঁহার ‘আসরারি খুদি’ নামক কাব্য গ্রন্থের এক স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিশ্ব সমস্যার সম্বন্ধে কোন সময়ে তিনি অপ্রত্যয়ের ফল ভোগ করিয়াছেন।...

দেশ ও কালের পার্থক্য থাকিলেও ইকবাল ও গেটের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তাহাও অতি বিস্ময়কর। জার্মান কবি গেটের সময় দেশবাসীর অধঃপতনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার কবিতার প্রেরণা তাহাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ইকবালের বাণীও ঠিক এইভাবে দেশের পক্ষে কার্যকরী হইয়াছে। তিনি ভারতীয় মুসলমানদিগকে পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহের জড়বাদিষের বিফলতা দেখাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে স্বীয় ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। কেবল ভারতে নহে, তাঁহার বাণী সমগ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণীরূপে গৃহীত হইয়াছে।”

সুরেশচন্দ্র নন্দীর ‘ওমর গুরু আবু আলি সিনা’ (৫:২, শ্রাবণ ১৩৩৪) কল্লোলে মুদ্রিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। ‘চয়ন’ বিভাগে ঐ সংখ্যায় নজরুলের একটি গজল গান ও (আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী) কল্লোল থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর পারস্য কবি ‘মুয়িজ্জী ও আনোয়ারী’ (৫:২, শ্রাবণ ১৩৩৪) পারস্যের সভাকবি শ্রুতিধর মুয়িজ্জী সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আলোচনাটি নিয়ে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল:—

“ভারতের বিক্রমাদিত্যের ন্যায় খোরাসানের অধিপতি সঞ্জর স্বীয় রাজধানীকে বিশ্বাৎমণ্ডলীতে পরিশোভিত করিয়াছিলেন। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানা কাব্য-মধুপ সেখানে গিয়া বিচিত্র মধুচক্র রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন কবি মুয়িজ্জী। মুয়িজ্জীর নিকট ছাড়পত্র না পাইলে কোনও নব্য-সাহিত্যিক সম্রাট সঞ্জরের রত্নসভায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। সঞ্জরের আদেশ ছিল, নব্য-কবির প্রথমে মুয়িজ্জীর নিকট তাহাদের কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইবে। মুয়িজ্জী যেগুলিকে নির্বাচন করিবেন, সেইগুলিই শুধু সঞ্জরের নিকট পঠিত হইবে।

মুয়িজ্জীর স্মরণশক্তি এমনই প্রখর ছিল যে তিনি একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, তাহাই আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাঁহার এক পুত্র ছিল; তিনি দুইবার যাহা শ্রবণ করিতেন, তাহাই আবৃত্তি করিতে পারিতেন। আর ইহাদের একটি ভৃত্য ছিল, সেও—like master like servant—তিনবার যাহা শ্রবণ করিত, তাহা অবিকল আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিত।

জগতে আত্মপ্রীতি ও পরশ্রীকারতা কাহার না আছে? কবি মুয়িজ্জীও ইচ্ছা করিতেন না যে অপর কেহ উৎকৃষ্ট কবিতা দ্বারা সঞ্জরকে মোহিত করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইবে। তিনি প্রতিভাম্বিত কবি দেখিলেই তাঁহার কবিতা নিজ পুত্র ও ভৃত্যের সম্মুখে মনোযোগ পূর্বক শুনিতেন এবং তৎক্ষণাৎ বলিতেন, ‘এ তো আমারই লেখা কবিতা!’ এই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। যত বড় কবিতাই হউক, মুয়িজ্জীর স্মরণশক্তি জীবনে কখনও তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ করে নাই। শুধু নিজ আবৃত্তি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না, নিজের আবৃত্তি শেষ হইলে বলিতেন, ‘দেখুন, এ যে আমার কবিতা, এর প্রমাণ—আমার পুত্রেরও ইহা মুখস্থ আছে।’ এই বলিয়া স্বীয় পুত্রকে উহা আবৃত্তি করিতে বলিতেন। বাপুকা বেটা সেও অনর্গল উহা আওড়াইয়া যাইত; কেননা ইতোমধ্যেই তাহার উহা দুইবার শোনা হইয়া গিয়াছে। পুত্রের আবৃত্তি শেষ হইলে মুয়িজ্জী স্বীয় ভৃত্যকে উহা আবৃত্তি করিতে বলিতেন। সেও তোতা পাখীটির মত উহা ললিতস্বরে গাহিয়া যাইত। কেননা তাহার ইতোমধ্যেই ঐ কবিতা তিনবার শোনা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থ লোকেরা তখন আর মুয়িজ্জীকে অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না। ফলে নব্য-প্রবেশার্থী মুয়িজ্জীর নিকট হইতেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত।

সভাসদেরা মুয়িজ্জীর চতুরতা না বুঝিলেও যাহারা প্রতারণিত হইত, তাহারা তো নিজ অন্তরে অন্তরে জানিত যে মুয়িজ্জীর ইহা প্রতারণা! তাহারা রাজসভায় প্রতিবাদ করিতে সাহসী না হইলেও স্বদেশে গিয়া এই অদ্ভুত লোকটির প্রতিভা ও চতুরতার কথা প্রচার করিত।

যুবক-কবি আনোয়ারী ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। একদিন এক রাজকবিকে মহাডুসরে হস্তী-আরোহণে বেড়াইতে দেখিয়া আনোয়ারীর ধারণা হইল, ধনৈশ্বর্য ও ললিতকলার

ভিতর যে চিরন্তন বিরোধ, মহা মিথ্যা কথা। তিনি সেই দিবসেই রাত্রিতে বীজগণিত, জ্যামিতি, আর খগোল শাস্ত্র যা কিছু ছিল, সমস্তই সময়ে বাক্সে পুরিয়া কবিতা-চর্চায় লাগিয়া গেলেন এবং লিখিলেন

গার্দেল্ ও দাস্ত্ বাহার ও কান্ বাশাদ।
 দেল্ ও দাস্তে খোদায়গান্ বাশাদ॥
 খোশ্‌র বান্দা রা চু দহ্ সাল্ আস্ত।
 কাশ্ হামী আরযুয়ে অঁ বাশাদ॥
 কায্ নদীমানে ময়্‌লেস্ আর না বুয়াদ।
 আয্ মকীমানে আস্তান বাশাদ॥
 আনোয়ারী রা খোদায়-গানে জাহান।
 পেশে খোদ খান্দ ও দস্ত দাদ ও নেশান্দ॥

ইত্যাদি।

অনুবাদ :

হৃদয় কাহার সাগরপারা হস্ত রতনখনি
 তোমায় শুধু সম্ভবে তা' ওগো মানবমণি!
 দশটি বরষ এই আশাতে ওগো শাহান্ শাহ,
 বান্দা তোমার জীবন যাপে, আজকে বলি তা।
 তোমার রতন-সভার মাঝে বস্তে যদি নারি—
 স্বারে তোমার ধুলোয় মাথা রাখতে যেন পারি।
 আজকে আমার পূর্ণ আশা ওগো জাহানপতি,
 ডাক পড়েছে তোমার সভায় গেতে বন্দ-গীতি।

কবিতা লিখিয়া আনোয়ারী আশায় বুক বাঁধিয়া খোরাসানে চলিলেন। সেখানে সঞ্জরের বিশ্ব-বিশ্রুত রত্ন-সভা। কিন্তু পরে মুয়িজ্জীর কীতিকলাপ শ্রবণ করিয়া আনোয়ারী যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। পরিশেষে এক কৌশল মনে মনে স্থির করিলেন। “শাঠে শাঠাং সমাচরেৎ।” আনোয়ারী ছিন্তাবাস পরিধান করিয়া নানা অস্ত্রভঙ্গী করিতে করিতে মুয়িজ্জীর সমীপে উপনীত হইয়া এক বিচিত্র চং-এর পাঁচালী গাহিলেন। মুয়িজ্জী দেখিলেন, এ একটা মস্ত ভাঁড়। বলিলেন “তুমি কি চাও?” আনোয়ারী কহিলেন, “হজুরের মজ্জি হইলে শাহানশাহ্ সম্রাটকে একটা ছড়া শুনাইয়া এ বান্দা নসিব বলদ করিত।” মুয়িজ্জী দেখিলেন, ইহাতে কোনও আপত্তির কারণ নাই। তিনি আনোয়ারীকে সঙ্গে করিয়া সঞ্জরের সভায় লইয়া গেলেন। মুয়িজ্জীর বিশ্বাস ছিল—এ বেটার ভাঁড়া-নীতে আজ রাজসভায় বেশ একটা রগড় হইবে। সভায় প্রবেশ করিয়া সঞ্জরের প্রবেশের পূর্বেই আনোয়ারী পূর্ববেশ পরিবর্তন করিয়া মনোহর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইলেন। তারপর সম্রাট-সমীপে আহত হইলে তাঁহার কবিতার প্রথম পদ আবৃত্তি করিয়াই মুয়িজ্জীর দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিলেন এবং সবিনয়ে নিবেদন করিলেন—“হজুরের যদি এ কবিতা জানা থাকে, তবে আমি আর এ কবিতার বাকীটুকু বলিতে চাই না, হজুরের মধুর কণ্ঠেই সেটুকু ভাল শুনাইবে। শাহানশাহ্ও খুশী হইবেন।”

মুয়িজ্জী শ্রুতিধর হইলেও অশ্রুত জিনিষ তো আর আবৃত্তি করিতে পারেন না। তিনি বুঝিলেন, এবার তিনি সহজ পাল্লায় পড়েন নাই। সঞ্জর তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেই মুয়িজ্জী বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, “না খোদাবন্দ, এ কবিতা আমার জানা নাই।” তখন আনোয়ারী তাঁহার কবিতার বাকী অংশ পাঠ করিলেন। সঞ্জর তাঁহার কবিতায় এমনই

আকৃষ্ট হইলেন যে অগণিত মণিমুক্তায় তাঁহার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া দিলেন এবং রাজসভায় তাঁহার জন্য সর্বোচ্চ স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। মুয়িজ্জী মানমুখে আনোয়ারীর কবি-প্রতিভার বন্দনা করিয়া নিম্নতর আসন গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘাতুরেরা মনে মনে হাসিল।”

এ জেড. নুর. আহমদের ‘আরব কবি আবুল আতাহিয়া’ (৫:৩, ভাদ্র ১৩৩৪) পরিচিতি-মূলক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ‘কবি হালী’ (৫:৭, পৌষ ১৩৩৪) প্রবন্ধটিও পরিচিতিমূলক। প্রবন্ধের শেষাংশে হালীর রচনা প্রসঙ্গে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন লিখেছেন:

“মৌলানা হালী গদ্য ও পদ্য উভয় ধরনের রচনাই রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সকল গ্রন্থের মধ্যে “মদ-ও-জঘন-ই-ইসলাম”—বনাম মসাদ্দস-ই-হালী—সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। ইহার কথা পরে বলিতেছি। নিম্নে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করিতেছি।

- (১) হায়াত-ই-সাদী (১৮৮১ খৃষ্টাব্দ)।
- (২) দিওয়ান-ই-হালী (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ)।
- (৩) ইয়াদগার-ই-গালিব (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ)।
- (৪) শেকোয়া-ই-হিন্দ (১৮৬৩? খৃষ্টাব্দ)।
- (৫) মনাজাত-ই-বেওয়া (১৮৯০ খৃষ্টাব্দ)।
- (৬) হায়াত-ই-জাবেদ (?)
- (৭) রুবাইয়াত-ই-হালী (১৯১৮ খৃষ্টাব্দ)।
- (৮) মসাদ্দস-ই হালী (১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ)। ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে হায়াত-ই-সাদী, ইয়াদগার-ই-গালিব, হায়াত-ই-জাবেদ জীবনী ও গদ্যে লিখিত। হায়াত-ই-জাবেদ (চিরন্তন জীবন) সার সৈয়দ আহমদের জীবনী, অন্য দুইখানি কবি সাদী ও হালীর কবিগুরু গালেবের জীবনী। এই তিনখানি গ্রন্থই উর্দু গদ্য-সাহিত্যের স্থায়ী দান ও যুগপ্রবর্তক রচনা। এই সকল গ্রন্থের প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি ছাড়াইয়া তাঁহার মসাদ্দসের খ্যাতি ভারতে দিগদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। মসাদ্দস সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মসাদ্দস ষড়পদী কবিতা, নিম্নলিখিত ছন্দে ইহা রচিত হয়।

কাসেনে। ইয়ে বকরা। তুসেয়া। কে পুছা।
মরজতে। রি নজ্জদিক। মোহাল্লক। হ্যায় কিয়া কিয়া।
কহা দুখ। জাঁহামে। নেহি কোই। এয়সা।
মগেরওয়া। মরজজিস্। কো আসা। ন সম্বে।
কহাযো। তবিব উস্। কো হাজি। য়াঁ সম্বে।

(মসাদ্দস-ই-হালী)

মসাদ্দাস অবাধ লীলাভঙ্গীতে নৃত্যের তালে তালে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়। ইহা পড়িতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না। কবি হালীর মসাদ্দসের মত এত দীর্ঘ মসাদ্দস উর্দু-সাহিত্যে আর নাই, এবং এমন ধরনের পুস্তক আধুনিক ভারতীয় কোন সাহিত্যে নাই। জাতির কল্যাণ ও নবজাগরণ-মূলক এত সুন্দর, এত হৃদয়গ্রাহী ও উত্তেজক রচনা

আর কেহ লিখিতে পারেন নাই। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির স্বদেশমূলক কবিতাও ইহার সমতুল্য নহে। ইহার প্রভাব সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হিন্দুস্থানের নব-অভ্যুদয়ের মূলে রহিয়াছে এই মসাদ্দস এবং এখনও ইহার কার্যকরী শক্তি ও প্রভাব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, প্রত্যুত উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়াই চলিয়াছে। তিনি প্রথমেই গাহিয়াছেন,—

পস্তুতীকো হদ্‌সে গোজারণা দেখ্‌খে,
ইসলাম কি গের করণা উতর না দেখ্‌খে।
মানেনা কভী মাদ হ্যায় হর জবর কি বাদ,
দরিয়া হামারে যো উতর-না দেখ্‌খে।

ইহাই হইল তাঁহার মসাদ্দসের Prologue, তারপর তিনি ইসলামের উৎপত্তির ইতিহাস, যন অন্ধকারসমাচ্ছন্ন অসভ্য, দুর্দান্ত আরবদের উপর তাহার প্রভাব, ইসলামের গৌরব-কাহিনী, ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনা ও কর্ম ইত্যাদির ইতিহাস অতি উজ্জ্বল ভাবে মর্গস্পর্শী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে ইসলামের অধঃপতনের কারণসমূহ, অবহেলিত ও অবজ্ঞাত হইবার পরস্পর-সংশ্লিষ্ট দুর্বলতা ও হীনতার কথা বলিয়াছেন।

তিনি মুসলিমের অধঃপতনের যে-কারণ দেখাইয়াছেন তাহার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবহেলা ও বিলাসিতার প্রসারই মূলীভূত কারণ। শিক্ষা ও দীক্ষার যঁরা পথপ্রদর্শক, তাঁহা-দিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিয়াই আজিকার মত বিদায় গ্রহণ করি।

বহুত লোগ বনকর ছয়া আহুখাহে উম্মত,
সফিয়ুন সে মেনওয়া কে আপনি ফজিলত।
সদাগাওঁ দরগাওঁ, নওবত বনওবত,
পড়ে ফেরতে হ্যায় করতে তহসিলে দৌলত।
ইয়ে ঠহরে মায় ইসলাম কি রাহনমা আব,
লকব উন্কা হ্যায় ওয়ারেস-অল-আমিয়া আব।
বহুত লোগ পীরোঁ কি আওলাদ বনকর,
নেহি জাতে ওয়ালা মে কুছ্ দিনকা জওহর।
বড়া ফখর হ্যায় জিন্‌কো লেকে সে ইস্পর,
কে যে উন্‌কি ইসলাম মকবুল-ই-দাওয়ার।
কেরশ্‌ মা হ্যায় যা যা কে ঝুটে দেখাতে,
মুরিদুঁকো হ্যায় লুটেতে আওর খাতে।”

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ-র ‘মহাকবি ফরিদউদ্দীন আত্তারের শেষ জীবন’ (৬:১, শ্রাবণ ১৩৩৫) ব্রাউনের পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস ‘অবলম্বনে লিখিত’ (ঐ পৃ. ২ পা. টা. দ্রষ্টব্য)। উপসংহারে প্রাবন্ধিক নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করেছেন :

“যে যুগে আত্তার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনকার সমাজ তাহাকে বুঝিবার মত ধীসম্পন্ন ছিল বলিয়া মনে হয় না। ওমর খাইয়ামের কাব্যপ্রতিভা স্বদেশে অনাদৃত হইয়াছিল। তাঁহারই পরবর্তী কবি আত্তারের জীবনেও দুর্ভোগের সীমা ছিল না। আত্তার খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রায় এক শতাব্দী জীবিত ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের অর্ধশতাব্দী পর হইতে লোকে তাঁহার মর্যাদা বুঝিতে

আরম্ভ করে। তাই দেখিতে পাই ঋষি জালালউদ্দীনের যুগে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে আন্তারের ললিত ভাষায় সানাইয়ের তত্ত্বজ্ঞান মিশ্রিত করিয়া কাব্য লিখিতে অনুরোধ করিতেছেন। আর তারই ফলে রচিত হইল বিশ্ব-বিশ্রুত 'মসনবী'।

সৈয়দ আফতাব হোসেনের 'মহাকবি ফেরদৌসী' (৬:৪, কাতিক ১৩৩৫) একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। এটি মূলতঃ কবিজীবনী। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর 'পারস্য প্রতিভা' ও মোবারক আলীর 'ফেরদৌসী' লেখকের প্রধান অবলম্বন।

মুজিবর রহমানের 'উর্দু সাহিত্যে হালী' প্রবন্ধটি (৬:৫, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫), 'মুসলিম রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত মোহাম্মদ তাহের জামিলের 'প্রবন্ধ অনুসরণে' রচিত (ঐ, পৃ. ৩২৪ পা. টী. দ্রষ্টব্য)।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর 'মহাকবি আন্তারের যুগ' (৬:৭, মাঘ ১৩৩৫) একটি সুলিখিত তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। প্রবন্ধের শেষাংশে আরব ও পারস্য মনীষার পার্থক্য এবং আন্তারের অবদান সম্পর্কে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ যে মন্তব্য করেছেন তা অনুধাবনযোগ্য :

“ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে মাজ্জিত ও সংযত সুফী মত মহাকবি, সা'দীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আন্তারে তাহার সূচনা। এই সময়ে ভাবী উন্নত সুফীমতের যে চর্চারম্ভ হয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে উহা পরিপুষ্ট হয়। তাহারই উজ্জ্বলতম স্রষ্টি হাফেজ, জালালউদ্দীন রুমী ও আবদুর রহমান জামী।

ইসলাম জগতের শাস্ত্র-বিদ্রোহ (illumination) আরবে উদ্ভূত হইলেও পারস্যে (ক) অবতারবাদ ও (খ) একমবাদ এই দুইটি অনৈসলামিক প্রেরণার সংস্রবে আসিয়া উহা রূপান্তরিত ও পরিপুষ্ট হয়। আরবেরা সেমিটিক্ সম্প্রদায় ভুক্ত, তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা বহির্গামী। পারস্য বাসীরা আর্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহাদের চিন্তাধারা অন্তর্গামী। আরবেরা প্রত্যক্ষবাদী, emprical, পারস্যবাসীরা ভাববাদী metaphysical. আরবেরা স্রষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে দ্বৈতবাদী (Dualistic) তাহারা স্রষ্টিকে স্রষ্টা হইতে পৃথক করিয়া দেখে, যেমন শিল্পী ও তাঁহার রচনা ; পারস্যবাসীরা এ সম্বন্ধে একমবাদী (monistic) ; তাঁহারা স্রষ্টির ভিতরই স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আরবদের মতে আল্লাহ পৃথিবীর উর্দ্ধ হইতে বিশ্ব শাসন করেন ; পারস্যের দার্শনিকদের মতে স্রষ্টির কণায় কণায় তাঁহার সত্তা স্পন্দিত হইতেছে। আরবেরা ধর্ম্মের আদেশকে বাহিরের আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করেন। পারস্যবাসীরা উহাকে অন্তরের চিরন্তন বাণী বলিয়া বিশ্বাস করেন। এক কথায় আরব মনোবৃত্তি ethical আর পারস্য মনোবৃত্তি metaphysical এই কারণেই কোরাণে আল্লাহর সর্ব্ব-কার্য্য-নিয়ন্ত্রণ-শক্তি ও সর্ব্বব্যাপকতা ঘোষিত হইলেও পারসীক ভাবধারায় নিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আরবেরা আল্লাহকে তাঁহাদের নিজ অন্তরাত্মার সহিত সত্তাহিসাবে এক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আত্মাকে এই আভিজাত্য প্রদানের জন্য পারস্যই নিমিত্ত ভাগী। আত্মাকে আল্লাহর সহ-সত্তা বলাও যা, মানুষকে আল্লাহর ছোট ছোট অবতার বলাও একই কথা। পারস্যের ভাবকেরাই এই ভাবে হজরত মুহম্মদের (দঃ) ভিতর আল্লাহর প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন ও তাঁহাদেরই আর এক সম্প্রদায় শিয়া মতের উপাসক হইয়া হজরত আলীকেও আল্লাহর অবতার করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাদেরই কতক লোক ইসমাইলী সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। আর পূর্ব্বোক্ত দল (যাঁহারা সকল মানুষের আত্মাতে একই আল্লাহর সত্তা বিশ্বাস করিতেন) হইতে পরিণামে মাজ্জিতজ্ঞান সুফী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। এইরূপে পারস্যবাসীদের স্বভাব-স্বলভ অবতার বিশ্বাস জগৎকে উন্নত ধরণের শিয়া মত প্রদান করিয়াছে।

আর তাঁহাদের একমবাদ (Pantheistic monism) জগৎকে পরবর্তী যুগে উচ্চ অঙ্গের সুফীবাদ উপহার দিয়াছে। নাসির খস্রু সেই উন্নত শিষ্যদের অগ্রণী ছিলেন। আর আত্মার ভিতর সুফীবাদ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

প্রত্যক্ষবাদী (empirical) আরব দার্শনিকেরা যাহা প্রমাণিত হইতে পারে তদ্ব্যতীত কিছুই বিশ্বাস করিবেন না, এইরূপ সংকল্প লইয়া শাস্ত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকেন। তাঁহাদের মতে মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি ও পরলোক সমাজসংস্কারের অলীক কল্পনা মাত্র। কিন্তু পারস্যের অবতার বিশ্বাস ও একমবাদ তাঁহাদের এই দার্শনিক মতকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। বিশ্বে একজন স্রষ্টা ও শাসক আছেন, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিলেন। মানবাত্মা ও বিশ্ব-আত্মা যদি একই তবে মানবাত্মাও অবিনশ্বর; এই সূত্র ধরিয়া কেহ কেহ মানবাত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করিলেন। কিন্তু উহা যে মৃত্যুর ওপারে গিয়াও বিশ্ব-আত্মা হইতে পৃথক থাকিয়া বরাবর সুখ বা দুঃখের অধীন হইতে থাকিবে এ সম্বন্ধে তাঁহারা কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইলেন না। পক্ষান্তরে বাহিরের কেতাবী ধর্মাদেশ তাঁহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মন যাহা সম্ভব বলে তাহাই নীতি, তাহাই কর্তব্য; শুধু দেখিতে হইবে, রাষ্ট্রীয় বিশৃংখলা যেন না আসে; এই হইল তাঁহাদের ধর্মমত বা নীতিবিধান। এই বিবর্তনের ফল এই হইল যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা যে সকল শাস্ত্র-বচনকে অমোঘ ও অকাট্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ভ্রমেও যেগুলির বিরুদ্ধে রসনাসঞ্চালন করিতে সাহসী হইতেন না। পরবর্তী মুসলিম সম্মানগণ আর সেই সকল শাস্ত্রদেশকে সেই ভাবে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লর্ড বেকন প্রমুখ মনীষীবৃন্দ ইউরোপে যেমন গতানুগতিক জ্ঞানানুশীলন পরিচালনা করিয়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রবর্তন করেন, দশম শতাব্দীর মুসলিম তরুণেরা তেমনি কেবল মাত্র লজিক ও বিজ্ঞান সম্ভব প্রমাণকেই সত্যাসত্য নির্ধারণের কষ্টী পাথর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আলোকিত যুগের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হইলেন আবু সিনা (মৃত্যু ১০৩৬), আল্ গজ্জালী (মৃত্যু ১১১১), ইবনে বাজা (মৃত্যু ১১৩৪), ইবনে তোফায়েল (১১০০-১১৮৫), এবনে রোশদ (১১২৬-১১৯৮) ইত্যাদি। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দলের ঋণিক ছিলেন জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খাইয়াম (১০৭৫-১১২৪)। ইঁহারা সকলেই যে free-thinker বা নাস্তিক ছিলেন তাহা নহে। তবে ইঁহাদের সকলেরই চিন্তার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রামাণিকতা।

পূর্বের সূর্য্য পশ্চিমে যায়। এসিয়ার ওমর খাইয়ামের ভিতর যখন এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চা পরাকাষ্ঠা লাভ করে তারপর হইতে প্রাচ্য ভূখণ্ডে উহার বিদ্রোহ-তেজ মাধ্যাহ্নিক রেখা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে। কিন্তু ইউরোপে এই কালচার এবনে রোশদ ইত্যাদির চেষ্টায় তার পরও উত্তরোত্তর উৎকর্ষলাভই করিতেছিল।

সুপ্রসিদ্ধ আল্ গজ্জালী বিজ্ঞানপন্থী হইয়াও শাস্ত্রানুশাসনের সংরক্ষক ছিলেন। তিনি যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রানুমোদিত দর্শনের প্রবর্তন করিয়া যান, ওমর খাইয়াম প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর বিপরীত প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার গতি ক্রমশঃ অগ্রগামীই হইতেছিল। তাপস কবি ফরিদউদ্দীন আত্মার সাধনায় উহার ধারা শক্তিশালিনী হইয়া উঠে। আত্মার তাসাউফ সাফল্যের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাসমূহ বিপুল শক্তিতে মানুষকে সুফীমতে আকৃষ্ট করিতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর অর্দ্ধ শতাব্দী পরই ইসমাইলী মতের উপর সুফী মতের শ্রেষ্ঠ প্রতীকিত হয়। বিজ্ঞানপন্থীদের অনুসন্ধিৎসা পূর্ববৎ রহিয়া গেল। তাঁহারা সুফীসাধনার রস-সমুদ্রে বিস্ময় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

মোটামুটি বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে ওমর খাইয়াম প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক কালচার খাঁটি শাস্ত্রীয় কালচারের সহিত যুগ্ম হইয়া যায় আন্তর প্রমুখ মনীষীগণের জীবনের নিশা পুরের বুলবুল ওমরের ছায়া কখনও আন্তরের দেহে নিপাতিত হইয়াছিল কিনা জীবনা-খ্যায়কগণ তাহা লিখিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার যে বৈজ্ঞানিক সাধনা সে যুগকে আলোকিত করিয়াছিল তাহার রশ্মি অবশ্যই আন্তরকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে।”

মোহাম্মদ কাসেমের ‘মহাকবি হাসসান-বিন-সাবেত’ (৬ : ৭, মাঘ ১৩৩৫) প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর সমকালীন কবি হাসসানের জীবন ও কাব্য সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

নরওয়ের বিখ্যাত ‘ঔপন্যাসিক ন্যুট হামসুনের’ জীবন ও সাহিত্য আলোচনা করেছেন এম. নাসির আলি (৬:১১, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯২০) এই ঔপন্যাসিকের প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ প্রবন্ধকার সংগ্রহ করেছেন হানা আর্সট্রুপ লারসন-রচিত ‘ন্যুট হামসুন’ শীর্ষক জীবনী গ্রন্থ ও এ. আর. মোবল রচিত ‘দি নোবেল প্রাইজ উইনার্স’ গ্রন্থ থেকে।

এ. জেড. নূর আহমদের ‘আরব কবি ইমর-উল-কায়েস’ (৬:১১, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) কবি-পরিচিতিমূলক ছোট নিবন্ধ।

ইমরুল কায়েস সম্পর্কে পরবর্তী প্রবন্ধটি লিখেছেন মোহাম্মদ কাসেম (৭:৪, অগ্র-হায়ণ ১৩৩৬)। তাঁর প্রবন্ধের নাম ‘স্বভাব কবি ইমরুল কায়েস’। এটিও প্রধানতঃ কবির জীবন ইতিহাসের বর্ণনা। প্রবন্ধের শেষাংশে কায়েসের কবি প্রতিভা সম্পর্কে মোহাম্মদ কাসেম লিখেছেন :

“ইমরুল কায়েসের লেখার প্রধান বিশেষত্ব এই যে—সর্বত্রই অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তব-সত্যের ভেতর কোথাও এতটুকু রং ফলাবার চেষ্টা মাত্র নেই, সবটাই যেন স্বাভাবিক—সবটাই যেন বাছাই করা উপভোগের সামগ্রী। এরই জন্য তাঁর লেখা অতি মনোরম হয়ে ফুটে উঠেছে। এই প্রকার রচনা-ভঙ্গী সে যুগে আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। মানুষের মনের সৃষ্টির প্রেরণাই সাহিত্যে নব সৃজনে নিয়োজিত করে—ইমরুল কায়েস ছিল কবি, তাঁর ভাবের যে উৎসধারা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, তাই তিনি প্রকাশ করে গেছেন। বাইরের জগতের মাপ-কাঠি ও মানুষের গড়া তুচ্ছ বন্ধনের অনুশাসন তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি—তাই তাঁর ভাব এত মধুর, এত নূতন, এত অদ্ভুত যে, তাঁর অনুবাদ শত চেষ্টাতেও যথাযথ হয় না। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির মন যত প্রসারিত হবে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তত বেশী সম্পদ পাওয়া যাবে। তাঁর লেখায় এমন কতকগুলি অশ্লীল ও কুরুপূর্চির্ণ কবিতা আছে, যা’ প্রকাশ করা বর্তমান যুগের রুচি গর্হিত। তিনি যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় সবে মাত্র গৃহের বন্ধন ত্যাগ করে বাইরের জগতকে যে রঙীন স্বপ্নের মত দেখেছিলেন—তারই দরুন দু’চারটা কালো ছিটা পড়ে লেখা মাঝে-মাঝে কুৎসিত হয়ে গেছে। আবার যখন সে স্বপ্নকে অভিজ্ঞতার পরদা দিয়ে মন থেকে আড়াল করে দিল—তখন সর্বত্রই একটা পবিত্র মাধুর্য্যে ভাবগুলি ফুটে উঠেছে। শৈশবে মাতা, যৌবনে পিতা কর্তৃক আশ্রয় হারিয়ে নিতান্ত পথহারা পরিত্যক্ত ভাবে কায়েস জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ফাতেমার প্রতি কায়েসের যে ভালবাসা ছিল, তাতে সেই বয়স-স্নেহ সঙ্কোচ ও হৃদয়-ভরা স্নেহ ছিল, তাতে রিপূর রাগ নেই—শরীরের তাপ নেই, তা সম্পূর্ণ মানসিক।

কোথাও ইন্দ্রিয় তাড়নার প্রবল বিক্ষোভে অনুতপ্ত হয়ে কায়েস বলছেন :

‘কি আশ্চর্য্য বিধাতার সৃষ্টি অপক্লপ!
মদ আর নারী, যত দেখি ততবাড়ে
পিপাসার মুখ।’

কোথাও প্রিয়ার উদ্দেশ্যে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তিনি গাইছেন :

‘হে ফতিমা!
থাকে যদি বিদায়ের চিহ্ন মম—
অন্তরে তোমার,
উপেক্ষার শরে আর ঘায়েল করিওনা—
হৃদয় আমার।
যদি ভালোবাসিবার ইচ্ছা তব
নাহি থাকে মোরে,
তবে এ দেহের যত আবরণ
খসে পড়ে যাক্ দূরে।’

* * *

‘এই অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল হেরিলে তোমার
মনে হয় নারী,
না জানি কাহার ব্যথিত হৃদয়
দিয়াছ গো ধ্বংশ করি।’

আবার কোথাও প্রতিহিংসার জ্বালায় উন্মত্ত হয়ে তিনি বলছেন :

‘বিস্মৃতির অন্তরালে মাঝে মাঝে ঢেকে যায় প্রতিজ্ঞা মোর,
উর্দ্ধ আকাশে বসিয়া পিতা ফেলিতেছে তাই অশ্রুজলোর।
কি ভীষণ! নহে তা’ কভু ভুলিবার নয়—
বণি-আসাদদের তপ্ত খুনে এ অসি রাঙিব নিশ্চয়।’

আবার কোথাও নৈশ-প্রকৃতির-সৌন্দর্য্যের লালিমতায় মুগ্ধ হয়ে সরস কবিত্বের ঝঙ্কারে
প্রাণের তান তুলে কায়েস বলছেন :

‘জেগে আছি গভীর রাতে—
দেখিতেছি বিদ্যুতের খেলা,
মনে হয় মোর—পাহাড়ের ঐ শিরোপরি—
চিরদিন রহিবে কি এই বিজুলীর মেলা।’

আনোয়ার হোসেন রচিত ‘জাপানী কবিতা’ (৯:৫, পৌষ ১৩৩৯) একটি উল্লেখযোগ্য
প্রবন্ধ। প্রাবন্ধিক সংক্ষেপে জাপানী কবিতার ক্ষুদ্র কলেবরে যে জীবনদৃষ্টি ও অন্তরাবেগ
প্রকাশিত হয়েছে তা তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধের মূল অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

“জাপানকে কবির দেশ বলা হইয়া থাকে। কেননা, জগতের আর কোথাও এত কবির আবির্ভাব ঘটে নাই এবং কবিতার এত সমাদরও অন্য কোন দেশে লাভ করে নাই। জাপানের কাব্য সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে তার গীতি-কবিতাই বুঝায়। বিশেষ করিয়া একমাত্র গীতি-কবিতায়ই সে তার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তার রস-সাহিত্যের মধ্যে নাটক কিম্বা মহাকাব্য নাই বলিলেও চলে।

জাপানী কবিতা একদিকে যেমন খুবই যাদুকরী সৃষ্টি অন্য দিকে তেমনি জাতিগত ভাবেও বিশেষত্বের দিক দিয়া পুরাপুরি নিজস্বপূর্ণ।

জাতির মনের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি দিয়াই তার সাহিত্যের সৃষ্টি।—জাতির যে প্রাণ সে তার আর্টের মধ্যেই প্রকাশ লাভ করে। ক্ষুদ্র একটা ফুলের মধ্যে বিশ্ব-সৌন্দর্যের অনুভূতি রূপ লাভ করিয়াছে জাপানী কবিতায়। ইহাতেই তার কাব্য-সৃষ্টির কৃষ্টতা আমাদের চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। প্রকৃতি ও জীবন সম্বন্ধে জাপানী কবি অপূর্ব ভাব পোষণ করিয়া থাকেন :

বুনো-কুসুমের মাঝে,
ক্ষুদ্রতম একটা বালুকণার বুকে,
বিশ্বকে যদি দেখতে চাও—
তবে তোমার মুঠোটুকুর মধ্যে
অসীমকে ধারণ কর,
জীবনের ক্ষণিক সময় টুকুকে
তুমি অনন্তের
উপলব্ধি দিয়া
পূর্ণ ক’রে তোল।

“জাপানী কবিতার মূল ভাব হইতেছে জীবনের ক্ষণ-মুহূর্তটাকে স্মরণ করিয়া ফুটাইয়া তোলা ও ইহার মধ্যে অনন্ত অবিনশ্বরতাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা। অসীম অমৃতের যে আভাস—কবিতা ব্যতীত অন্য কিছুতেই মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সত্যকে যিনি সন্দর্শন করেন এবং নিবিড়ভাবে ইহাকে উপলব্ধি করেন আর এই সত্যের প্রেরণায় মাতোয়ারা যে চিন্ত আপনা আপনি গান গাহিয়া উঠে, তাহাকেই যদি কবি বলা হয় তাহা হইলে এই প্রকার কবির অভাব জাপানে নাই।

জাপানী কবিতা হইতেছে আনুবীক্ষণিক ভাবের। সে অসীমের পানে হতাশ দৃষ্টিতে না তাকাইয়া অসীমের মাঝেই তাকে রূপ প্রদান করিয়াছে। ইমার্সন যেমন বলিয়াছেন :—
তৃণ-শিষাগ্রের ক্ষুদ্র শিশির-বিন্দুর মধ্যে বিপুল ধরণী তার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তেমনি একটা ফুলের মধ্যে বিশ্ব-সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত করিয়া দেখেন জাপানী কবি। জাপানী-কবিতার মর্মকথা হইতেছে যে ক্ষুদ্রতম বস্তু পথেই অনন্ত আলোকের আভাস জাগে—
সেই ছিদ্র-পথ দিয়াই আমরা অবিনশ্বর আলোকময় অসীমকে নিরীক্ষণ করিতে পাই।

“একটা প্রবাদ আছে যে কবিতা স্বর্গের বাণী। পুরাতন যুগের প্রেরণা মূলক যে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ তাহা কবিতায়ই লিখিত হইয়াছে। স্রষ্টার উদ্দেশ্যে যে উপাসনা, স্তোত্র, প্রার্থনা সে সব আজও কবিতার ভাষায়ই হইয়া থাকে। জাপানের সর্বপুরাতন ‘কোজিকী’ ও ‘নিহোঙ্কী’ অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে সংকলিত হয়। এই লেখা গুলিতে পৌরাণিক কাহিনীর সাথে কবিতার একটা সুলভ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোঝা

যায় যে জাপানী গীতি-কবিতাই দুনিয়ার কবিতা-সাহিত্যের সর্বপুরাতন জিনিষ। চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রথম ইংরাজী লীরিকের আবির্ভাব হয়, কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'ম্যানিয়শো'র সঙ্কলিত প্রায় চারি সহস্র কবিতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইহা অষ্টম শতাব্দীরও বহু পূর্বে লেখা হইয়াছিল।

জাপানী কবিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাহাদিগের কবিতা-সাহিত্যের প্রথম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত কবিতার প্রতি তার জাতীয় চিত্তের এতটুকু শ্রদ্ধাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। খৃষ্ট পরবর্ত্তী ৯৭০ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাপানের রাজ-প্রাসাদে একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং আজ অবধি এই প্রতিষ্ঠানটি বজায় আছে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তোলা। সাহিত্য রাজ দরবারের উৎসাহ লাভ করিয়া উত্তোরোত্তর উন্নতি লাভ করে এবং প্রতিভাবান লেখকগণ রাজার কৃপা-দৃষ্টি লাভ করিয়া উচ্চতর রাজকর্মচারীর পদ লাভ করিতে সমর্থন হন। বৎসরে বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে একটা বিষয় মনোনীত করিয়া কবিদিগকে সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে রচনা করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। এই কবিতা প্রতিযোগিতায় যিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করেন তাহাকে কোন একটা নির্দিষ্ট দিনে সম্রাটের সমক্ষে আসিয়া সেই কবিতা আবৃত্তি করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত কবিতার বিষয় বস্তু সাধারণতঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতেই নেওয়া হয়। যেমন নিরঞ্জন বনানীর কোলে বরফে আবৃত পাইন বৃক্ষের শ্রেণী—মন্দিরের সম্মুখে একটা সিঁড়ির তরু। জাপানের ন্যায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সাহিত্য প্রথম কবিতার মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং সে সব সাহিত্য রাজ-রাজদার দ্বারা প্রতিপালিতও হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত সাহিত্যে ও জাপানের সাহিত্যে একটা প্রভেদ লক্ষ্য করিবার আছে। অন্যান্য দেশের পুরাতন যুগের কবিরা রাজা-বাদশাদিগের গুণগান করিয়া তাহাদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইতো আর জাপানী কবি তার জাতির মনের শুদ্ধ সৌন্দর্য উপলব্ধির স্বাধীন-মনোবৃত্তি পূর্ণ প্রেরণা দিয়া অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া তার সাহিত্য-প্রতিপালকের মনস্তৃষ্টি সাধন করেন।

প্রাণের অসীম সৌন্দর্য উপলব্ধিকে জাপানী কবি এত সহজ সুন্দর ছোট একটা কবিতায় রূপ দেন যে দুনিয়ার আর কোন দেশে ইহার জোড়া মিলে কি না সন্দেহ। জাতির ভাবপূর্ণ মনের সুন্দর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ পাওয়া যায় তার কবিতায়। তাদের কবিতা কতকটা ইংরেজী সনেটেরই মত বরঞ্চ তারও চাইতে সংক্ষিপ্ত—অথচ গভীর ভাব ও সৌন্দর্য্য মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির অধিকাংশ লেখাগুলি যেমন তার ভিতরের অপূর্ব সৌন্দর্য্য, ভাব, কবিত্ব ও আদর্শকে রঙের সহজ আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে যেমন নিগূঢ় রহস্য-সন্ধানী মনের দরকার হয় তেমনি জাপানী কবিতার মর্ম একমাত্র সমজদার পাঠকই বুঝিতে পারেন। জাপানের এই কবিতাগুলিকে 'ট্যাক্সা' বলা হয়। নিম্নে এই ধরনের একটা কবিতার অনুবাদ দেওয়া হইলো :

হে প্রিয়তমা, জানি আমাদের মিলন ক্ষণস্থায়ী
জানি একদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব
কিন্তু, তবু যখন স্তব্ধ ইনাবা পর্বত
পাইন বৃক্ষের শাখায় শাখায়
মৃদু বাতাসে ধ্বনিত আমার প্রাণের সঙ্গীত শ্রবণ করি
তখন মনে হয় আমরা আবার মিলিত হবো

এই ধরনের কবিতা ইংরেজী সনেটের চাইতে যে সংক্ষিপ্ত তাহা বেশ বোঝা যায়। এই 'ট্যাক্সা' ব্যতীত অন্য এক ধরনের কবিতা আছে সেই গুলি সনেটের মতই প্রায় দীর্ঘ, তাহার নাম হইতেছে 'নাগাউটা' ইহা ছাড়া আরও এক প্রকার কবিতা আছে যাহা 'ট্যাক্সা'র চাইতেও আকারে ছোট। এই অতি সংক্ষিপ্ত কবিতাকে তারা 'হক্কো' বলিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের এই ধরনের প্রতিভাবান কবিতা লেখক কবি বাগুর একটা লেখার অনুবাদ দেওয়া গেলো :

সে আর কিছুই করেনি'
শুধু গান গেয়েছে,
খাঁচার ভিতরে বন্দী প্রজাপতি
অব্যক্ত বেদনায় গুমরে মরছে—
আহা অভাগা প্রজাপতি!

তারপর আর একপ্রকার কবিতা আছে সেগুলি যেমন রসোদ্দীপক তেমনি ভাবযুক্ত :

তুমি বলছ আমি শুকনো ফুল!
হায় তুমি কেবলি অবহেলা করলে,
মুখ ফিরায়ে নিলে,
ভেবে দেখলে না আমিও একদিন
কোমল-প্রাণা স্নন্দরী ফুল ছিলাম—
আমার পানে চেয়েও একদিন নইটুইঙ্গেল
গান গাইতো।

প্রতীচ্যের অন্য কোন দেশে এই প্রকার সংক্ষিপ্ত ধরনের কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় না। চীনের সঙ্গে যে সময়ে জাপানের যোগাযোগ ছিল তখন চীন-সাহিত্যের অনেকটা প্রভাব তাহাদিগের উপর পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে সেই প্রভাবকে ছাড়াইয়া নিজস্বভাবে সাহিত্যকে তারা রূপদান করিতে পারিয়াছে। জাপানী কবিতার বিশেষত্ব হইতেছে তার স্বচ্ছন্দ সহজ প্রকাশ ও তার সংক্ষিপ্ততা। নেহায়েৎ অ-কবির কাছে এগুলি বেথাপ্পা শুনাইতে পারে, কিন্তু ছন্দের বাহাদুরী ও ভাষার কেরদানী ছাড়াও এই সহজ-প্রকাশক কবিতা যে কোন কবি-প্রাণ লোকদিগের চিত্তকেই গভীরভাবে স্পর্শ করে।

জাপানী কবিতা যেমন স্নন্দর সহজ করিয়া তার জাতির অন্তর্নিহিত মনের ভাবটাকে রূপ দিয়াছে তেমন অন্য কোন দেশের কবিতা পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। জাপানের নৈসর্গিক দৃশ্য যেমন কবিত্বময় তেমনি সেই দেশের মানুষগুলির মনও কবিতার ভাবে পরিপূর্ণ। তাহাদিগের গতি, তাহাদিগের ভাষা, তাহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ—সমস্তই যেন কবিত্বপূর্ণ। জাপানী-নৃত্যও ঠিক তেমনি কবিত্বময়। এই নৃত্য-শিল্প যেন তাহাদিগের কবিতারই ব্যক্ত রূপ—প্রত্যেকটি গতিচ্ছন্দে ইহা দর্শকের চিত্তকে ভাবে অভিভূত করিয়া তোলে।

বাহিরের লোকদিগের কাছে জাপানীরা নেহায়েৎ কাঠখোঁটী বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু, আসলে তারা তা' নয়। একটা জাতিগত ভাবের প্রথায় তারা কবিতাকে চিরকাল রূপ দিয়াছে। অবশ্য বর্তমানে সেই নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে ভঙ্গ হইতেছে বটে, কিন্তু, তবুও তাহাদিগের জাতির মনোবৃত্তিটাই এই প্রকার যে সে তার মনের ভাবটাকে অতি

সহজ করিয়া অতি সংক্ষিপ্ত করিয়া সুলভভাবে ফুটাইতে চায়। প্রকৃত কথা বলিতে কি তার জাতীয়-মন অতিরিক্ত কল্পনা প্রিয়। অথচ সেই কল্পনাটিকে সে বিশেষভাবে মোটেই ফুটাইয়া তুলিতে চায় না। স্বচ্ছন্দ-সহজভাবে অনির্বচনীয় রহস্য মাধুরীর পানে কেবল একটু ইঙ্গিত সে দেয় মাত্র।

জাপানী কবিদের বিশ্বাস যে কবিতা হীরক-খণ্ডের ন্যায় চিরকাল প্রভাদান করিবে, সুতরাং মানুষের সামাজিক প্রথার পরিবর্তনের সঙ্গে তার পরিবর্তন হইবে কেন? তার বাইরের আবরণের পরিবর্তন হইতে পারে তাই বলিয়া ভিতরকার প্রভা সে হারাইবে কেন?”

খালেকদাদ চৌধুরীর ‘রূপ-সাহিত্য ও টেলিষ্ট’ (৯:৬, মার্চ ১৩৩৯) একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ। প্রবন্ধের মূল অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

‘রূপ-সাহিত্য’ লাক্ষিত মানবতার এক বিরাট প্রতীক। সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দীটা ধরে শত অত্যাচার-উৎপীড়নের ভিতর দিয়ে এই সাহিত্যের সৃষ্টি। যে সব মনীষীদের স্বাধীন চিন্তাধারা ও জীবনব্যাপী অক্লান্ত সাধনা এই বিরাট সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাঁদের যে কী নৃশংস অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তা সাহিত্যিক বা ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। যে সব মনীষী এই বেদনার বিরাট সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে টুর্গেনিভ, টেলিষ্ট, দস্তয়ভস্কী, শেহভ ও মেক্সিম গোর্কীই প্রধান। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই চিন্তাধারা ধীরে ধীরে রূপ-সাহিত্যে প্রবেশলাভ করে।

১৮১২ খৃঃ অব্দে নেপোলিয়ানের আক্রমণে ধ্বংস-বিধ্বস্ত রূপ তার জাতীয় জীবন গড়ে তুলবার জন্য জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাদের জাতীয় সাহিত্য মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাস-বাসনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় নাই, বরং যে সমাজ জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই সর্বহারাদের দৈনন্দিন জীবনকেই আদর্শ করে তারা তাদের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির পথে যাত্রা শুরু করে। যাত্রার প্রথমেই তাদের বাঁধা পেতে হয়েছিল ভীষণভাবে।

স্বাধিবাদী অভিজাত সম্প্রদায়ও তাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত বুরোক্রেশী পদে পদে তরুণদের সে বিজয় অভিযানে ভীষণভাবে বাধা দিতে থাকে। এ সত্ত্বেও প্রিয়ডভের ‘Woe from Wit’ (1822-23) কাব্য তরুণদলকে তাদের বিজয় অভিযানে অনুপ্রাণিত করে তুলে। একদল তরুণ সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নির্যাতিত মানবতাকে দাসত্ব-শৃংখল থেকে মুক্ত স্বাধীন করে তুলবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। এমন কি প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ১৮২৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরের সেই নৃশংস ঘটনা এদেরই অনুষ্ঠিত। এ দলের পাঁচজন নেতার ফাঁসি হয়। তাদের মধ্যে কবি রিলেয়েভ অন্যতম। এদের এই উন্মত্ততার জন্য উদীয়মান জাতীয় রূপ-সাহিত্যকেও ভীষণ বেগ পেতে হয়। প্রত্যেক সাহিত্যের প্রথম জীবনে যে চিন্তাধারার একটা বিশৃংখলতা দেখা যায় রুশিয়ার জাতীয় সাহিত্যের নব জীবনেও তাই ঘটেছিল। সে যুগটা ছিল রুশিয়ার কাব্য সাহিত্যের যুগ। এ যুগই রুশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি পুশকীনের গৌরবময় যুগ। পুশকীনের চিন্তার এই উচ্ছ্বলতাকে দূর করে রূপ-সাহিত্যকে নূতন ভাবধারার পথ প্রদর্শন করেন।

নূতন ভাবধারা নিয়ে গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন গগল। এই নূতন চিন্তাধারাকে উপন্যাসের ভিতর দিয়ে প্রবর্তিত করেন পুশকীন, গগল ও নারমণ্ডভ।

উনবিংশ শতাব্দী চল্লিশের কোঠায় পা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই Naturalism, Realism ও নির্যাতিত মানবতার বেদনার সংমিশ্রণে এক মহা সাহিত্য গড়ে ওঠে। পরবর্তী কুড়ি বৎসরের মধ্যেই এই অভূতপূর্ব সাহিত্য পাশ্চাত্যের বহু পুরাতন সাহিত্যকে বিস্ময়ান্বিত করে তুলে। এ যুগের বিরাট নূতন সাহিত্যের স্রষ্টা ও পুরোহিত টুর্গেনিভ, গন্থফেরভ, পিসেমস্কী, টলষ্টয় ও দস্তয়ভস্কী। তাঁদের আজীবন সাধনার মধুময় ফল— তাঁদের উদার মুক্ত চিন্তাধারা, সরল Realism, সার্বজনীন মানবপ্রেম, নিপীড়িত মানবের প্রতি দরদ, তাদের জীবনের সুখদুঃখের বিশ্লেষণ যুরোপীয় সাহিত্যে এক নূতন প্রেরণার স্রষ্টি করে।

টুর্গেনিভের আবির্ভাব রুশ সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের আসরে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। চল্লিশের কোঠায় তাঁর সাহিত্য জীবনের আরম্ভ। কৃষকদের নিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, অভাব-অভিযোগ, অত্যাচার উৎপীড়ন সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বিশ্বের চোখে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা তার পূর্বে আর কোনো সাহিত্যিক করেন নাই। দুনিয়ার সর্বহারাদের বেদনার স্বর নিয়ে তাঁর সমসাময়িক টলষ্টয়, দস্তয়ভস্কী ও পরবর্তী শেহভ ও গোকী, কুলী, মজুর, শ্রমিক, প্রলিটারিয়েটদের শোকদুঃখ, অভাব অন-টনের অনেক চিত্রই এঁকেছেন কিন্তু এক টলষ্টয় ভিন্ন অন্য আর কেহ কৃষকদের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা টলষ্টয়ের প্রাণে যে কি বেদনার স্রষ্টি করেছিল তা তাঁর জীবন ও গ্রন্থ থেকে দেখাবার চেষ্টা করব।

১৮২৮ খৃঃ অব্দে রুশিয়ার এক অভিজাত বংশে টলষ্টয়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতা সৈনিক বিভাগে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ছিলেন। তাঁর মাতা রুশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা—জারের আত্মীয় ছিলেন। এক অভিজাত বংশের সন্তান— 'ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত পালিত—উত্তর কালে নিজেও অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও দীন দরিদ্র কৃষকের দুঃখে চিরকাল তিনি প্রাণে এক নিদারুণ বেদনা অনুভব করেছেন। তাদের চিরকালের পুঞ্জীভূত দুঃখদৈন্য দূর করে তাদের জীবনকে উন্নত করে তুলবার জন্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কঠোর সাধনা করেছেন। এমন কি তাঁর অগাধ ধন সম্পত্তি পর্য্যন্ত অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

তাঁর জীবনকে মোটামোটা দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যৌবনের প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রেখে বিলাসিতাময় জীবন যাপন করতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিলাসিতা তার প্রাণকে তিজ করে তুলে। তাই তিনি সহজ সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপনের জন্য ককেসাসে নির্জনবাস অবলম্বন করেন। এই সময় তাঁর এক ভাইয়ের প্ররোচনায় তিনি সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। এখানেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ। অল্প সময়ের মধ্যেই সাহিত্যিক সমাজে যশস্বী হয়ে ওঠেন। সৈনিক জীবন পরিত্যাগ করে সেন্টপিটার্সবার্গে আসেন। তখনকার সাহিত্য-রথিগণ সমাদরে তাঁকে বরণ করে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক টুর্গেনিভের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। পরে কোন কারণে সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ভীষণ শত্রুতায় পরিণত হয়।

এই সময়ে কখনও পিটার্সবার্গে, কখনও মস্কোতে আবার কখনো বা তাঁর নিজের জমিদারীতে বাস করতেন। এখানেই কৃষকদের দুঃখ-দৈন্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের এই দুঃখ-দৈন্য তাঁর প্রাণে এক বেদনার স্রষ্টি করে। এ দূরবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করবার ইচ্ছা তাঁর প্রাণে প্রবল হয়ে উঠে। তাদের এই জীবন মরণ সমস্যার সমাধানের জন্য যুরোপের নানা দেশে ভ্রমণ করে তথাকার কৃষকদের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই সময়ে তিনি হেনরী জর্জ ও

কার্লমার্কসের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। যুরোপ ভ্রমণ শেষ করে নিজ জমিদারীতে এসে স্থায়ীরূপে বাস করতে লাগলেন। সুদীর্ঘ দশটি বৎসর কৃষকদের দুরবস্থা দূর করণের জন্য কঠোর সাধনা, চেষ্টা ও যত্ন করেন। তাদের শিক্ষার জন্য নিজে উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন—নিজে তাদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। নিজের অর্থ, সেবা ও যত্ন দিয়ে তাদের দুঃখ দৈন্য দূর করবার চেষ্টা করেছেন।

এই সুদীর্ঘ কালের অক্লান্ত সাধনার মধুময় ফল উনবিংশ শতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। এই বিখ্যাত Anna Kernina গ্রন্থে তিনি কৃষকদের জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন তা জগতে অপূর্ব—অতুলনীয়। এই দীন-দরিদ্র কৃষকদের জীবনেই তিনি মানব জীবনের প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। যদিও এই সময় তিনি অত্যধিক রূপে ধর্মপ্রবণ হয়ে ওঠেন তবুও তাঁর লেখার প্রথম জীবনের সেই আর্টিষ্ট টেলটয়কে জাগ্রত দেখতে পাই। এ-সময়কার তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'Kruetzer Sonata' কৃষকদের জীবনের এক করুণ চিত্র।

এর প্রায় নয় দশ বৎসর পর তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Resurrection প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি কৃষকদের জীবনের জটিল সমস্যা মীমাংসা করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি যে কার্যপ্রণালী তাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন তা অনুসরণ করে অচিরকাল মধ্যেই এই সর্বহারার দল জগতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। তাঁর মতে স্বাবর সম্পত্তি রাখা পাপ। এই স্বাবর সম্পত্তির অধিকার নিয়েই জগতে যত মারামারি কাটাকাটি। জমিদার ও ধনী সম্প্রদায় সমস্ত স্বাবর সম্পত্তিই অধিকার করে আছে। স্বাবর সম্পত্তি ইংরেজিতে যাকে বলে landed property, হচ্ছে কৃষকদের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। আইনতঃ ও ধর্মতঃ, কৃষকগণই এই ভূমির প্রকৃত মালিক কিন্তু জমিদার ও ধনিকগণ চিরকাল এই কৃষকদের তাদের ন্যায্য ভূসম্পত্তি হতে বঞ্চিত করে আসছে। সারাজীবন তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই মাটির বুক থেকে ফসল উৎপাদন করে আর জমিদার ও ধনিকদল তাদের সেই মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তিলে তিলে তাহাদিগকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছে—তাই আজ জগৎ জুড়ে এই সর্বহারাদের করুণ ক্রন্দন আর বুকফাটা হাহাকার। টেলটয়ের মতে এই ভূসম্পত্তি—যা প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের ন্যায্য—যা নিয়ে এত অত্যাচার উৎপীড়ন—তা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এমন কি এই ভূমি কোনরূপ সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে না। জমির কোনো মূল্য থাকিবে না ও উহা হস্তান্তরিত হতে পারবে না। টেলটয়ের বিশ্বাস যে তা হলে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ দুঃখ-দৈন্য হ্রাস হয়ে যায়। এই বাণীই তিনি তার গ্রন্থের নায়ক নিকলি-উডভের মুখ দিয়ে প্রচার করেছেন।

কৃষকদের জীবনে তিনি মানব জীবনের প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলে চিরকাল মানবকে তার তথাকথিত অন্ধ সভ্যতা ত্যাগ করে সরল ধাত্মিক কৃষকদের জীবন অবলম্বন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কৃষকদের জীবনকে সত্য বলে জেনে ছিলেন বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কৃষকদের উন্নতিতে জগতের উন্নতি, আর কৃষকদের অবনতিতে জগতের অবনতি। কৃষকদের সুখদুঃখের সঙ্গে জগতের সুখদুঃখ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

তিনি তাঁর স্বদেশের কৃষকদের ভিতর জগতের সমস্ত কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের অনুসন্ধান পেয়েছিলেন বলেই তাদের উন্নতির জন্য তাঁর অমূল্য জীবন অকাতরে বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

নির্যাতিত দুভিক্ষ-প্রপীড়িত কৃষকদের জন্য অকাতরে অর্থদান—ককেসাসবাসী দৈন্য-নিপীড়িত, গৃহহারা কৃষকদের দেশান্তরে সুখস্বচ্ছন্দ্যের সন্ধানের সাহায্যে Resurrection এর

আমাদানী বহু লক্ষ টাকা দান—এবং অবশেষে তাদের দুঃখ-দৈন্যে অস্থির হয়ে সমস্ত স্বেচ্ছাশ্রম ছেড়ে গৃহত্যাগী ভিক্ষারীর বেশ গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপার থেকে বুঝা যায় তিনি কৃষকদের কত বড় বন্ধু ছিলেন।

১৯০৮ খৃঃ অব্দে ৮২ বৎসর বয়সে এক ভীষণ শীতের রাতে সমস্ত জগৎ যখন নিস্তব্ধ—বাইরে প্রবল তুষার বৃষ্টি,—শুয়ে শুয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হল এই ভীষণ শীতে কোটা কোটা দীন-দরিদ্র কৃষক বস্ত্রহীন অবস্থায় শীতের প্রকোপে কষ্ট পাচ্ছে আর তিনি কিনা সেই সময়ে আরামে ঘুমাচ্ছেন। সহসা তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠলো : আর সহ্য করতে পারলেন না—দীন-দরিদ্র ভিক্ষারীর বেশে সেই ভীষণ শীতের রাতে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে বেরিয়ে পড়লেন। সেই ভিক্ষারীর বেশে ১৯১০ খৃঃ অব্দে নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন। কৃষকদের দুঃখে তার প্রাণে এত বড় বেদনা অনুভব করেছিলেন বলেই সত্যিকার এক বিরাট সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

টলষ্টয়-প্রমুখ রুশীয় সাহিত্যিকরা কৃষকদের দুরবস্থা ও দুঃখ-দৈন্যকে আদর্শ করে যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রেরণাতেই হয়তো আজ রুশিয়ায় নির্ঘাতিত কৃষক পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে।”

প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক বাংলাসাহিত্য প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন :

“আমাদের দেশের বিশেষতঃ বাঙ্গলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে ইয়ুরোপের বিলাসিতার অন্ধ অনুকরণে। আমাদের সাহিত্যের দ্রুত উন্নতির যত গর্বই আমরা করি না কেন আসলে যে তা সত্যিকার সাহিত্য নয় তা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। স্বদেশপ্রেম ও সাহিত্যের যত গর্বই আমরা করি না কেন তা যে আসলে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ মাত্র তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। আমাদের দেশের বর্তমান স্বদেশ প্রেমিকতা যেমন কতকগুলি সুবিধাবাদী স্বার্থপর ব্যক্তির বিলাস বাসনা পরিতৃপ্ত করবার অবাধ সুবিধা লাভের ভাণ মাত্র, আমাদের সাহিত্যও তেমনি ইয়ুরোপের বিলাসী সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ মাত্র।

যতদিন না আমাদের দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ কৃষকদের জীবনের দুঃখ দৈন্য, অভাব-অভিযোগ নিয়ে সাহিত্যে এই নূতন সুরের সৃষ্টি হবে ততদিন আমাদের প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য আছে বলে গর্ব করবার কোন সঙ্গত অধিকার আছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য বর্তমানে কোন কোন চিন্তাশীল সাহিত্যিকের দৃষ্টি যে এদিকে পড়ে নাই সে কথা বলা চলে না। কিন্তু তাদের সংখ্যা অতি অল্প।

যে দেশের অধিবাসীর শতকরা ৯০ জন কৃষক—যারা দেশের প্রকৃত জাতি—তাদের উপেক্ষা করে জাতীয়তা ফলাতে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। রুশিয়ার তৎকালীন কৃষকদের মতো বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের কৃষকদের জীবন আজ বহুবিধ সমস্যায় পূর্ণ। দুঃখদৈন্য, অভাব-অনটন, জাতি, সমাজ, সামাজিক ও পারিবারিক আচার-বিচার, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজা, জমিদার, মহাজন প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যার-ভারে এদেশের প্রকৃত জাতি—দেশের প্রাণ আজ তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাদের এই জীবন-মরণ সমস্যা ও তার সমাধান যেদিন সাহিত্যের বিষয় বস্তু হবে। সেই দিনই আমাদের প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠবে। তার পূর্বে নয়।”

আসাদ উল্লাহ-র ‘ওমর খাইয়াম ও সেক্সপীয়ার’ (৯:৭, ফাল্গুন ১৩৩৯) সপ্তপাতের একটি প্রথম তুলনামূলক সমালোচনা। খুবই সংক্ষিপ্ত লেখা। একটিমাত্র বিষয় : জীবনের

অনিত্যতা প্রসঙ্গ এখানে বিবেচনাধীন। সংক্ষিপ্ত হলেও প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। আসাদ উল্লাহ লিখেছেন :

“পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্যের অন্তর্নিহিত মৌলিক ভাবধারা তুলনা করলে ইহাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে ‘কবিতার দার্শনিকতা’ সব দেশে ও সব সময়ে একই। সে জন্যই সময়ের ব্যবধান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সেক্সপীয়ার ও ওমর খাইয়ামের দার্শনিকতায় আমরা যে সাদৃশ্য দেখতে পাই, সেটা কোন অগভীর বা আকস্মিক সাদৃশ্য নয় বরং প্রথম শ্রেণীর কবি প্রতিভার আনুষঙ্গিক গভীর ও অলৌকিক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সত্যসিদ্ধ পরিণাম। বাস্তবিকই উভয় কবির তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাবে যে অনেকাংশেই ওমর ও এভনের কবির ভাব ও চিন্তাধারা ঠিক একরূপ অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে একটা মরমী সাদৃশ্য রয়েছে। মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য—এই কেন্দ্রীয় ভাবধারাই উভয় চিন্তানায়ক ও কবিগুরুকে অনুপ্রাণিত করেছে। ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতে মানুষ যেন খেলনা বা মাটির পুতুল, তাঁদের মরজি হলে ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। সেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ বলছে—

‘জীবন চলন্ত ছায়া মাত্র, এর রঙ্গমঞ্চে বেচারী অভিনেতার সকল আফালন সকল অশান্তি সব ক্ষণিকের। তার পর কোথায় তার সাড়াশব্দ—নির্বোধের কাহিনী এ জীবন—কেবল শব্দ ও স্বাক্ষর পূর্ণ।’

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশের প্রথমভাগের সহিত রুবাইয়াৎএর নিম্নলিখিত পদাবলীর সাথে চিন্তাধারায় ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছাড়া কি আর হতে পারে ?

‘—এ দুনিয়ায় ভেতর বা’র উপর নীচ, চারিদিক সবি ভূয়া ; এটা যেন একটা বাক্স, তার ভেতর যাদুর ফান্ যার ভেতর জলে সূর্য্যের বাতি আর যার চারিপাশে আমরা ভৌতিক ছায়ামূর্ত্তি কেবল আনাগোনা করি।’

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উভয় কবিই গভীর নৈরাশ্যের সুরে ব্যক্ত করেছেন—মাটির মানুষ শুধু মাটিই, তা’ছাড়া আর কিছুই নয়। সেক্সপীয়ার বলেছেন—

কোথায় সম্রাট সীজার ? মৃত ও ধূলিসাৎ ! মরণের হাত এড়াতে কে ?’

ঠিক একরূপ ভাবের উক্তি আমরা ওমর খাইয়ামে এত বেশী দেখতে পাই যে যে-কোন অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রুবাইয়াতে আছে—

‘আরে, এ দেহ মাটি হবার আগে নগদ যা পাও তার সদ্যবহার করো। সবি মাটিতে মাটি হবে, ধূলিসাৎ হবে। পান করো, গান গাও’ দিন যে ফুরিয়ে যাবে।

কিন্তু মানুষের সমস্ত দুঃখকষ্ট, শোকতাপ নিবারণের একমাত্র উপায় আছে—সেটা হচ্ছে মদিরা, আঙ্গুর রস।’

টিমন অব এথেন্স দস্যুগণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

‘যাও আঙ্গুরের তরল মদির-খুণ পান করো যতোখণ না তোমার রক্ত উগ্রতায় টগ্বগ্ন করে, তাহলে মৃত্যু হতে রক্ষা পাবে। চিকিৎসক, তাকে বিশ্বাস কেনো ?’

আমরা ওমর ও টিমন অব এথেন্সের মধ্যে একটা বিশেষ সন্ধক দেখি, যখন রুবাইয়াৎ এও আবার সেই কথাই শুনি—

‘এসো, মদিরাপাত্র ভরে নাও। শীতের বসনে ফাল্গুনের আগুন ধরেছে, কোথায় অনুশোচনা?’

ওমরের সঙ্গে তুলনা হতে পারে, কাব্যজগতে একরূপ মাত্র একটি লোকের দেখা পাওয়া যায়—সে হচ্ছে পরম চিন্তাশীল ও চরম মদ্যপায়ী ফলষ্টাফ্। তিনি বলছেন—

‘যদি নগর লুণ্ঠন আর মদ্যপান দোষণীয় হয়, প্রভু দুরাত্মাদের ক্ষমা করো। বার্ককো আনন্দ উপভোগ যদি কুকর্ষ হয়, তাহলে বহু বৃদ্ধের দল যাদের আগি জানি, তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।’

জ্ঞানই উভয় কবির নিত্য নৈমিত্তিক লক্ষ্য : ওমর খাইয়ামের বিখ্যাত চতুষ্পদ শ্লোকে আছে—

‘কেনো এই সব জ্ঞানী ও গুণীর দল দুনিয়া নিয়ে গভীর হয়ে এতো তর্ক-বিতর্ক করছে, তারা তো মূর্খ, দুনিয়াকে তুচ্ছ ভেবে তারাই শেষে মাটির তলে মুখ লুকাচ্ছে।’

এত গেল ভাষা ও বাক্যবিন্যাসে। কিন্তু ভাব ও চিন্তার স্বাভাবিক গতিও সেক্সপীয়ার ও ওমরের অনেকাংশে একরূপ। বস্তুতঃ ওমরের ধারণা যে, এ পৃথিবী একটা পুতলো বাজি এবং এর মধ্যে যা কিছু সুন্দর সবই একদিন শেষ হয়ে যাবে—ঠিক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেক্সপীয়ারের এই লাইনগুলিতে—সোণার যাদু ছেলে মেয়ে তারাও ধূমানালী পরিষ্কারকদের মতো ধূলায় নেমে আসবে।

যদিও সেক্সপীয়ার কেবল মানুষের বৃত্তিসমূহ মনে মনে উপলব্ধি করেন নাই, তিনি মানুষের খাঁটি স্বভাবটাও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন; কিন্তু তবুও এক হিসাবে ওমর খাইয়ামের স্থান সেক্সপীয়ারেরও উপরে। উভয়ে জীবন-রহস্য The problem of life পাঠ করেছিলেন, কিন্তু মানবের সুখদুঃখের ভিতর সেক্সপীয়ার যতদূর প্রবেশ করেছিলেন, ওমর তদপেক্ষা গভীরতর নিমগ্ন হয়েছিলেন। পারস্যের রাজ দরবারে ও এলিজাবেথের পরিষদে চরম পক্ষপাতিত্য বিদ্যমান, পাপ ও পাপী উচ্চাসনে সমাসীন ছিল; আর ‘নীরব সাধনা’ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হ’ত। সম্ভবতঃ সে সময়কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলী উভয় দেশে প্রায় এক রূপ থাকায় উভয়ের জীবনে ও কাব্যরচনায় একরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর সে জন্যই বোধ হয় উভয় কবিই সমস্ত পার্থিব ঘটনাবলীর প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করতেন, কারণ এগুলিকে তাঁরা অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য বলেই মনে করতেন।’

জহিরুল হক লিখেছেন মার্কিন কবি হাইটম্যানের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে। তাঁর প্রবন্ধের নাম ‘হাইটম্যানের চোখে প্রাচ্য’ (২০:৪, বৈশাখ ১৩৪৪)। হাইটম্যানের কবিদৃষ্টির একটি নতুন প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জহিরুল হকের মূল বক্তব্য : ‘হাইটম্যান কেবল আমেরিকার কবিই নন তিনি সমগ্র দুনিয়ারই কবি। তিনি সর্বযুগের কবি। তাঁহার বাণী বিশ্বব্যাপক। কোনও ভৌগোলিক গভীর মধ্যে আবদ্ধ রহিবার বহু উর্দ্ধে ছিল তাঁহার অসামান্য মনীষা। তাই তাঁহার অন্তরের অশ্রান্ত আবেগ মসীর ছন্ধারে অক্ষর হইয়া দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া গেছে।’

ভারত, আরব, পারস্য, মিসর, চীন, তিব্বতের অতীত ইতিহাসে তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি হুইটম্যানের গভীর শ্রদ্ধার মূলে রহিয়াছে এই বিশ্ব-চেতনা। অথওকে আশ্বাদ করিবার বিপুল আগ্রহ।

এ-বিষয়ে হুইটম্যান মনীষী এমার্সনেরই সগোত্র। উভয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিলেন। উভয়েই ছিলেন রহস্য সন্ধানী। এই অতীন্দ্রপ্রিয়তাই ছিল তাঁহাদের বন্ধুত্বের ডোর।***

হুইটম্যান মানবতার কবি, মানুষের সুখদুঃখ হাসিকান্নার একনিষ্ঠ দরদী। মানুষকে তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান এই জগৎটা তাঁহার কাছে তুচ্ছ নয়। তাই বলিয়া এই বস্তু-জগতের মধ্যেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। দৃশ্যকে পাশ্বেয় করিয়াই তিনি অদৃশ্য বিরাটের চির-সন্ধানী ছিলেন।

প্রাচ্য দর্শন বিজ্ঞান ও কাব্য-সাহিত্যে হুইটম্যানের প্রথম পাঠ গুরু হইয়া ছিল এমার্সনেরই লাইব্রেরিতে। সেই খানেই সর্ব প্রথম তিনি পারস্য ও আরব কবিদের ইংরেজিতে অনূদিত কবিতাবলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন। এমার্সনের লাইব্রেরিতে প্রাচ্য সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক সমাদরে স্থান পাইত। তিনি নিজেও পারস্য কবি হাফেজের কাব্য-প্রতিভার স্বরূপ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। দুই বন্ধুই, এমার্সন ও হুইটম্যান হাফেজের বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও সুগভীর অনুভূতির সান্নিধ্য লাভ করিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ধীরে ধীরে হুইটম্যান প্রাচ্যের সাহিত্য-দর্শনের সঙ্গে সুনিবিড় পরিচয় লাভ করিতে লাগিলেন। কল্পনায় তিনি কত নদী, মরু, পর্বত, প্রান্তর পার হইয়া দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া আসিলেন। বিমুগ্ধ হইয়া লিখিয়া চলিলেন :

ঐ যে দেখি তেহরান,
আমার দুটি চোখের সামনে ভেসে উঠছে একে একে
ঐ যে মক্কা, ঐ যে মদিনা।
পার হয়ে যাচ্ছি কত মরু প্রান্তর—
বালুর তরঙ্গে দিগন্তে বিলীন,
তারই মাঝে পথ কেটে চলেছে
দুর্ধর্ম যাযাবর আপন কাজে।
ঐ যে মিসর, তার পিরামিডের হাতছানি দিয়ে ডাকছে
ঐ যে গুনি তার প্রস্তরে প্রস্তরে,
সোপানে সোপানে, খিলানে খিলানে,
যুগযুগান্তের মৃত্যুহীন সঙ্গীতধ্বনি,—
লুকিয়ে আছে কত রাজা,
কত রাজ্য, কত কবি, কত কাব্য,
কত অশ্রান্ত অভিযানের অফুরন্ত বাণী॥

কবির চোখে মিসরের নিদ্রিত অতীত যেন মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি যেন শুনিতেছেন মহাকালের বক্ষে অগণিত পথিকের পদধ্বনি, দেখিতেছেন তাহাদের অক্ষয় পদচিহ্ন এই পরিবর্তনশীল মৃত্তিকার বুকে :

হাজার হাজার বছরের মমি তোমরা
কত শীত কত বসন্ত,
রাষ্ট্র-ভাঙাগড়ার কত শত অভিনয়,—

কতক তাদের রইল, কতক গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে
 বিস্মৃতির অঁথে অতলে—
 তোমরা তবু ঘুমিয়ে আছ, ঘুমিয়ে আছ পাষণতলে—
 রেশমের বিছানায়, কালের স্বপ্নে, অনন্ত শয়নে—
 ওগো মেমফিসের অগণিত নিষ্পন্দ মন্দিরা!

কবি শুধু মিসর নয়, আরব নয়, পারস্য নয়, প্রাচ্যের সর্বত্রই ঘুরিয়া আসিতে চান :

যেখানেই ওঠে প্রভাতে সূর্য্য, রাতে চাঁদ,
 পাখী যায় উড়ে উড়ে বন হ'তে বনে,
 সেখানেই আমি আছি, আমি যাই,
 সে-ই তো আমার চলার পথ, অন্তহীন অব্যাহত!

বিশ্বপথে চলিয়াছে বিশ্ববিমনা কবি। কত দৃশ্য, কত কথা, কত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
 তাঁহার পদে পদে ছন্দে ছন্দে আলোড়িত হইতেছে। 'মিষ্টিক' কবি তনুয় হইয়া যেন ডানা
 মেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন :

হে আমার বন্ধনহীন আত্মা!
 তুমি আমার আমি যে তোমার
 এসো দৌঁছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে
 আর এক প্রান্তে
 আমাদের তীর্থ যাত্রা শেষ করি।
 চল এক বার সেইখানে যাই
 যেখানে হয়েছিল জ্ঞানগরিমার
 প্রথম উদয়,
 যেখানে অনাবিল প্রবৃত্তির নীলা নিকেতন,
 চল মোরা মানবতার সেই জন্মভূমি দেখে আসি,
 সভ্যতার সেই প্রভাত প্রারম্ভ।
 ইয়োরোপ থেকে আফ্রিকা,
 আফ্রিকা থেকে এশিয়া,
 এশিয়া ঘুরে ফিরে আসি
 আবার এই নবাগত আমেরিকায়।

* * *

ঐ যে কুল কুল করে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা,
 নেচে চলেছে সিঁকুনদ,
 দিকে দিকে লোকালয়,
 তীরে তীরে ঐশ্বর্য্যসম্ভার।

* * *

অদূরে ঐ তরঙ্গসঙ্কুল বঙ্গোপসাগর
 দক্ষিণ ব্যাপিয়া কেবল জনধি গজ্জরন
 এক দিকে চীন, অপর দিকে আরব পারস্য!

কত কাব্য, কত ধর্ম
 জাতি উপজাতির মহামিলনের
 বিরাট প্রান্তর।
 বুদ্ধ আছে, বুদ্ধ আছে,
 আরো কত কথা কতই কী-না।
 স্মৃতি পটে আছে আঁকা,—
 দক্ষিণের ভারতের কত রাজা।
 আছে উত্তর খণ্ডের যোগল সাম্রাজ্য,
 —আছে মীনার, মসজীদ, মন্দির, প্রাসাদ।

উপরের অনূদিত অংশগুলি হুইটম্যানের ‘Salut an Monde’ কবিতা হইতে উদ্ধৃত। কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। এই কারণে কোন কোন সমালোচক ইহাকে ‘monotonous poem’ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, প্রাচ্যের বিচিত্র রূপকে ফুটাইতে গিয়া কবি হুইটম্যান অতি সংক্ষেপেই তাঁহার ভাবব্যাকুল মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। হুইটম্যানের প্রতিভাই এতবড় বিষয় বস্তুকে এমন সুন্দর সংক্ষিপ্ত কাব্য রূপ দিতে পারে। এই ‘Salut an Monde’ কবিতার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যে দুর্লভ।”

এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই যে, প্রাচ্যপ্রীতি হুইটম্যানকে ভারতীয় দর্শন বা চীনদেশের অতীত ঐতিহ্যে অন্ধবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি শুধু দেখিয়াছেন, গ্রহণ করিয়াছেন, মানিয়া লইয়াছেন কিনা সে প্রশ্ন উঠে না। বিশ্ব-প্রেমিক কবি চাহিয়াছেন সবার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে,—সবার সঙ্গে এক হইতে, কিন্তু নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলিতে নয়। সমষ্টির সঙ্গে বন্ধু করিয়াও তাঁহার ব্যক্তি ছিল অক্ষুণ্ণ ও স্বয়ং স্বতন্ত্র। এইখানেই হুইটম্যানের জগৎজয়ী প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।”

সওগাতের নবম বর্ষে আনোয়ার হোসেন লিখেছিলেন ‘জাপানী কবিতা’। দীর্ঘদিন পর সওগাতের ২১ বর্ষে তিনি লেখেন ‘জাপানী সাহিত্য’ শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ (২১:১০, ভাদ্র ১৩৪৬)। এখানে প্রাথমিক জাপানী সাহিত্যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখছেন: “পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক সাহিত্য—বিশেষ করিয়া রুশ সাহিত্য যেরূপ সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদের জীবনের ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছে, জাপানী সাহিত্যেও সেরূপ একটা চেষ্টা চলিতেছে। সমাজে যারা ব্যথিত, বঞ্চিত, হতাদর, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা জাপানে জোর শুরু হইয়াছে। সাহিত্যে আভিজাত্যের যুগ আর নাই, নিছক ভাববিলাসিতা, কল্পনা-প্রবণতা, রাজা-রাজড়ার জীবনের কাহিনী, ঐশ্বর্য্য, সমাজের ফেনাইত বৃহদাকারের ছবি এযুগে হয়ত আর চলিতে চায় না। অনেকেই আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে নিঃস্ব, অনাদৃত জনসমাজকে নূতন করিয়াও গড়িয়া তুলিবে। ফলে তাহাদের সাহিত্যও যে গৌরবান্বিত আসন দখল করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? জাপানে সাহিত্যের যে শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ দরিদ্র-দরদী (Proletarian)। জাপানের মজুর এবং কৃষককুল কারখানা বা ফার্মের সাহিত্য-আসরের মারফৎ এত ব্যাপক এবং ব্যাকুল ভাবে এই গরিবের সাহিত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে যে, কেবলমাত্র জার্মানী ছাড়া অন্যান্য দেশ যথা—আমেরিকা, ব্রিটেন বা ফ্রান্সকে জাপান ইতিমধ্যেই পেছনে ফেলিয়াছে। মার্কস এর মতবাদ কিংবা সোভিয়েট রাশিয়ার সম্বন্ধে জার্মানীতে যত বই প্রকাশিত হইয়াছে তার চেয়ে বেশী প্রকাশিত হইয়াছে এই জাপানে। ১৯৩৫ সনে Nippon Proletarian Artists Federation স্থাপিত হয়। পরে এই সমিতির আরও রদবদল হয় Worker and

peasant Artists Federation নামে অন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এদের বহু শাখা-প্রশাখা আছে। স্থূল উদ্দেশ্য প্রায় সকলেরই এক, যদিও কোন কোন বিষয়ে সামান্য মতানৈক্য আছে। চকু টকুনাগা, টকিজীকায়াশী প্রভৃতি লেখকগণ Nape পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রকাশিত অনেক বই আছে। মিস্ ইউরিকো চুজো (Yuriko Chugo) একজন শক্তিশালী লেখিকা। সম্প্রতি তিনি সোভিয়েট রাশিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রাশিয়া সম্বন্ধে তিনি খুব সহজ, সঠিক এবং দৃঢ়ভাবে নানারূপ গল্প লিখিয়া থাকেন। চকু টকুনাগার লিখিত The street without the sun পুস্তকখানা Die Strasse ohne sone নাম দিয়া জার্মান ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। টামিকি হসোতা লিখিত Spring of the truth পুস্তক খানা ধনিক সম্প্রদায়ের কাণ্ডকারখানার এক অতি উপাদেয় এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। সম্প্রতি প্রলেটেরিয়ান লেখকগণ কৃষকসমাজ এবং ধর্মবিরোধী আন্দোলনকে বিষয় বস্তু করিয়া সাহিত্য রচনা করিতেছেন।

প্রলেটেরিয়ান দলের বাহিরে যাঁহারা সাহিত্য সাধনা করিতেছেন তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে যথা : (১) স্বববাদী (২) আদর্শবাদী—মাটির সংসার ও বাস্তব জীবনধারা হইতে যাঁরা দূরে সরিয়া থাকিতে চান। Before the break of day নামক বহিখানি টসন সিমাজিকি প্রাচীন জাপানীর জীবন দিয়া লিখিয়াছেন। জুনিকিরো টানি জাকী Afylfof নামক এক খানা বহি লিখিয়াছেন। অস্বাভাবিক যৌনবোধ সম্পন্ন মানব ও মানবীর জীবন-লীলা ইহার বিষয় বস্তু। ইহা ছাড়া A Cafe Girl, The brothers Aujs, Tramps of the street ইত্যাদি পুস্তক সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবনধারার বাস্তব ছবি। ইউরিন ভোজী, টয়োহিকো কুনু, মাসাটসুনে নাকামোরা শেষোক্ত শ্রেণীর লেখক—ইঁহারা প্রধানতঃ ‘Art for art’s sake’ মতাবলম্বী লেখক। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রূপ মেজাজের উপর অতিরিক্ত জোর দিতে গিয়া ইঁহারা বাস্তব জীবনের অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। বর্তমান যুগে সাংবাদিক সাহিত্যের দিকে জাপানী লেখক ও পাঠকদের খুব ঝোঁক দেখা যায়। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত গল্পের খুব আদর; কারণ ‘Truth is stranger than fiction’। গত ১৯২৩ সনের ভূমিকম্পের পর হইতে জাপানে জনপ্রিয় সাহিত্য নামক এক শ্রেণীর সাহিত্য খুব প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহা আমোদ-জনক এবং তরল সাহিত্য। ইতিহাসের গল্পের উপর কল্পনার রং ফলাইয়া খুব সহজ ও লোকপ্রিয় ভাষায় এই সাহিত্য রচনা করা হয়। আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে মিল রাখিয়া একদল লেখক এবং অন্যদল এই ভাবধারার প্রতি সামান্যই দৃষ্টি দেন। এই দলের মধ্যে নাওকী, হাসেগাওয়া প্রভৃতি লেখকগণ খুব নামজাদা।

চন্দ্রমল্লিকা, চেরীর দেশ জাপান। সৌন্দর্যের ঢেউ উঠিয়াছে চারিদিকে। জাপানী মন স্বতঃই কবিতানুরাগী। জাপানীরা অনেকেই কবিতা লেখে ও ছবি আঁকে। তাঁহাদের কবিতায় ছন্দের ঝঙ্কার, ছন্দের নৃত্য, ষ্টাইলের বাহাদুরী নাই—আছে ইচ্ছিত। দু’এক কথায়, নিতান্ত সহজ ও সোজাভাবে অতি সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দেখা যায় এই সব কবিতায় যথা:

ব্যাঙ নড়ে
পাতা ঝরে

অথবা

পচা পুকুর
ব্যাঙের লাফ

বাস্! হইয়া গেল কবিতা। কবিতা নয়, যেন ছবির মধ্যে তুলির আঁচড়। এই সব কবিতা চোখ দিয়া পড়িতে হয় না, মন দিয়া পড়িতে হয়। কতকগুলি অক্ষর পাশাপাশি

সাজাইলেই জাপানী কবিতা হয়। জাপানের শ্রেষ্ঠ কবি য়োনে নগোচি। তিনি দুই তিন বৎসর পূর্বে ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া ছিলেন। আমেরিকার কবি মিলারের সংস্পর্শে আসিয়া কবি নগোচি প্রথম ইংরেজী শিখেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক Seen Unseen আমেরিকাবাসীগণকে তাক লাগাইয়া দেয়।

মজহারুদ্দীন ভূঁইয়ার ‘মহাকবি মালিক মোহাম্মদ জায়সী’ (২২:১১, আশ্বিন, ১৩৪৭) জায়সী প্রতিভার পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধের শুরুতে মজহারুদ্দীন ভূঁইয়া লিখেছেন:

“মহাকবি মোহাম্মদ জায়সী একাধারে কবি এবং সাধক—তাই তিনি গুরু বা পীর নামের অধিকারী। এঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ছিল না, সকল অংকুশ ছিন্ন ক’রে সব অলীক উপাধি নিরসন ক’রে তাঁর সম্মুখে বিরাজিত ছিল মানুষের সত্য রূপ—ভিতরের রূপ। আপনার যে-মহা অধিকার হতে বঞ্চিত হ’য়ে মানুষ দীনদুঃখীর মতো, অপাংক্তেয় অভাজনের মতো ধুরে বেড়াচ্ছে, সে অধিকারের মণিনুকুট ললাটে প্রতিষ্ঠিত ক’রে দিয়ে মানুষকে তিনি সম্রাট ক’রে দিয়েছেন।

এই ভক্ত-কবির নাম মোহাম্মদ জায়সী। ‘মালিক’ তাঁর ঋন্দানী খেতাব। তাঁর গানগুলির মধ্যে এমন একটা গভীরতা অথচ প্রত্যক্ষ উপলক্ষের ভাব আছে যে, তাতে মোহিত হতে হয়।

বেদান্ত বা সাধনশাস্ত্র আর মারেকৎ বারবার ‘সর্বধর্ম’ ত্যাগ ক’রে একমাত্র পরব্রহ্মকে আশ্রয় করতে উপদেশ দিয়েছে। এখানে ‘সর্বধর্ম’ অর্থে আমি প্রত্যেক ধর্মের আচার-পদ্ধতিকেই বুঝিয়েছি। পরব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত হয়ে দেখলে তবে সব আচারের সব অনুষ্ঠানের মাধুর্য অনুভূত হয়। সংস্কার বাইরের খোলস; অতএব তা পরধর্ম। এই পরধর্ম ত্যাগ ক’রে স্বধর্ম গ্রহণ করতেই হবে। পরমাত্মাকে আশ্রয় করাই স্বধর্ম। পরমাত্মার চাইতে ‘স্ব’ আর কী হতে পারে?

অবশ্য বাইরে হতে দেখারও একটা বিপদ আছে। সেটি শ্রদ্ধার অভাব। শ্রদ্ধার অভাব যদি থাকে, তবে সে ধর্মের মধ্যে বিচিছু ক্রিয়া-কর্ম-আচার-অনুষ্ঠানরাজিকেই দেখে। এই সকলগুলোর সবটা নিয়ে যে একটি গভীরতা আছে, তা সে বুঝতেই পারে না। সে ক্ষমতা ছিল—ব্রাউনিং, সাদি, হুইটম্যান, কবির, তুলসীদাস, রুমী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, হাফেজ, গায়টে, মনসুর হাল্লাজ, বিদ্যাপতি, জয়দেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এহদী কবি সলোমন গ্যারিবল ইত্যাদি বিভিন্নধর্মী কবি ও সাধকদের মধ্যে; এবং আমাদের নিকটতর ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন বাঙালীর। এক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও অন্যজন মরমী কবি হাসান রাজা।

আলোচ্য কবি মোহাম্মদ জায়সীর সে ক্ষমতা ছিল। মনে হয় এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করেই কবি বলেছেন:

‘ভঁওর আঈ বন্খণ্ড সঁউ
লেই কওল রস বাস।
দাদুর বাস ন পাওঈ
ভলহি জো আছহি পাস ॥’

তরজমা :—বনভূমি হতে এল যে ভোমরা, সে পেল কমল-রসের খোশবু। দিবা কাছে যে বিরাজমান ভেক্ সে ত গন্ধ টুকুও পেলনা।

হিন্দী সাহিত্যে মালিক মোহাম্মদ জায়সী এক আকাশ-ফাঁসা প্রতিভা-সূর্য্য। সুপ্রসিদ্ধ ‘পদুমাবতী’ তাঁর অতুলনীয় কীর্তিকাব্য। ভাষাতত্ত্ববিদ সাহিত্যিক পণ্ডিতপ্রবর স্যার গ্রীয়ার্সন বলেন—‘একে ত’ গ্রন্থখানি কাব্য হিসাবে অতিশয় চমৎকার। তার পর ভারতের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এমন মৌলিক গ্রন্থ কচিৎ দু’চারখানি মাত্র আছে। যার নায়ক রাম বা কৃষ্ণ নহেন, তার মধ্যে এই একখানি।’

‘পদুমাবতী’ আদ্যন্ত উদার ভাবে অনুপ্রাণিত—সে উদারতাও এমন উচ্চাঙ্গের যে, তা শুধু অধ্যাত্মবাদীদের কাছেই আশা করা যায়। তাঁর অধ্যাত্ম-দৃষ্টি ও সংগীত ধর্মের মর্ম স্থলে গিয়ে পৌঁচোচ্ছে। বিলাতের ‘ন্যাশন’ পত্রিকা তার কাব্য সম্বন্ধে গ্রীয়ার্সনের অনুবাদ প’ড়ে বলেছেন—সাক্ষাৎ-ব্রহ্ম-অনুভূতি-জ্ঞাত কবিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। এ শ্রেণীর কবিতাকারীদের মধ্যে সাধক কবি জায়সীর আসন আছে। ‘পদুমাবতী’র আখ্যাত বিষয় পরে নানা কবির কাব্যে স্থান পেয়েছে। আজ পর্যন্ত এই হিন্দী কাব্যটি ইংরেজী, বাঙলা, ফারসী, উরদু, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হ’য়েছে। পারস্য-কবি হোসেন গজগভী ‘কেসসায়েরপদুমাবতী’ এবং ১৬৫২ খৃঃএ মোলভী রায় গোবিন্দ ফারসী ভাষায় ‘তুখ্‌ফাতুল কুলুব’ নামে এই কাব্যের তরজমা করেন; মীর জিয়াউদ্দীন ও গোলাম আলী এই পণ্ডিতদ্বয়ের যৌথহস্তে ‘পদুমাবতীর’ এক উরদু অনুবাদ প্রকাশিত হয়; আমাদের বাঙালী মহাকবি আলাওল সাহেবের ‘পদুমাবতী’ কাব্যও ‘পদুমাবতীর’ই অনুবাদ। মোহাম্মদ জায়সীর কাব্যখানি ১৫৪০ খৃঃএ রচিত।

হিন্দী সাহিত্যে যে কয়টি সৃষ্টি-ধর্মী প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে, তন্মধ্যে মালিক মোহাম্মদ জায়সী, তুলসীদাস গোস্বামী ও সুরদাসের আসন শিরোভাগে। হিন্দী ভাষাতে যথার্থ উৎকৃষ্ট কাব্য ‘পদুমাবতী’র পূর্বে আর রচিত হয়নি। তুলসীদাস ও সুরদাস ইহারা আকবরী আমলের লোক, কিন্তু জায়সী শের শাহের সমসাময়িক। বিদ্যাপতিকেরও হিন্দী কবি ব’লে ধরা হয় এবং তিনি ১৪০০ খৃঃএ জীবিত ছিলেন। কিন্তু গোটাকতক গান ছাড়া ত’ তাঁর কিছু আমরা পাইনি। সে গানও মুখে মুখে চ’লে আসছে। কাজেই তাদের আকার ঠিক অবিকৃত নেই। কিন্তু সাধক কবি জায়সীর হিন্দু মুসলমান বহু মুরীদ ছিল—পীরের বাণী ব’লে শিষ্যগণ পরম-যত্নে বিগুহ্ন ভাবে সে সব রক্ষা করেছেন। অতএব এঁর কাছে সেকালের সাবেকী হিন্দীর নিখুঁৎ নমুনা পাই।...”

মহবুবুর রহমান খাঁ-র ‘মরিস মোটারলিঙ্ক’ (২৪:১০, ভাদ্র, ১৩৪৯) নাট্যকার মোটারলিঙ্কের সাহিত্য প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধের উপসংহারে প্রবন্ধকার লিখেছেন :

“সাহিত্যিক হিসেবে মোটারলিঙ্কের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি নাটক-লেখার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করেন। ইবসেন ও মোটারলিঙ্ক, — এই দুই প্রসিদ্ধ নাট্যকারই ছিলেন interior dialogue-এর পক্ষপাতী।

বইয়ের ভিতর দিয়েই তিনি সমাজ-সংস্কারক। প্রথমে নিয়তির হাতে মানুষের অবস্থা দেখিয়ে আমাদের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করেছিলেন, তারপর আশার আলো-ও দেখালেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবে তিনি টলষ্টয় ও নিটসের মধ্যবর্তী। টলষ্টয়ের মতো বর্তমান ভেঙ্গে দিয়ে স্বদূর অতীতকে জাগিয়ে তোলা কিম্বা নিটসের মতো বর্তমান সমাজকে ভেঙ্গে চুরমার করে ভবিষ্যতের অলীক আদর্শে মানুষকে প্রলোভিত করা তাঁর অভিপ্রেত নয়। তিনি তাঁর লেখার সর্বত্রই মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন ক’রেছেন। সমাজে সকলের যে সমান অধিকার এ-মতবাদও তিনি প্রচার করেন। নির্গম দয়াহীন ধনীকে এক জায়গায়

বিক্রপ ক'রে তিনি ব'লেছেন—Need we at the sight of unmerited wretchedness, look to the skyes for a reason, as though a flash of lightning had caused it? শুধু মাত্র সমাজের দোষ দেখিয়ে তিনি ক্ষান্ত হন নি, মানুষের নিজের হাতে যে টুকু প্রতিফলিত হয়েছে, সে-পথও তিনি নির্দেশ করে দিয়েছেন, এবং এ-কারণে আদর্শ-বিশ্বাসী ও আদর্শবাদী হওয়া সত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের এতো প্রিয় হ'তে পেরেছেন।”

মুস্তাফিজুর রহমানের ‘দাগে-র কাব্যালোচনা’ (২৫:৫, চৈত্র ১৩৪৯) একটি অতিক্রম বেতার কথিকা (ঐ, পৃ. ২১৬, পা. টী. দ্রষ্টব্য)। ওরুতে দীইওয়াজে দাগের একটি কবিতার উদ্ধৃতি ও তার ব্যাখ্যা লিখে প্রাবন্ধিক দাগ প্রসঙ্গে লিখেছেন: “দাগ ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকের কবি; মীর্জাখান তাঁর প্রকৃত নাম, দাগ তাঁর ছদ্মনাম। ইনি ছিলেন লোহার টেটের নওয়াবজাদা। ঐশ্বর্য্য, সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত। ইঁহার শৈশব কেটেছে দিল্লীর লালকীলার মীর্জা ফকরুর সহিত, সেখানেই ইনি কাব্য—প্রেরণা লাভ করেন, যৌবন ও শেষ বয়সে ছিলেন রামপুর ও হায়দরাবাদে।

স্বীকৃতি ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে দাগকে ভাগ্যবান বলা যেতে পারে অনায়াসে, সহজ ও সাবলীল শব্দবিন্যাস, এবং ব্যঙ্গ দাগের কাব্য-বৈশিষ্ট্য। অনাবশ্যক সংযুক্ত ও দুর্বোধ্য শব্দের বেড়াজালে উর্দু সাহিত্যের উন্নতির পথ ছিল রুদ্ধ; সবার আগে তিনি সহজ ও সরল শব্দে কাব্য-রচনা করে উর্দু সাহিত্যকে মুক্তি দিলেন। সরল শব্দ-বিন্যাস ও স্বাভাবিক চিন্তাধারার সংমিশ্রণে অবশ্য তাঁর কাব্য জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছে অনায়াসে, কিন্তু চিন্তাধারার দিক দিয়ে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর উর্দু কবিদের সঙ্গে স্থান দেওয়া যেতে পারে কিনা তাতে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দাগের সমস্ত কাব্য খুঁজে কোথাও উচ্চ চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, শুধু মিলনের আনন্দ আর বিচ্ছেদের বিষাদেই তাঁর কাব্য পরিপূর্ণ। এখানে উল্লিখিত তাঁর কয় লাইন কবিতায়ও তিনি শুধু বিচ্ছেদের ব্যাথা আর মিলনের আনন্দই প্রকাশ করেছেন, শুধু মিলন আর বিচ্ছেদের কাহিনী চিন্তাশীল পাঠকদের নিকট একঘেয়ে বোধ হলেও সাধারণ পাঠক শ্রেণী কিন্তু দাগের কাব্যকেই স্নেহের চক্ষে দেখেছেন।

দাগের উপমা-সমূহ সুন্দর ও প্রাকৃতিক। এখানে আলোচ্য তাঁর কবিতার প্রথম লাইনে তিনি স্বীয় প্রেম-দগ্ধ দেহকে ফোঙ্কার সহিত তুলনা দিয়েছেন। ফোঙ্কার সারাটি দেহ যেমন দগ্ধীভূত; তাঁর প্রেমদগ্ধ দেহও তেমনি, আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন; এক এক বিন্দু অশ্রু তাঁর তীর হয়ে হৃদয়ে আঘাত হানছে। ***মোটের উপর সরল শব্দবিন্যাস; স্বাভাবিক চিন্তাধারা ও প্রাকৃতিক উপমাই তার কাব্যের সৌন্দর্য্য।

‘আফতাবে দাগ’, ‘মাহতাবে দাগ’, ‘গুলজারে দাগ’ আর ‘ফরইয়াদে দাগ’ তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য। ‘দীইওয়ানে দাগ’ তাঁর কাব্যের চয়নিকা। তিনি প্রেমের গানই গেয়েছেন অনেক করে, তিনি ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন, অনায়াসে তাঁকে সে যুগের ছান্দসিক কবি বলা যেতে পারে।

ইকবাল তাঁর কাব্যশিষ্য। চিঠি পত্রেই ইকবাল তাঁর দ্বারা স্বীয় কবিতা সংশোধন করিয়ে নিতেন, সমালোচকদের মতে দাগের কাব্য দর্শনহীন হ'লেও তাঁরই বিরাট প্রতিভায় অনুপ্রাণিত ইকবালের নাম আজ বিশ্বের দরবারে স্থায়ী আসন পেয়েছে।”

‘প্রাচীন রাশিয়ান সাহিত্য’ (২৫:১২, কাতিক ১৩৫০) জহিরুল হক রচিত একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ। ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রাচীন রুশ সাহিত্য আলোচনা করে লেখক মন্তব্য করেছেন যে সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় ঐ রুশ সাহিত্য পশ্চাৎপদ ছিল।

চৌধুরী নজরুল ইসলামের 'গোবী' (২৬:২, পৌষ ১৩৫০) ঐ ঔপন্যাসিক সম্পর্কে সওগাতের প্রথম প্রবন্ধ। গোবী-প্রতিভা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লিখেছেন:

“রাশিয়ার জনসাধারণ টলষ্টয়ের পরে গোবীকেই তাঁদের আত্মিক অপরিণতি ও উৎপীড়িত জীবনের প্রতি বিতুষ্ট প্রকাশের জন্য মধ্যস্থ মেনে নিয়েছে। গোবীর চিত্রে জনসাধারণ দেখতে পেয়েছে উৎপীড়িত মানবসমাজের জন্য একটা সমবেদনার ছাপ। নির্যাতিত ও নিপীড়িতের জন্য একরকমের দরদ, জীবনের নিষ্ঠুর পাশবিক দিকটার তীব্র সমালোচনা, সব রকমের দাস মনোভাবের প্রতি বিতুষ্ট গোবীর লেখায় এমন সতেজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, রাশিয়ানরা স্বভাবতঃই গোবীকে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চালক বলে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করেনি; গোবী তাদের জীবনে যে সাড়া ও সংস্থিতি এনে দিয়েছেন তা স্বচক্ষে না দেখলে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করা চলে না।***”

প্রবন্ধের শেষাংশে লেখক গোবী ও শরৎচন্দ্রের তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষায়:

“গোবীর লেখার সার্বজনীন পরিব্যাপ্তি অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাঁর লেখায় নীপোলিটান কুশ্রী দৃশ্য বা টেজ্‌য়েসা নাটকীয় দৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। দুই একটা রোমাণ্টিক গল্পে আতিশয্য দোষ দেখা যায়—যেমন ‘Maker Chadre’—কিন্তু সেও অতি সামান্য। আটটি হিসেবে গোবীর পরিচয় দেওয়া কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। কঠিন এই কারণে যে তাঁর অধিকাংশ লেখাই বর্ণনামূলক (narrative), বোধকরি তাঁরই জীবনের এক একটা খণ্ডাংশ। তাঁর লেখা আমাদের শরৎচন্দ্রের লেখার মতো নিজস্বতা ও সার্বজনীনতার সমন্বয়ে সমুজ্জল। তাঁর বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে, সত্য ও তেজের দীপ্তি আছে। শরৎচন্দ্র ও গোবীর প্রতিভার অনেক মিল আছে। নির্যাতিত ও নিপীড়িতের বেদনা গোবীও বুঝেছিলেন, শরৎচন্দ্রও বুঝেছিলেন। ভাষা ও প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য ও সত্যপ্রকাশের সহজভঙ্গী গোবী ও শরৎচন্দ্র উভয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। নারীকে তার আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে গোবী ও শরৎচন্দ্র উভয়েই অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছেন। শরৎচন্দ্রের লেখায় বাঙ্গালীস্বলভ একটা কমণীয়তার ছাপ স্পষ্ট—গোবীর লেখায় তুসার দেশের রুক্ষতার ছাপ দেখা যায়।”

মুনীর চৌধুরীর প্রবন্ধের নাম ‘আধুনিক উর্দু কবিতা’ (২৬:৫, চৈত্র ১৩৫০) হলেও তা মূলতঃ মেহেদী আলী খাঁ ও তাঁর কবিতাবিষয়ক আলোচনা। মেহেদী আলী খাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য আপাতঃ সারল্যের আড়ালে তীব্র তীক্ষ্ণ বিজ্ঞপ। মুনীর চৌধুরীর সাবলীল বিশেষণ সমৃদ্ধ গদ্যে মেহেদী আলীর এই বিশিষ্ট কবিস্বভাব সুন্দর রূপায়িত হয়েছে; সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে মেহেদী আলীর পাশে বসে তরুণ আরো কিছু কবি সাহিত্যিকের মুখ। মুনীর চৌধুরীর প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল:

“বৈচিত্র্য সন্ধানী আধুনিক উর্দু কবিদের মধ্যে রাজা মেহেদে আলী খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গদ্য কবিতায় আচমকা এসে ইনি এমন কতগুলো অভিনব এবং অদ্ভুত বাঁক দিয়ে গেছেন যে, সেটা সমালোচক-মহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা দৃঢ়, সুস্পষ্ট ছাপ এঁকে দিয়েছে।

ব্যঙ্গ রসের পরিবেশনেই যেন এঁর কবিতার প্রধান লক্ষ্য। তবে পন্থাটা একটু আলাদা ধরণের। মানুষের খুব দুর্বল তত্ত্বীতে ইনি আঘাত দেবেন, খুব আস্তে, খুব ধীরে। সে স্পর্শ এত নোলায়েম ভাবে এসে আঘাত করে যে, তখন সেটা ‘satire’ এর সুক্ষ্ম পীড়াদায়ক

অনুভূতির বদলে জাগিয়ে তুলে একটা প্রাণ-মাতানো সরল হাস্যধ্বনি। সাধারণতঃ রসিকতা জিনিষটা যার ওপর করা হয়, তাকে একটু কষ্ট স্বীকার করতেই হয়,—রসটা স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম তার বাচবিচার না করেই। আর যারা দর্শক হয় : তারা উপভোগ করে আনন্দ, চোখে-মুখে প্রকাশ করে অন্তর-উৎফুল্লতার শারীরিক উচ্ছ্বাস। মেহদে আলী খাঁর কবিতার কথাগুলো এমন একটা শিশু-সুলভ সরল যে, কবিতার মাঝে কোন রূপপ্রকৃতির ছোঁয়াচ থাকলেও তার গাভীর স্বীকার করতে মন চায় না। কবিতার শব্দের মাঝখানে যেন শিশু-ভাবকের মিটিমিটি চাউনি উঁকি দেয়! ফলে কবিতা পড়ার পরবর্তিকালে যে পরিস্থিতির উদ্ভেক হয় সেটা বিস্ময়কর—কমান্দ্রের তৃপ্তির। যাদের লক্ষ্য করে কবিতার বিক্রপ তাদেরও এই মনোভাব, আর যারা হাততালির দর্শক তাদেরও।

‘নাগীর মেয়ের দোয়া’ কবিতায় বলছেন :

ও আল্লাহ! আজ এ-নিমন্ত্রণ অরণ্যে
যখন কেউ কোন দিকে নেই,
তখন তুমি আমায় দর্শন দাও,
দর্শন দাও!
যদি না দাও
তবে এ জেনো
ছোট্ট একটি মেয়ে,
তোমার ওপর রাগ করবে...’’

‘ছোট্ট এইটি মেয়ে’ দু’হাত ওপরে তুলে ঐকান্তিক নিবিড় স্বরে মোনাজাত করছে—
ছবিটা যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এই কবিতায় শিশুর যুক্তিহীন মনের ক্ষুধা
দেখে, একাগ্র চিন্তের নালিশ শুনে—সমস্ত মন ভরে জেগে উঠে উপচে-ওঠা হাসির
জোয়ার। সঙ্কীর্ণ সব বাঁধন টুটে বেরিয়ে আসে কমান্দ্রের স্ফুটি।

মেহদে আলী খাঁ তও মৌলভীদের বিক্রপ করতে ভীষণ ভালবাসেন। সেই সব বক-
বামিকদের নিয়ে এঁর কবিতা, যারা দিনের আলোয় সদাসর্বদা বিশ্বসৃষ্টির নামে গদ্‌ গদ্‌
চিত্ত আর লোকচক্ষুর অন্তরালে আঁধার ঘনিয়ে এলেই মুখোস খুলে স্ব স্ব পাপ চেহারায়
আত্মপ্রকাশ করেন। এই শ্রেণীর লোক এত হীনভাবে ভীরা যে, নিঃসঙ্কোচে পাপ করতে
ভয় পায়।

একটা কল্পিত তুলনামূলক দৃশ্যের সৃষ্টি করে আশ্চর্যজনক ভাবে এই ভাবটাকেই
প্রাণ দিয়েছেন, মেহদে আলী খাঁ—

খটু খটু খটু।
মৌলানা,
একটিবার খুলে দাওনা
জান্নাতের এ দ্বার।
রাত হয়েছে অনেক
কেউ এখন দেখছেন
মৌলানা,
একটিবার খুলে দাও না
জান্নাতের এ দ্বার!...’’

খটু খটু খটু।
 এত রাতে
 চুপে চুপে। মৌলানা,
 এসেছি টিপে দিতে
 তোমার পা,
 মৌলানা, একটিবার খুলে দাওনা
 জান্নাতের এ দ্বার!

অস্বাভাবিক এক দৃশ্যের সৃষ্টি, বলবার ভঙ্গী হাস্যকর! তবু ভাষার সাবলীল গতির পেছনে থেকে থেকে বিকমিক্ করে উঠছে স্মৃতিস্রব ব্যঙ্গচ্ছটা। জান্নাত, সয়তান ইত্যাদি অতি গম্ভীর কাব্য সামগ্রীর পাশেই কবির স্বাভাবিক রসিক-মনপ্রসূত হালকা ঠাট্টার স্রবট satire এর প্রকৃত সুক্ষ্মকলাকে ক্ষুণ্ণ করলেও তার গতিকে মন্থর করেনি।

এমনিতরো দৃশ্য আঁকতে তিনি সিদ্ধহস্ত। একাঙ্কিকা নাটকে যেমন সম্রাট অষ্টম হেনরী এবং রাজ্ঞী ক্যাথরিনের শান-সওকত-প্রবেশ ঘটিয়ে আপনি যদি তারপর অবতারণা করেন একটা সামান্য পারিবারিক ডিম সেক্স নিয়ে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর তুমুল ঝগড়ার দৃশ্য, তবে সেটা যেমন চূড়ান্ত হাস্যরসের খোরাক যোগাবে, ঠিক তেমনি বিপন্নিত মুখে দুটো কল্পনা রেখার আকস্মিক সংঘাত ঘটিয়ে মেহদে আলী খাঁ গড়ে তোলেন তাঁর কবিতার ব্যঙ্গ-রস। অঘটনীয়, অকল্পনীয় কতগুলো ঘটনা তিনি তাঁর নাছোড়বান্দা কণ্ঠস্বরে এমন করে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলবেন যে, তখন ব্যাপারটার বাস্তবতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠার আগেই মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে রস পান করতে।

কল্পনার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই ‘আমি’ ব্যবহারের বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতার নাম—‘কেয়ামতে হটরোল’। আরম্ভতেই লঘু-ওরু রসের প্রকাশ। তারপর :

প্রায় দশদিন শায়িত আমি বিছানায়,
 কেয়ামত এসে গেছে।
 ইশ্রাফিল জোরে, আরো জোরে
 সীঁদা ফুকছে।
 মৃতদেহগুলো আরেকবার
 দাঁড়ায় দু’পায়ে,
 তারপর যে যেরদিকে পারে
 লম্বা দেয়—ভাগে দূরে!
 আমি আমার ময়লা
 ছেঁড়া-ফাঁটা লেপ সরিয়ে
 এক চক্ষু বার করি,
 আর বলি :
 ‘আরে এই! এত চ্যাচাচ্ছিল কেন?’
 তারপরই আবার নিদ্রা!...

নিছক একটা প্রলাপের মতো, বিকারগ্রস্ত মনের বিকৃত স্বীকারোক্তির মতো। তবুও প্রথমে ভদ্রলোকের দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে বাই। তারপর তল্লীগুলো একটু নিস্তেজ হয়ে আসতেই কেমন একটা অস্বস্তিময় নিলিপ্ত অবজ্ঞার হাসি জেগে উঠতে চায় ঠোঁটের কোণায়। এ যেন একটা হিংস্র নখর হাত খামচে দেবে বলে এগোতে থাকে আপনার দিকে, তারপর কাছে এসে হঠাৎ আপনার ভয়-শিহরিত দেহে দিয়ে বসে স্খু কাতুকুতু।

অত্যন্ত সহজকণ্ঠে তিনি তার এক বৈকালিক ভ্রমণের অতি সাধারণ ঘটনার কথা বলছেন :

আমি আর শয়তান
সেদিন সন্ধ্যা বেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে
বেহেশতের দেয়ালের ওপর চড়ে বসে
চেয়েছিলাম এক দৃষ্টিতে
বেহেশতের পানে।
দেখি,
শুভ্র দুধের একটা শীর্ণা ঝর্ণা বইছে
মৃদু বাতাসের সাথে তাল রেখে।
তার পাশে—মস্ত বড়ো একটা
হজমী-গাছের নীচে
বিশাল একটা হালুয়ার ঢিপির ওপর বসে
এক মোলানা
(দাড়ি তার বাতাসে দুলছে) —
ঝিমুচ্ছেন।

কবিতাটার নাম দিয়েছেন : 'বেহেশতে উঁকি'।

২

বোধ হয় বছর দুই আগে যখন মেহদে আলী খাঁ সবে মাত্র এই ধরনের অদ্ভুত কবিতা দু-একটা করে রচনা করতে শুরু করেছেন তখন তাঁরও সন্দেহ হয়েছিল, সত্যিই কি সমালোচকরা তাঁর কবিতাকে সহ্য করবেন?

ভয়ে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে একটা ছদ্মনাম নিলেন, 'মুসাফের'। কোন রকমে সাহস করে 'গুণ্ডা' নামে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিলেন উর্দু আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম মাসিক 'আদবে দুনিয়া'র কাছে।

খ্যাতনামা সমালোচক-কবি 'মীরাজী' তখন সম্পাদক। সাহিত্যক্ষেত্রে পাকা জহরী বলে এঁর নাম আছে। উদীয়মান তরুণ লেখকদের মাঝ থেকে প্রতিভাবান শিল্পীদের খুঁজে বের করাই এঁর প্রধান বিশেষত্ব। তাঁর লেখার মাঝ দিয়ে সম্পাদনার সাহায্যে এই তরুণদেরই তিনি দিতেন সব চেয়ে বেশী উৎসাহ। মেহদে আলীর কবিতাটা সাগ্রহে 'মীরাজী' লুফে নিলেন। কবিতাটা প্রকাশ হলে একটা ভয়ংকর হলুস্থূল সৃষ্টি করে।

দিন মজুরের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাওয়া যায় এই 'গুণ্ডা'য় :

আরে আরে ইয়ার,
চেহারাটাকে বাগিয়ে ধরে
দেখনা চেয়ে একবার।
আসছে কে ঐ রাস্তা ধরে?
সেই নারী, ল্যাংরা শেঠের সেই জ্বলন্ত
আসতো-যে রোজ এ রাস্তা ধরে
দিনে দুবার।
আরে ইয়ার, ফেলে দে আজ তাস।...

একবার চেয়ে দেখ
তার কালো আঁখির চঞ্চলতা।***
তার সাড়ীর বাহার!***

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রকাশভঙ্গীতে গুরুচির পরিচয় কোথা? কিন্তু আমরা বলি, রুচিই কি সব? প্রকাশভঙ্গীই কাব্যের সব কিছু? কিন্তু বাস্তবতাকে কি করে অস্বীকার করা চলে? বস্তুত মনে হয়, কবির বলবার এই বিশেষভঙ্গীই শুধু এই কবিতাটাকে দিয়েছে একটা পূর্ণাঙ্গরূপ। না-রং-দেয়া কাঁচা ছবিটা ঐ ভাষার জোরেই নানা রঙ্গের নিখুঁত সমাবেশে চোখের সামনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে চায়। আমরা যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, গ্যাস পোষ্টের সম্পাদককে গুটি চার-পাঁচেক কুলীশ্রেনীর লোক নগ্ন দেহে নোংরাধুতি জড়িয়ে অর্ধ উরু উলঙ্গ করে তাস খেলছিল। ছিন্তা মলিন তাস সাজোরে ভেঁজে কুঁজো হয়ে যেই একাগ্র মনে খেলতে যাবে, ঠিক তেমনি সময় একটু দূরে দেখা দিল একটি নিঃসঙ্গ সুন্দরী তনুী। সেই নিস্তরঙ্গ মুহূর্তে সৌন্দর্য্য দর্শনে যে বিচিত্র অনুভূতি এই মজুরশ্রেনীর লোকদের মনেও মোচড় দিয়ে উঠেছিল, সেই বিক্ষুব্ধ শব্দ তরঙ্গে তা মুখর হয়ে উঠলো একজনের কথার ভেতর দিয়ে, অন্য সবার মুখ আবেগ নিস্তরঙ্গ আঁধারে যেন মূর্ত্য-হয়ে উঠলো প্রতিটা অক্ষরে। মেহদে আলী খাঁ শুধু আমার কবি নন, আপনার কবি নন, মেহদে আলী খাঁ রুদ্র ন্যায়ের জ্যোতি, কুৎসিৎ বাস্তবের নগ্নরূপ, প্রগতিশীল যুগের গতি।

৩

কয়েক বছর থেকে কেন জানি তিনি আর কিছু লিখছেন না। দিল্লী রেডিও-স্টেশনে থাকেন। মাঝে মাঝে জ্ঞানপূর্ণ প্রবন্ধে উর্দু সাহিত্যের সমালোচনামূলক আলোচনা করেন।

নয়া দিল্লীর ‘কফি হাউসে’র হল ঘরটার উত্তর কোণে বড়ো মতো একটা গোল টেবিল আছে। ওপরটা সবুজ কাঁচের। রোজ বিকেলে ছটা থেকে রাত নটা অবধি জোর একটা আসর বসে ওটা ঘিরে। যে কোনদিন ঐ সাতটার মধ্যে এখানে গিয়ে উঠলে দেখবেন হয়ত ওরই একটা চেয়ারে বসে বেশ স্বাস্থ্যবান নাতিদীর্ঘ গোলগাল চেহারার গৌরবর্ণের এক ভদ্রলোক বসে। টেবিলের অন্য লোকদের সাথে মাঝে মাঝে কথা বলছেন বিনম্র আড়ষ্ট স্বরে। উনিই মেহদী আলী খাঁ। ওঁর পাশেই হয়তো রয়েছেন কবি আখতার উল ইমাম। ওধারে কফি খাচ্ছেন, ঘাঁর গদ্য কবিতা অতুলনীয় সেই রাশেদ আর ছন্দ-শব্দ-বিন্যাসের যাদুকর উদীয়মান কবি মোখতার সিদ্দিকী, বিদ্রোহী-কবি মঈউন হাসান জয়বি।

এঁরা প্রায় সবাই তরুণ। ক্রত প্রগতিশীল আধুনিক উর্দু সাহিত্যকে এঁরাই দেবেন অনাগত দিনের উজ্জ্বল রশ্মি। মাঝে মাঝে সুপ্রসিদ্ধ গল্প লেখক কৃষ্ণ চন্দর; সাহাদৎ হোসেন মিণ্টো, বেদী, আশক মেফতীহ—উদীয়মান কথাশিল্পী মধুসূদন হাশমি—এঁরাও আসেন।

রোজ এঁরা এই কফি হাউসে আসেন। একজোট হয়ে বলাবলি করেন, চব্বিশ ঘণ্টায় সাহিত্য জগতে কতটুকু এলো, কতখানি গেল। অন্তরীক্ষে নক্সার পর নক্সা সৃষ্টি হয় উর্দু সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির কল্পনা নিয়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যে Coffee House-কে উপলক্ষ করে যে অগাষ্টান যুগ গড়ে উঠেছিল, এও বোধ হয় তারই আভাস। আধুনিক উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসলে—মাত্র পাঁচ বছর—তার চেয়ে বেশী আগে থেকে নিশ্চয়ই শুরু করা চলে না, তবু কী ঐশ্বর্য্যময় এর শুরু।

কাজের ফাঁকে অবসর পেলে ‘মীরাজী’ও এই ‘কফি হাউসে’ আসেন। চিলে একটা পাঞ্জাবী গায়ে আস্তে আস্তে ঢোকেন। অল্পস্ব দেহ আর পুরোণো বয়সটাকে একবার মনে মনে বোধ হয় ঠেলে দেন কোঁকড়া বাবড়ী চুলগুলোর সাথে, তারপর অবত্রে রক্ষিত দাড়িভরা মুখটায় একবার হাত বুলিয়ে মদিরাগ্রস্ত চোখগুলোকে সজাগ করে বসে পড়েন ঐ তরুণদের দলে। দু’একটা মাত্র কথা বলেন, তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক কী দেখেন, মনে হয় যেন কিছু খুঁজছেন—কি যেন বলছেন, হয়তো আগামী দিনের কোনো নতুন আর বৈচিত্র্যের সন্ধানে তিনি উন্মুখ হয়ে ওঠেন।”

মীজানুর রহমানের ‘একবালের চিন্তাধারা’ (২৭:১, অগ্রহায়ণ ১৩৫১) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য মাত্র।

জহিরুল হকের ‘প্রেমচাঁদের সাহিত্য’ (২৭:১২, কাতিক ১৩৫১) অপেক্ষাকৃত সুলিখিত প্রবন্ধ। প্রবন্ধের উপসংহারে জহিরুল হক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন :

“শ্রেণী সংগ্রামকে চিত্রিত করার জন্য এবং বিশেষতঃ জমিদার, মহাজন, পুরোহিত সমাজকে আক্রমণ করার জন্য প্রেমচাঁদকে রক্ষণশীল সমাজ ঘৃণা করেছে। মুসলিম চরিত্র অঙ্কন করার জন্য হিন্দু সমাজও প্রেমচাঁদকে যথেষ্ট নির্যাতন করেছে। ১৯৩৬ সনে লক্ষৌ শহরে যে প্রথম নিখিল ভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন হয়, প্রেমচাঁদ তার সভাপতিত্ব করেন। প্রেমচাঁদ হিন্দি ও উর্দু দুই ভাষায়ই সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। সাহিত্য সৃষ্টি করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করা সত্ত্বেও প্রেমচাঁদ এক প্রকার দরিদ্র জীবন যাপন করে গিয়েছেন। তবু ভারতীয় সাহিত্যে সত্যিকার গণ-সাহিত্যের ভিত্তি প্রেমচাঁদ গড়ে দিয়ে গিয়েছেন এবং তাঁর পথ নির্দেশে আজ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষাতেই জনগণের দুঃখ দুর্দশা সংগ্রাম নিয়ে এক নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হ’চ্ছে।”

এ. এফ. এম. আবদুল জলিল ওমর খৈয়াম সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ লেখেন সওগাতে। প্রথম প্রবন্ধের নাম ‘ওমর খৈয়াম ও তাঁহার রুবাইয়াত’ (২৯:২, পৌষ ১৩৫১), দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম ‘ওমর খৈয়ামের ধর্ম’ (২৯:৩, মাঘ ১৩৫১)। প্রবন্ধ দুটি তথ্যসমৃদ্ধ।

ফররুখ আহমদের ‘ইকবাল প্রসংগ’ (২৯:৩, মাঘ ১৩৫১) একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধের ভূমিকায় ফররুখ আহমদ লিখেছেন :

“বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও তামদুনিক কবি হিসাবে পৃথিবীর সকল দিগন্তবাসীর অভিনন্দন পেলেও আল্লামা ইকবালের কবিতা বাংলা দেশে প্রায় অপরিচিত। ‘শেকোয়া’ ও ‘জওয়াবে শেকোয়া’ নামক ইকবালের দু’টি জনপ্রিয় (এবং নিম্ন স্তরের) কবিতা ছাড়া বাংলা ভাষায় ইকবালের বিশাল কাব্যভাণ্ডার পাঠক সাধারণের কাছে এক রকম অরুদ্ধ বললে অতুক্তি করা হয় না। সম্প্রতি কয়েকজন উৎসাহী কবি ও সাহিত্যিকের দৃষ্টি ইকবালের কাব্য সাহিত্য ও তার অনুবাদের দিকে আকৃষ্ট হ’য়েছে। তাঁদের এই উৎসাহ সন্তোষজনক হ’লেও ইকবালের যে বিশাল কাব্য সম্পদ শিক্ষিত বাঙালীর কাছে অনধিগম্য হ’য়ে রয়েছে সেই অপরিচিত মঞ্জুরার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় নিবিড়তরো করাতে হ’লে মুসলিম লেখক সম্প্রদায়কে এদিকে আরো অনেক বেশী মনোযোগী হ’তে হবে।

ইকবালের কবিতার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে,—পৃথিবীর কাব্য ভাণ্ডারে ইকবাল যে বিশিষ্ট জাগরণের বাণী বয়ে এনেছেন তা সকল দেশ ও সকল কালের উপযোগী হ’লেও আদর্শচ্যুত, পরাধীন মুসলমান সমাজের জন্যই তার প্রয়োজনীয়তা সব চাইতে বেশী। একথা অনস্বীকার্য যে, ইকবালের বিপ্লবী-চিন্তনের অগ্নি-স্ফুলিংগেই ভারতীয় মুসলিমের মনে আজাদীর স্বপ্ন-বহি মেঘের মত পক্ষ বিস্তার করেছে। আমাদের রাজনৈতিক ঋণবাহীর দল প্রয়োজন মত ভুলে গেলেও

লেখক সম্প্রদায়কে সর্বদা মনে রাখতে হবে এ কথা। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আলিমা ইকবালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য ‘আসসারে খুদী’র সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।”

‘মহাকবি নিজামী ও ন্যাভয়’ (৩০:৫, চৈত্র ১৩৫৪) কবিত্বের জন্মাবধিকারী উপলক্ষে নিকোলাই তিখোনভ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক : আমিনউদ্দিন আহমদ। আজার বাইজানের মহাকবি নিজামী গিয়ানজাতি ও উজবেকিস্তানের মহাকবি আলিশার ন্যাভয় সম্পর্কে এই মূল্যায়নের উপসংহারে তিখোনভ লিখেছেন :

“মহাকবি নিজামীর আদর্শ ছিলো তাঁর নিজের দেশের মানুষকে মুক্তি দানের—নিজের দেশের মানুষের সমস্যা ছিলো, তাঁর আসল সমস্যা আর মহাকবি ন্যাভয়ের আদর্শ পরি-
ব্যাপ্ত ছিলো সমগ্র দুনিয়ার মানুষের মুক্তিতে। সব দেশের সর্বজাতির মানুষের কথা চিন্তা করেছিলেন তিনি তাঁর আন্তরিকতা দিয়ে—দুই মহাকবির আসল পার্থক্য হলো এইখানে।
মাটির মহিমা এবং শ্রম ও শ্রমিকের শক্তি সম্পর্কে তিনি মানুষকে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন, আবার নিজামীর মতো, মানুষের উপর পীড়নের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছেন।

তবুও স্বীকার করতে হবে এই বস্তু-মুখর যুগে তাঁদের এই প্রাচীন কাব্য আরো বেশী মহিমামণ্ডিত। সেকালের কবি মানুষের মুক্তি এবং শোষকের কবল থেকে দুর্বলের আত্মরক্ষা সম্পর্কে মানুষকে যে বিদ্রোহ করতে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজকের মানুষও সেই সংগ্রামে লিপ্ত। সেদিনের কবি-মনে যে চিন্তা উদগ্ৰ হয়ে উঠেছিলো, মানুষের জন্য যে দরদ এবং মহান প্রেমের জন্যে যে অনুভূতি উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো, আজকের মানুষও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত। আজকের মুক্তি সংগ্রামের সংগে আজ থেকে কয়েক শত বৎসর পূর্বের কবির অন্তরের যোগাযোগ আছে। সেদিনের অল্প শিক্ষিত মানুষ তাঁদের যতোটা চিনেছিলো, আজকের দিনের মানুষ তার চেয়েও বেশী করে চিনবে। বর্তমান যুগের মানুষের আত্মসচেতনতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাবোধ যতো বেশী জাগ্রত হয়ে উঠবে ততো বেশী মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠবে এই প্রাচীন সত্য দ্রষ্টারা এই প্রাচীন মুক্তি সাধকেরা।

সওগাতের বিশ্বসাহিত্য পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহ শুরু হয়েছিল মধ্যযুগের আরবী সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ দিয়ে। এ আলোচনা শেষ করছি ‘আরবী কাব্য’ শীর্ষক মোহাম্মদ কাসেমের প্রবন্ধ পরিচয়ে (৩০ : ৭-৯, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৫)। সমাজ ইতিহাসের বিবর্তন ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করে আরবী কাব্যের ক্রমবিকাশ আলোচনায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত এ প্রবন্ধটি ‘সওগাতে’র একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। লেখক আরব জাতির জ্ঞানস্পৃহা যে বর্ণনা দিয়েছেন তা গ্রীক সাহিত্য ইতিহাসের অনুরূপ বর্ণনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

“আরব জাতির জ্ঞান স্পৃহা যে কিরূপ ছিল তা—ওকাজের ‘বাৎসরিক সাহিত্য অধিবেশন’ দৃষ্টান্তেই বোঝা যায়। ‘ওকাজ’ নামক স্থানে প্রতিবৎসর কবি সম্মিলনী বসত এবং মাসাধিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা একত্র হয়ে এ অধিবেশনে যোগদান করত। জ্ঞান ও শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য ও পুরস্কার লাভের আশায় প্রত্যেক গোত্রের ‘খতিব’ ও ‘শায়ের’দের মধ্যে যথেষ্ট রচনা প্রতিযোগিতা চলত। প্রকাশ্য সম্মিলন ক্ষেত্রে সমালোচনা ও তর্ক বিতর্কের ভেতর শান্তি ভঙ্গ পর্যন্ত হয়ে যেত। যে সমস্ত কবিতাগুলি ওকাজের কবি সভায় শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হত সে কবিতাগুলি বড় চামড়ার উপর লেখক দ্বারা লেখিয়ে কাবাগৃহে ঝুলিয়ে রাখত। তখন সেগুলি ‘সাবরা মোয়াল্লা-
কাত’ অর্থাৎ ‘দৌদুল্যমান কবিতা সপ্তক’ নামে অভিহিত হত। কাহারো মতে সেগুলি কাবাগৃহে ঝুলাবার পূর্ববর্ষ মিশর দেশীয় রেশম বস্ত্রের ওপর স্বর্ণাকরে লিপিবদ্ধ করে রাখত। তখন তার নাম ছিল ‘মোজাহাবাত’ বা ‘স্বর্ণ নিশ্চিত কবিতা’।”

প্রবন্ধে আরবী কাব্যের ধারাবাহিক ইতিহাস ও বিভিন্ন যুগের কবিতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে ॥ [চতুর্বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় সমাপ্য] ॥